মিত্তির-বাড়ী

আশাপূর্ণা দেবী

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

কলকাতা

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র ১৩৫৩

তিন টাকা আট আনা

প্রচ্ছদশিল্পী : প্রশান্ত গুপ্ত

নিউ এজ্ পাবলিশার্স লিমিটেড্ ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলকাতা থেকে
জে. এন. সিংহ রায়, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলকাতা ১০নং রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট হিন্দুস্থান প্রেস থেকে
ফণীভূষণ বসু রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৺লেখা দেবীর উদ্দেশে—

আমার লেখা পড়তে যে সব চেয়ে ভালবাসতো—আমার
লেখা যে কোনদিনই আর পড়বে না—আমার
সেই আদরের 'লেখা'কে দিলাম।

আশাদি

ঢং! ঢং!

বিনিদ্র কর্ম্মী, মধ্যরাত্রির গভীর অন্ধকারের সুযোগেও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করে না।...পৃথিবী আর সূর্য্যের দূরত্বের হিসাব কসিতে কসিতে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মাঝে মাঝে সশব্দে ঘোষণা করে অঙ্কের ফলাফল।

ঢং! ঢং! বাজিতে থাকে আশে পাশে যেখানে আছে যত মুখর ঘড়ি। দিনের অজস্র কোলাহলে চাপা পড়িয়া যায় ওদের বিনীত আবেদন, কানেই পৌঁছায় না কারুর; তাই মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ পরিবেশের সুযোগে যেন নিজেকে মনে পড়াইয়া দেয়।...একজনের সাড়া পাইলেই অনেকজন সাড়া দিয়া ওঠে...“আছি” “আছি” “চলছি আমি সময়ের সঙ্গে পা ফেলে”—কারো স্বরে গম্ভীর বিলম্বিত বনেদী বড়মানুষের চাল, কারো স্বরে দ্রুত মিলিটারী ভঙ্গী, কেউ তরুণীর নৃত্য-ছন্দে তারের বাজনার মত টুং টাং করিয়া বাজিতে থাকে।

এ বাড়ীর ঘড়িটা আর বাজে না।

দালানের দেয়ালে টাঙানো পৈত্রিক আমলের বড় ঘড়িটা হঠাৎ কখন একদিন মৌনি লইয়াছে।...নাড়িতে তার

এখনো চলমান জীবন স্রোত, প্রাণস্পন্দনের 'টিক টিক' তালে হিসাব রাখিতেছে সময়ের শ্বাস প্রশ্বাসের···শুধু নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিবার সরব চেষ্টাটা আর নাই।

ওটা যেন ছেলেমানুষী হইয়া গিয়াছে তার পক্ষে।

···"মানুষের সঙ্গে কী আকাশ পাতাল তফাৎ"···অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আপনার মনে হাসিয়া ওঠে অনিরুদ্ধ··· পুরনো হইয়া গেলে যে থামিয়া যাইতে হয় এটুকু বোধ মানুষের নাই। মানিয়া লইতেই রাজী নয় নিজের দৈন্য। ···অহরহ নিজেকে ঘোষণা করা চাই তাহার, বেসুরা ভাঙা গলার বেআন্দাজী ঘ্যানঘ্যানানীতে সর্ব্বদা সচেতন করিয়া রাখা চাই আশপাশের লোককে। ···এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া থাকিবার উপায় নাই।

'ফুরাইয়া গিয়াছি' এই পরম সত্যটাকে ঠেকাইয়া রাখিবার দুরূহ চেষ্টাতেই বোধকরি বার্দ্ধক্য এত অশোভন মুখর।···

"অন্ততঃ সেজকাকার পক্ষে—"অনিরুদ্ধ আর একবার হাসিয়া ওঠে। অবশ্য সবসময় যে সেজকাকার ব্যবহারটা হাস্যকর এমন নয়, যতদূর সম্ভব বিরক্তিকরই বরং, কিন্তু এখন এই ঘুমন্তপুরীর মাঝখানে একমাত্র জাগিয়া-থাকা অনিরুদ্ধর সকলকেই যেন ভারী ছেলেমানুষ লাগে।

সারাদিন পরস্পরে ছেলেমানুষের মত কলহ কোলাহল

করিয়া যেন কেবলমাত্র কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাইয়া শান্ত হইয়াছে।

জাগিলেই—যে কে সেই।

কিছুদিন যাবৎ অনিদ্রারোগে ভুগিতেছে অনিরুদ্ধ। ঘুম আসিতেই চায়না, প্রায় সারারাত্রি ঘুমন্ত পুরীর প্রহরীর মত ঘুরিয়া বেড়ায় অন্ধকার বারান্দায়, বসিয়া থাকে বারান্দায় পাতা ঈজি চেয়ারে। ঘরের মধ্যে বিছানায় যেন বিষ লাগে। ··অথচ রাত্রি শেষের মোহময় কোমল প্রশান্তিতে যখন বিনিদ্র দুই চোখে জড়াইয়া আসে মৃদু তন্দ্রার রেশ, ঠিক তখনই দিনের আরম্ভ হয় সেজকাকার।

রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করেন না।

দিনের কাজ সুরু হয় তাঁহার অদ্ভুত একটী নিয়মে। কাসি ...“খক্ খক্ খক্ খক্” একটানা ছন্দে ঠিক আধঘণ্টা যাবৎ কাসা চাই তাঁহার।···রোগের কাসি নয়, বার্দ্ধক্যেরও নয়, রীতি-মত একটী সাধনালব্ধ বস্তু এটী, শুধু শেষ রাত্রের এই আধঘণ্টা সময় ওর মেয়াদ, সারা দিনরাত্রে আর কোনো সময় কাসির আওয়াজ পাওয়া যায় না সেজকাকার।

এটা একরকম ‘ওয়ার্নিং বেল’ও বলা চলে।

বাড়ীর সমস্ত নিদ্রিত প্রাণীগুলির বিস্মৃত চৈতন্যের দরজায় একবার ঘা দেওয়া। আকাশের তারাগুলি নিতান্তই যখন আসর জমকাইয়া বসিয়া থাকে—ডাগর চক্ষু মেলিয়া, তখন আর

মৌখিক ডাকাডাকি করিবার সাহস হয় না। বয়সের হিসাবে যদিও তিনিই এ বাড়ীর কর্ত্তৃপদবাচ্য, কিন্তু কর্ত্তৃত্বের ভিত্তিটা সব সময় ঠিক বয়সের উপরই নির্ভর করে কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন না বলিয়াই বোধ করি এই অভিনব কৌশলের ডাক।

কাসির মেয়াদ ও প্যাকেটের সিগারেট গুলি শেষ হইতেই সেজকাকা কতকটা দাবীর জোরেই যেন ডাক দেন উমাশশীকে। উমাশশী তাঁহার নিজের মেয়ে বলিয়াই শুধু নয়, বিধবা মেয়ে—বেওয়ারিশ মাল, তাই প্রথম পর্ব্বে ওকেই তলব দেওয়া সহজ।

—উমি, এই উমি, ওঠনা—আর ক'বছর ঘুমোবি? আশ্চর্য্য!"

হোমিওপ্যাথী এই ডোজটুকু মাত্র প্রয়োগ করিয়া যাইবেন নিজের প্রাতঃকৃত্যে। সেও অবশ্য সামান্য সময়ের ব্যাপার, আধুনিকতার চরম অভিশাপে কখনো ভুগিতে দেখা যায় না সেজকাকাকে। প্রাতঃকৃত্য এবং আহ্নিককৃত্য সারিয়া আসিতে আসিতে উষার আভাস দেখা যায়, আর তখন চলিতে থাকে কবিরাজী মাত্রা।

—"এখনো উঠিসনি? উমি, এই উমি, বলি কুম্ভকর্ণকেও যে হার মানালি তোরা এঁ্যা? এত আলস্য কেন শরীরে এঁ্যা, এত আলস্য কিসের? সাধে কি আর এ সংসারের এমন লক্ষ্মী-ছাড়া দশা! ছ্যা—ছ্যা।..."

উমাশশীকে কিন্তু খুব বেশী বিচলিত হইতে দেখা যায়না, নিজের অনাচারে লক্ষ্মী ছাড়িয়া যাওয়ার মত ঘোরতর দুঃসংবাদেও না। চোখ খুলিয়া একবার রাত্রির ভেজাল মেশানো উষার স্বরূপটা দেখিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শোয়।

অতঃপর সেজকাকার অভিমানের পালা।…"থাক্ আমার জন্যে আর কষ্ট করবার দরকার নেই কারুর, চা এক কাপ, পয়সা ফেললে সর্ব্বত্র মিলবে—"…খুচরো পয়সাগুলিকে রীতিমত বাজাইয়া গভীর বিক্ষোভে আনলায় টাঙানো জামাটা টানিয়া মাথায় গলাইতে গলাইতে শেষ হুঙ্কার ছাড়েন—"হুঁঃ আমার জন্যে তো ভারী মাথা ব্যথা পড়েছে সব! আপনাদের আরাম আয়েস বজায় থাকলেই হ'ল।…এইবার মানে মানে নিজের পথ দেখতে হ'বে আর কি—"

পথ কি, দেখিবার সূত্রটা কি, 'সরিয়া পড়ার' মতো ঠাঁই আছে কোথায়, সে কথা মুখ ফুটিয়া কেউ জিজ্ঞাসা করে না বলিয়াই বোধকরি অপছন্দকর ব্যাপার ঘটিলেই অভ্যস্ত নিয়মে কথাগুলা আওড়াইয়া যান সেজকাকা।

এতক্ষণে যেন উমাশশীর চমক ভাঙে…বা ঘুম ভাঙে।… জ্বালা করা চোখ দুইটা ঘসিতে ঘসিতে উঠিয়া আসিয়া হাই তুলিতে তুলিতে স্টোভটা চৌকীর তলা হইতে টানিয়া বাহির করে।

চায়ের সরঞ্জাম গোছানোই থাকে।

আগে—রাত্রের দুধ হইতে আধ পেয়ালা রাখিয়া দিত

উমাশশী···আজকাল কোথা হইতে যেন রাশি রাশি টিন ভর্ত্তি মিলিটারী মিল্কের আমদানী হইতেছে, তাহাতেই কাজ চলে।

শেষ রাত্রের ঘুম ভাঙা চোখ আর দেহ ভাঙা আলস্যে চায়ের জল ফোটার শোঁ শোঁ শব্দটা এত মনোজ্ঞ লাগে···বিধবা না হইলে অনায়াসেই তো বাপের চায়ের সঙ্গে এক পেয়ালা ভাগ বসাইতে পারিত উমাশশী ? অন্ততঃ টিনের দুধটা কেমন লাগে পরীক্ষা করিতে ? ইচ্ছাটা তাড়াইতেই বোধ হয় জোরে জোরে পাম্প করিতে থাকে স্টোভটায়।

"—দরকার ছিল না—আমার জন্যে কারুর কিছু করবার দরকার ছিল না—চা এক কাপ—বাইরেই খেয়ে নিতাম আমি—" বলিয়া সেজকাকা আসিয়া চাপিয়া বসেন।

বুদ্ধি খাটাইয়া উমাশশী দুই পেয়ালা চায়ের জল চড়ায়।

এক পেয়ালা ঢালিয়া বাপের সামনে আগাইয়া দিয়া যেন অন্যমনার মত আর এক পেয়ালা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকে।···"আর কেউ খাবে নাকি—" লুব্ধস্বর গোপন করিয়া নিতান্ত অবহেলার ভঙ্গীতে উচ্চারণ করেন সেজকাকা।

উমাশশী বলে—"নাঃ কে আর খাবে, সবাইতো ঘুমে পাথর, এমনি বেড়ে গেল দেখছি—"

"—ওই তো দোষ তোমাদের, কোনো জিনিসের আন্দাজ নেই। এই এখন রেশনের চিনি কমিয়ে দিয়েছে—আর অপচয়ের মাত্রা বাড়ছে দিন দিন।···দাও আমাকেই দিয়ে দাও—আজকালকার বাজারে পয়সার জিনিস ফেলা—"

বসিয়া বসিয়া দুই পেয়ালা চা উদরস্থ করার পর মেজাজটা কিঞ্চিত প্রসন্ন দেখায় সেজকাকার।—"আলু আছে না কি?… কালকের তরকারী থেকে বেঁচেছে কিছু?…পান আনতে হবে? লেবু চাই? কাঁচা লঙ্কা?"…প্রভৃতি দুই চারিটী জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া বাজারের থলিটী দেয়ালে টাঙানো হুক হইতে পাড়িয়া লন…নিত্যকার এই বাজার করা কাজটী সেজকাকার জীবনের বোধকরি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দময় আকর্ষণ। সেই পরিচিত লোহার ফটকটী যেন সকাল না হইতেই টানিতে থাকে তাঁহাকে, কিন্তু মুখে সে কথা স্বীকার করেন না।…নিতান্ত সংসারের উপর কর্ত্তব্যে—দায়ে পড়িয়া—বাধ্য হইয়া করিতে হইতেছে এই ধরণের একটা ভাব মুখের চেহারায় ও ভাষায় বজায় রাখিয়া কাজটী তিনি প্রাণপণে আগলাইয়া থাকেন।

বাড়ীতে লোকের অভাব নাই, তাছাড়া—চাকর আছে। চাকরগিরির প্রধানতম লাভজনক অংশটা হাতে না পাওয়ায় সেজকাকার উপর তাহার যে মনের ভাব তাহাকে ঠিক ভক্তিভাব বলা চলে না। 'কেনাকাটার' গৌরবময় আসনটী বাদ দিয়া কেবলমাত্র বহিয়া আনার অপমানজনক ভারটা তাহার পক্ষে যে সত্যই মর্ম্মান্তিক, সে কথা হৃদয়ঙ্গম করিলেও সেজকাকা এক দিনের জন্যও অধিকার হস্তান্তর করেন না।…

বাজারের থলিটী হাতে লইয়া নীচে নামিবার প্রাক্কালে বাড়ীর প্রত্যেকটী ছেলেমেয়েদের নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া তাঁহার আর এক কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে। ছেলেমেয়েগুলি অবশ্য

গৌণ, বড় বড় ভাইপোদের অথবা বৌমাদের নাম করিয়া তো আর ডাকাডাকি চলে না? কাজেই—বেলা অবধি পড়িয়া ঘুমানোই যে উচ্ছন্নে যাওয়ার পথ, এই বদভ্যাসের জন্য যে আজীবন কষ্ট পাইতে হইবে,—এসব ছেলেদের যে লেখাপড়া হইবার আশা কস্মিনকালেও নাই—এই সব পরিচিত পুরাতন মন্তব্যগুলি প্রত্যহ নূতন করিয়া আওড়াইয়া নীচে নামিয়া যান।…সেখানে আছে আর একটী আসামী।

বসন্ত।

ঘুম ভাঙিলেও সে সেজকাকা বাহির হইবার আগে উঠিতে চাহেনা। তাহার উপর আর একপালা উপদেশ বর্ষণের পর—এমন নবাবী অভ্যাস লইয়া চাকরগিরি করিতে আসার তাৎপর্য্য কি সে বিষয়ে সবিস্ময় প্রশ্ন করিয়া নিতান্তই বাহির হইয়া পড়েন তিনি।

প্রাতঃভ্রমণটা ছল মাত্র। তাছাড়া—সময় কাটাইবার একটু উপায়। তাঁহার মনের গতি অনুসারে বাজারই কি খোলে ছাই!……খোলা পাওয়া মাত্র ঢুকিয়া পড়িয়া ঘণ্টা খানেক ধরিয়া বাছিয়া বাছিয়া জিনিষগুলি সংগ্রহ করিতে থাকেন—আন্দাজমত সময়ে বসন্ত গিয়া বোঝা বহিয়া আনে।

তা' বোঝা বই কি। প্রকাণ্ড সংসার! উদর গহ্বরের সংখ্যা কম নয়, চারবেলা সেগুলি পূরণ করিতে মাল তো সহজ লাগে না।…

ঘড়িগুলা আর একবার বাজিয়া ওঠে তিনসত্যের সুরে। ...উত্তপ্ত মস্তিষ্কে শেষরাত্রের স্নিগ্ধ হাওয়াটা মন্দ লাগে না... সর্ব্বনাশ! সেজকাকার প্রভাতী লীলা স্মরণ করিতে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল অনিরুদ্ধর?...না না আর ঘুরিয়া বেড়ানো নয়... এবার আর একবার বিছানায় আত্মসমর্পণ করিয়া ঘুমের সাধনা করিতে হয়।...কিন্তু সামনের বাড়ীর দোতলার কোণের ঘরটায় আলো জ্বলিতেছে কেন? কতক্ষণ জ্বলিতেছে? অনিরুদ্ধর চোখে পড়ে নাই না কি?...নাঃ নিভিয়া গেল। কে কোন প্রয়োজনে একবার উঠিয়াছে হয়তো।...কিন্তু কে? কত লোকেই তো শোয় ওই একটা ঘরে ঠাসাঠাসি করিয়া। সারা বাড়ীটাই তো ভাড়াটে বসাইয়াছে ভদ্রলোক, অথচ কত কম লোক ওদের সংসারে! ইচ্ছা করিলেই প্রত্যেকে আলাদা একখানা ঘরের অধিকারী হইতে পারিত।...কোণের ঘরে কে আলো জ্বালাইয়া একবার জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল সে বিষয়ে-আর সন্দেহের অবকাশ থাকিত না।

কিন্তু নিঃসন্দেহ হইয়াই বা লাভ কি? অন্ধকার বারান্দায় যে বিনিদ্র অনিরুদ্ধ বারো আনা রাত্রি জাগিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় সে কথা কি সবাই জানে না কি?...না না ঘুমাইতে যাওয়া দরকার।...বিছানায় গিয়া আশ্রয় লয় অনিরুদ্ধ, আর কিছুক্ষণ বাদেই আরম্ভ হয় সেজকাকার দৈনন্দিন জীবনের প্রথম অধ্যায়।

"খক্ খক্ খক্"...ছেদ ভেদ হীন একটানা সুরে।...তাহারই সঙ্গে ভাসিয়া আসে উগ্র সিগারেটের গন্ধ।...

দুই

সেকেলে আমলের বাড়ী।

পাড়াটাও প্রায় এই বাড়ীরই সমবয়সী, কিন্তু পথের নামটা নিতান্ত আধুনিক। পুরনো আমলের অবশ্য একটা কিছু ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে সে নাম বাতিল করিয়া দিয়া—আশু স্বাধীনতার উদগ্র আশায় একটী বিশিষ্ট নেতার নামে নামকরণ করিয়া লইয়া পাড়ার কয়েকটী উৎসাহী যুবক বোধ করি ভারতকে স্বাধীনতার পথে কতকটা আগাইয়া রাখিয়াছে।

বড়বাড়ী। ঘরদালান বিস্তর, রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর ঠাকুরঘর তো দুইপ্রস্থ করিয়া, তবুও—হাত পা ছড়াইয়া থাকাতো দূরের কথা বাড়ীর সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ ইচ্ছামত হাঁফ লতেও ঠাঁই পায় না। একজনের পক্ষে যে বাড়ী প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল—দুই পুরুষ পরে আর তাহার পক্ষে সকলের প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়।

ঠাকুর্দ্দার আমলের বাড়ী।

তাঁহার নিজস্ব বলিতে অবশ্য দুই বিধবা পুত্রবধু ও বিপত্নীক একটী পুত্র বর্ত্তমান—অনিরুদ্ধর মা, ন'খুড়িমা, আর সেজকাকা, কিন্তু তাঁহাদের—এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুই মৃত দম্পতির ভাগের গুলি মিলাইলে বংশধরের সংখ্যা সোজা নয়।

নানা বয়সের নানান সম্পর্কের মানুষে বাড়ী ঠাসা। প্রত্যহ একবেলাতেই তিন হাঁড়ি ভাত রাঁধা হয়। তিন ঠাঁই নয়—একই হেঁসেলে। পাড়ার আত্মীয়বর্গের, বন্ধু আর কুটুম্বগণের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার।

আপাততঃ মেজগিন্নী হেমলতাই প্রধান কর্ত্রী, কাজের নয় ব্যবস্থাপনায়। বাহিরের লোক লৌকিকতা আচার ব্যবহারেই হোক, অথবা সংসারের আয়ব্যয় অনুসারে আহার বিহার, ব্যসন বিলাসের হিসাব কসাতেই হোক, তাঁহার উপর কাহারও কথা কহিবার হুকুম নাই।

অনেকের অনেক ইচ্ছার দুরন্ত ঘোড়াকে বাগাইয়া রাশ টানিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। অন্ততঃ অপদস্থ অপমানিত হইয়া অক্ষমতার প্রমাণ কখনো দিতে হয় নাই।

কাজের গিন্নী ন'জা' ইন্দুপ্রভা।

ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘর, ঠাকুরঘর আর 'নিরামিষ ঘরের' প্রবল ঘানিতে পেষাই হইতে হইতে তাঁহার জীবনের তেল অনেকদিন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, কাজেই এখন—অবশ্য প্রয়োজনীয় অবাঞ্ছিতের বেশে তিনি ধূম এবং তাপ দুইই উদ্‌গীরণ করিতে থাকেন।

ন'খুড়িমার একমুহূর্ত্ত অনুপস্থিতিতে যেমন সংসারচক্র অচল, তেমনি ন'খুড়িমা পিছন ফিরিলেই—মেয়েরা মুখ বাঁকাইতে, বৌয়েরা ঠোঁট উল্টাইতে, ছেলেরা ভ্রু কোঁচকাইতে, আর নাতি নাত্নীরা বক দেখাইতে ছাড়ে না।

কিন্তু ন'খুড়িমার দরবারে হাজির না হইলে ডানহাতের ব্যাপার বন্ধ। কাজেই সকাল হইতেই যাহাদের পেটের মধ্যে আগারের তাগিদ পড়ে—সকাল না হইতেই—ঠাকুর ঘরের দরজায় ভীড় করা ছাড়া উপায় নাই তাহাদের। এদিকে আবার সেজকর্ত্তা বাজার সারিয়া ঘরে ফিরিবার আগেই "ব্রেকফাস্ট"টা সারিয়া লওয়া নিরাপদ, কারণ তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আসিলেই নানান ফৈজৎ।

সামান্য জলযোগকে অবলম্বন করিয়া যতদূর সমালোচনা এবং যতটা খুঁৎকাটা সম্ভব সে বিষয়ে অবহেলা নাই সেজকর্ত্তার।

ইন্দুপ্রভার গুরুমন্ত্র আছে।

তবে দুইদণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া গুরুমন্ত্রের মর্য্যাদা রাখিবার অবসর নাই। স্নানান্তে ভিজা কাপড়েই ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া বার দুই মাথা ঠুকিয়া এবং মুদিত নয়নে বারকতক নাক কাণ মলিয়া হরিনামের মালাগাছটী লইয়া "দশবার" জপ সারিবার আগেই বালখিল্য বাহিনীর কলরব সুরু হইল ঠাকুর ঘরের দরজায়।

—এসেছ আপদেরা? ভোর না হ'তে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলে উঠেছে? এইতো রাত দুপুরে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে শুয়েছিলি। ধন্যবাদ বাবা! তোদের মায়েদেরও বলিহারী দিই—সকাল বেলাই ঠাকুরঘরের দোরে লেলিয়ে দিয়েছে? ধম্মকম্ম চুলোয়

গেল, দু'দণ্ড যে ইষ্টিগুরু চিন্তা করবো তা'র জো নেই। কেন তোদের ঘরে কি কিছু ছাই থাকে না? দু'পয়সার বিস্কুট ল্যাবনচুষ কিনে রাখতে পারে না আপন আপন ঘরে?—

বলিয়া মালাগাছটী কপালে ঠেকাইয়া উঠিয়া পড়েন ন'গিন্নী।

'দুইপয়সার' যুগ অবশ্য আর নাই, কিন্তু সে যুগে যাহারা কথা শিখিয়াছিল তাহাদের রসনায় এখনো তাহার রেশ আছে।

বালখিল্য বাহিনী অবশ্য ইহাতে অপমান বোধ করে না। সব কথার মানে জানে না বলিয়াই হোক, অথবা গা সহা বলিয়াই হোক, একই ভাবে ঠেলাঠেলি হাসাহাসি করিতে থাকে। পূজার প্রসাদী খানকয়েক বাতাসার জন্য যা কাড়াকাড়ি লাগায় তাহাতে আর তাহাদের আত্মসম্মান বোধ সম্বন্ধে তিলার্দ্ধ শ্রদ্ধা থাকে না।

কাহাকেও আস্ত একখানা, কাহাকেও ভাঙিয়া আধখানা বাতাসা দিয়া ইন্দুপ্রভা ঠাকুর ঘরের শিকল লাগাইয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসেন—চলো! গিলবে চলো সব। দাদা দিদিরা উঠেছে তোদের? ওঠেনি? তা উঠবে কেন, তাঁরা উঠলে যে গেরস্থর উপকার হয় একটু। কেন, শান্তি মুখপুড়িকে যে বলে রেখেছিলাম—সকাল সকাল উঠে কাপড় ছেড়ে ঠাকুরের ফুলচন্নন গুছিয়ে রাখতে! তা করবেন কেন—মেমের বেটি মেমরা সব বেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠে বাসি কাপড়ে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসবেন। ঝ্যাঁটা মারো—ঝ্যাঁটা মারো—

একগোছা ছোট ছোট রেকাবিতে দুইখানা করিয়া বাসি পরোটা, একটু গুড় ও একটা করিয়া নারকেল নাড়ু সহযোগে প্রাতরাশ সাজাইতে থাকেন ন'গিন্নী।

এর চাইতে ভালো আয়োজন ছোটদের জন্য সম্ভব নয়। ভালো জিনিস পড়িবে বাবুদের পাতে। যাহারা অপছন্দ দেখাইয়া মুখ ঘুরাইতে শিখিয়াছে কিছুটা ভালো তাহাদের জন্যও চাই। কাজেই শিশুর দুধ হইতে বাঁচাইয়া বাবুদের জন্য ক্ষীর করা অথবা ইয়ংম্যানদের বরাদ্দের অতিরিক্ত চা খাওয়ানোর নজীর বিরল নয়।..."ছেলেমানুষের আবার জিভের স্বাদ"—চিনির খরচ সামান্য বাড়াইয়া দিলেই দুধে খুব খানিকটা জল ঢালা চলে। লুচির সঙ্গে পরোটার—বাসির সঙ্গে টাটকার তুলনা করিতে এখনো শিখে নাই যখন, তখন আর কেন বাজে খরচ!

— শান্তির পিঠোপিঠি বোন জয়ন্তী সেইমাত্র উঠিয়া আসিয়া দালানে দাঁড়াইয়াছিল, ন'গিন্নীর শেষ কথাটা কানে যাইতেই বিরক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—সক্কাল বেলাই দিদিকে ঝাঁটা মারছো যে ন'ঠাকুমা?

দিদির সঙ্গে যে খুব বেশী সম্প্রীতি আছে এমন নয় কিন্তু রণক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ বলিয়া একটা কথা আছে তো?

ইন্দুপ্রভা গুড়মাখা হাত ধুইতে ভুলিয়া দুইচোখ কপালের উপর তুলিয়া অবাক কণ্ঠে কহিলেন—ঝাঁটা আবার মারলাম কখন এঁ্যা? তুই যে অবাক করলি 'জন্তি', ঝাঁটা যদি মেরে থাকি সে আমার অদেষ্টকে মেরেছি।

—কেন তার আবার কি অপরাধ হল ?

পিছন হইতে নাতবৌ স্থরেখা হাসিয়া ওঠে।

মৃতা বড় গিন্নীর পৌত্রবধু। সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে। বিবাহে পাওয়া শাড়ী ব্লাউস সাবান তোয়ালেগুলার জের এখনো আছে বলিয়াই বেশবাসের বৈশিষ্টে সৌখিনতার ছাপ। কাঁধে চওড়া পাড় তোয়ালে ও ঝক্‌ঝকে সাবানদানী হাতে নিদ্রালস মন্থর গতিতে নামিয়া আসিয়াছে।

—অদেষ্টর অপরাধটা কি ন'ঠাকুমা ?

যতই হোক নাত বৌ। ইন্দুপ্রভা মুখখানায় হাসির আভাস আনিবার ব্যর্থ চেষ্টায় কুঞ্চিত মুখে বলেন—ষোলো আনাই অপরাধ, তা' নইলে আর চব্বিশঘণ্টা এই পোড়া সংসারের লাথি ঝাঁটা খেয়ে পড়ে আছি ? তোর মতন তো আর বরসোহাগী নইলো ?

—কেন ? ন'ঠাকুদ্দা বুঝি আপনাকে দেখতে পারতেন না ন'ঠাকুমা ?

—আ গেল, এ ছুঁড়ি সক্কাল বেলায় এ কি রামায়ণ গাইতে এলো—বেরো বেরো—চান করগে যা, নইলে চোখের ঘুম ছাড়বে না—

বলিয়া এইবার যথার্থই হাসিয়া ফেলেন ন'গিন্নী।

শীর্ণ অস্থিশিরাবহুল মুখে হাসিটা হয়তো সুদৃশ্য নয় কিন্তু অকৃত্রিম বটে।

স্থরেখা সাজগোজ করিতে ভালোবাসে, খারাপ খাইতে

পারে না, বেশী খাটিতে পারে না—এসব মিথ্যা নয়, কিন্তু এই গুণটী তাহার চমৎকার। প্রতিকূল আবহাওয়াকে চট করিয়া মোড় ফিরাইতে পারার ক্ষমতাটী তাহার আয়ত্ত।

সিঁড়ি ওঠা নামা করিতে দালানে পড়িতেই হয়

অনিরুদ্ধ নামিতে নামিতে থমকিয়া দাঁড়াইল···অন্যদিন সে আরো বেলা অবধি বিছানায় পড়িয়া থাকে—রাত্রের অনিদ্রার খেসারৎ দিতে, আজ এমনিই উঠিয়া পড়িয়াছিল। সিঁড়ির মাঝামাঝি আসিতেই সুরেখার গলার সাড়া পাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, সম্পর্কে সে খুড়শ্বশুর। বরের চাইতে বয়সে ছোট খুড় শ্বশুরকে সুরেখা বিশেষ কিছু সমীহ করিয়া চলেনা বলিয়াই বোধকরি অনিরুদ্ধ নিজেই সমস্ত 'শ্বাশুরিক' আইন কানুন মানিয়া চলে। সুরেখার ত্রিসীমানায় তাহার ছায়া দেখা যায় না।

তবে কথাবার্ত্তা কানে না আসিয়া উপায় নাই, বিশেষতো যে বৌ লজ্জা সরমের ধারটা কম ধারে।···কোন সূত্রে বলা কঠিন, ইহারই উপর সামান্য একটু আস্থা বা শ্রদ্ধাভাব আছে অনিরুদ্ধর। 'মনুষ্য পদবাচ্য বলা চলে' এইরূপ একটা মনোভাব আর কি।

সংসারের আর সকলের উপর অদ্ভুত এক অবজ্ঞা অনিরুদ্ধর। কত ছোট জিনিস লইয়া এরা সুখে বিভোর, আর দুঃখে অভিভূত, দেখিলে অনুকম্পা জাগে।

রাগেরও যোগ্য নয় এরা।

এদের ভালো করিতে পারার আশা থাকিলে হয়তো করুণা আসিত, নাই বলিয়াই অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু আসেনা।... কথা সে কমই বলে—যা দু'একটা বলে প্রায়ই শাণিত-ধার তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক, সহজ অন্তরঙ্গতার সুর নাই তার ভাষায়।... ও যেন এবাড়ীর কেউ নয়, হিসাবের ভুলে কোথা হইতে ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

ছেলেমেয়েগুলা ছোট কাকাকে দেখিয়া একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। যে ছেলেটা এতক্ষণ হ্যাংলার মত নাড়ুটা লইয়া কেবল মাত্র রসনার সাহায্যে আস্বাদ অনুভবের চেষ্টা করিতেছিল, সে মরিয়া হইয়া জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে চালান করিয়া দিল।

অনিরুদ্ধ হয়তো দাঁড়াইত না, কিন্তু ছেলেটার ক্ষণপূর্ব্বের কৃপণতার ছবিটা মনকে কেমন একটু নাড়া দেয়। দাঁড়াইয়া পড়িয়া ইন্দুপ্রভার উদ্দেশ্যে বলে—এদের আর কিছু দেবে নাকি ন'খুড়িমা?

সামান্য বিস্মিত হইলেও ইন্দুপ্রভার কণ্ঠস্বরে একই সুর ঝঙ্কৃত হয়—আবার কি দেবো—রাত পুইয়েই পেট চিরে খেতে হবে নাকি? যা যা উঠে যা হ্যাংলাকুটের দল! খাচ্ছে দেখোনা—যেন সাত জন্মে খায়নি! ঢের ঢের ছেলেপুলে দেখেছি বাবা এমন রাক্ষুসে দিশে দেখিনি।

অনিরুদ্ধ বিরক্ত কণ্ঠে বলে—এসব বিশ্রী জিনিসই বা দাও কেন এদের? লুচি কচুরী নিমকি সিঙাড়া অনেক কিছুই তো হয় দেখতে পাই রোজ, এ হতভাগ্যদের ভাগ্যে বুঝি জোটেনা সে সব?

—তোমার যেমন বুদ্ধি তেমনি উপযুক্ত কথা! গুষ্ঠিশুদ্ধ সবাইকে লুচি কচুরী খাওয়াতে হলে কুবেরের ভাণ্ডারেও কুলোবেনা বুঝলে বাছা?

—তা'হলে কারুরই না খাওয়া উচিৎ। বলিয়া অনিরুদ্ধ চলিয়া যাইতে অগ্রসর হয়, কিন্তু ছোট ছেলেরা কোন কোন বিষয়ে অবুঝ হইলেও সব বিষয়ে তো আর অবুঝ নয়? ছোট কাকা যে তাহাদের অনুকূল সেই বোধের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধকরি মিনু নামক ছোটমেয়েটী উঠিয়া আসিয়া অনিরুদ্ধর কাপড়ের এক খুঁট চাপিয়া ধরিয়া চুপি চুপি বলে—ভারী বদমাইস ন'ঠাকুমাটা, না ছোটকা? শয়তানের ধাড়ি, ভালো জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখে নিজের ছেলের জন্যে।

এক সেকেণ্ড মেয়েটার কচি তুলতুলে ফুটফুটে মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিরুদ্ধ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যায়।

কিন্তু দোষ কি উহাদের?

ছোট শিশু তো তোতাপাখীর জাত।

অথচ সকালে উঠিয়া আজ অকারণেই মনটা প্রসন্ন ছিল। যে ভয়াবহ মানসিক জড়তা দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া গ্রাস করিতেছে তাহাকে, কোন কারণে বলা শক্ত ওজনটা

তাহার যেন হালকা বোধ হইতেছিল আজ। এমনও মনে হইতেছিল কিছু একটা করিলে হয়···কোথাও দু'দিন ঘুরিয়া আসিলে হয়···কিছু না হো'ক—সহজ ভাবে সকলের কথায় যোগ দিলেও মন্দ হয় না। কিন্তু মিনুর কচি তুলতুলে মুখের ঝুনো কথা কয়টা মুহূর্তে নষ্ট করিয়া দিল সেই সহজ প্রসন্নতা।

তিন

পথের এধারে সারি সারি খান কয়েক বাড়ী, কাহারও নিতান্ত শ্রীহীন দশা, কাহারও বার্দ্ধক্যজীর্ণ দেহে নব যৌবনের প্রলেপ পড়িয়াছে।...যাহাদের নিজের বাড়ী বা পিতৃভিটা তাদের চূণবালি রাজমজুরের প্রয়োজন কস্মিনকালেও হয় না। দেয়ালের পলস্তারা খসিয়া ধূলাজঞ্জালে ঘর দালান নোংরা হয়, বৃষ্টিতে বিছানা মাহুর ভাসিয়া যায়, খিল ছিটকিনিহারা কপাটগুলা ঝড়ের সুযোগে প্রচণ্ড মাতামাতি সুরু করে, গরাদের পরিবর্ত্তে বাখারির বেড়া বাঁধা রান্নাঘরের জানলার পথে বিড়াল আর কাকেরা নিত্য গৃহস্থের মাছ হুধে ভাগ বসায়।... পুরুষেরা মেয়েদের অসাবধানতার ছুতায় তিরস্কার করে। মেয়েরা পুরুষদের অবহেলার ত্রুটি ধরিয়া গালি পাড়ে।

জলের কলের আলগা মুখ দিয়া অবিরাম জল পড়িতে থাকে, আর ঘোলা জলের ট্যাঙ্কে মাটি জমিয়া জমাট হইয়া থাকে, জল আসেনা।...অথচ দৈনন্দিন জীবনের কোনো আয়োজনেই ঘাটতি পড়ে না।

বরং ভাঁড়াটেরা সুখী।

তাহাদের আসাযাওয়ার মধ্যবর্ত্তী সময়ে এক একবার রঙের পোঁচ পড়ে। এখানে সেখানে জোড়াতালি দিয়া চলে

টুটাফুটার সংস্কার। সে সব অবশ্য বছর কয়েক আগের কথা। 'বোমাপালানি'র দল ফিরিয়া আসার পর হইতে কলিকাতা সহরের লোকের বাড়ীওঠার দুর্ভোগটা ঘুচিয়াছে। নড়িবার ঠাঁই নাই—নড়াইবারও আইন নাই।

মাসের দোসরা তেসরা তারিখ হইলেই হামেসা রাস্তায় রাস্তায়—লক্ষ্মীর হাঁড়ি হইতে সুরু করিয়া ছেঁড়াজুতা পর্য্যন্ত গৃহস্থালীর অজস্র উপকরণবাহক ধীরমন্থরগতি যে ঠ্যালা গাড়ীর দল চোখে পড়িত তাহারা বিরল।...ইভাকুয়েশানের হিড়িকে আগামী দশবছরের খাটুনী বোধকরি খাটিয়া লইয়াছে তাহারা।

ওই যুদ্ধেরই হিড়িকে একটা বড়গোছের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল সামনের তেতলা বাড়ীটায়। এ বাড়ীর মালিক ছিলেন গোবর্দ্ধন শীল, বড় মানুষ নয়—সম্পন্ন গৃহস্থ। দোল দুর্গোৎসব না হোক, বছরে একবার বিশ্বকর্ম্মা পূজায় যা ঘটা করিতেন সেটাও মন্দ নয়। নীচুজাত বলিয়া খুব বেশী তফাৎ পাড়ার লোকে করিতনা—হৃদ্যতা ছিল।—কিন্তু যুদ্ধের বাজারের অঘটনপটিয়সী অপূর্ব্ব মায়ায় কোথা দিয়া কি হইল বলা যায় না—শীল একেবারে লাল হইয়া বসিলেন।

কেউ বলিল 'কাঁটা পেরেক'—'কেউ বলিল 'জুতোর সুকতলা' —কেউ বলিল 'সুঁটকি মাছ'।

অনেকে বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"সে সব কিছু

ময়, চাল! বাপুহে অন্নের আর এক নাম লক্ষ্মী জানতো? সেই অন্নরূপা লক্ষ্মী যে হঠাৎ বাংলা দেশের আধকোটি মানুষের ঘর হইতে অকস্মাৎ ভোজবাজীর মত শূন্যে মিলাইয়া গেলেন, গেলেন কোথায়? দেব দেবীর তো মৃত্যু নাই যে 'মরিয়াছেন' বলিয়া হিসাব মিলাইয়া নিশ্চিন্ত হইব?...অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া অনেক ধৈর্য্যে ভোজবাজীর মন্ত্র যাহারা শিখিয়া লইয়াছিল তা'দের ঘরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছে লক্ষ্মীকে"—

ধারণা যার যাই হোক—গোবর্দ্ধনের বর্দ্ধনটা যে বেশ বড় গোছের হইয়াছিল সেটা ঠিক, অতএব বর্দ্ধিত গোবর্দ্ধনকে আর এই আধাগলির ভিতর ঘসাবাড়ীখানায় আঁটিলনা, ব্যবসায় সূত্রে পরিচিত সুরেশ ঘোষালকে বাড়ীখানা বেচিয়া দিয়া তিনি নিজের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে গেলেন।

বর্ত্তমান মালিক এই সুরেশ ঘোষাল।

তা' লোকটা যে ব্যবসায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাড়ী ঢুকিয়াই তিনি প্রথম আমদানী করিলেন একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ির, আর সারাবাড়ীটাকে ভাগ করিয়া ফেলিলেন নানাবিধ জ্যামিতিক কৌশলে। ভাড়ার টাকায় সংসার চলিলে মন্দ কি?...আপাততঃ বাড়ীটার উপর তলায় আছেন দুইটী মাদ্রাজী পরিবার, নীচের তলায় একঘর পূর্ব্ববঙ্গ, একঘর পশ্চিম বঙ্গ, আর একঘর মেদিনীপুরী। দোতলাটা সপরিবার সুরেশ বাবু নিজের দখলেই রাখিয়াছেন বটে, তবে একেবারে

নির্ভেজাল নয়। উহারই ভিতর একখানা ঘরে ঠাঁই লইয়াছেন স্কুলের "দিদিমণি" একজন।

কাজেই ঘোষাল পরিবারকেও নিজের পরিধি অনেকটাই সঙ্কুচিত করিয়া লইতে হইয়াছে। কোণের দিকের একখানি মাত্র ঘরে পাঁচটী ছেলে মেয়েকে মানাইয়া রাখিতে হয়।

দুপুর রাত্রে আলোজ্বালা ঘরে কে জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইবে সে সম্বন্ধে পাড়ার লোককে নিঃসন্দেহ করিতে মাধবীকে আলাদা একখানা ঘরতো ছাড়িয়া দিতে পারেন না সুরেশ বাবু!

মাধবী বড় হইয়াছে—তাই স্কুল ছাড়াইয়া লওয়া হইয়াছে। 'গেরস্থ ঘরের মেয়ে কাজকর্ম্ম শিখুক, মায়ের সাহায্য করুক, আর কেন'?···বেলা, শোভা, হাসি, কল্যাণীরা এবার ম্যাট্রিক দিল···পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইতে কতদিন আছে কে জানে—ভাঁড়ার ঘরের সামনে বঁটি পাতিয়া ডেঙোডাঁটা কুটিতে কুটিতে কথাগুলা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল মাধবী। ···হাসি আর কল্যাণী তো নিশ্চয়ই কলেজে ভর্ত্তি হইবে, বেলা কি করিবে বেলাই জানে।···শোভা অবশ্য শুধু এই পরীক্ষাটার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, বিয়ের সমস্ত ঠিক করা আছে তার।···কিন্তু মাধবীর মত কেউ নয়, আর মাসকয়েক থাকিলেই ম্যাট্রিকটা দেওয়া হইত মাধবীর, অথচ—

অকারণে খানিকটা জল উপচাইয়া পড়ে চোখে।···নীচের

তলার অরুণা। কত অবস্থা খারাপ তাহাদের, একরাশ ছোট ছোট ভাই বোন। মা সারাদিন ভূতের মত খাটিয়া মরে, তবু দশটা না বাজিতেই দুইদিকে বেণী দুলাইয়া আর ছাপা শাড়ীর আঁচল উড়াইয়া স্কুলে চলিয়া যায় অরুণা।...শুধুই কি অরুণা? তার দিদি অপর্ণা শুদ্ধ কলেজে ছোটে। ভোর বেলা —যখন বাড়ীর অর্দ্ধেক লোকের ঘুম ভাঙেনা—তখন অপর্ণা কলেজ গিয়াছে।

মাধবীর জন্যই কি তোলা ছিল রাজ্যের ডেঙোডাঁটা আর উচ্ছে?

চোখের জলটা মুছিয়া ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি ডাঁটাগুলা কাটিয়া স্তুপাকার করিতে থাকে। কে দেখিয়া ফেলিবে, আর দুইফোঁটা জলের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে সমুদ্র প্রমাণ।...অথচ সকালবেলা ঘুম ভাঙা হইতে কেবলই যেন কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে মাধবীর।

—মাধবী ও কি হচ্ছে?

মাধবী চমকিয়া তাকায়—মা।

স্নান সারিয়া আসিয়া ভিজাকাপড়ে দাঁড়াইয়াছেন। কচিছেলের মা—রাজ্যের কাঁথা কাপড় কাচিয়া স্নান করিতে তাঁহার বেলা আটটা বাজে।—সব ডাঁটাগুলো কুটে শেষ করলি? পাঁচবার বলে গেলাম না এক গাছা রেখে দিস কালকের জন্যে! যে কাজ করবে তাই উল্টো করে বসে থাকবে বাছা, তোমাদের নিয়ে হবে কি? ক'বার বলেছি?

একাধিক বার যে বলিয়াছেন সে কথা এখন মনে পড়ে, কিন্তু এতক্ষণ কি মাধবী এখানে ছিল? এই আনাজপাতির ঝুড়ির মধ্যে?

যম কেমন—'যমের মত ভয় করা' কা'কে বলে সেটা ঠিক নির্দ্ধারণ করা হয়তো সহজ নয়, কিন্তু মার চাইতে যে বেশী নয় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রতিমার ছেলে মেয়েরা। অপ্রতিভ ভাবে মাধবী তাড়াতাড়ি বলে—ডাঁটাতো সকলেই ভালবাসে মা, তাই ভাবলাম—

—তাই ভাবলে—খুব তো গিন্নী হয়েছ—তা'হলে এবার থেকে—তোমরাই করো সংসার। কাল থেকে আর আদিখ্যেতা করে জিগ্যেস করতে এসোনা 'মা কি রান্না হবে—কি কুটনো হ'বে'—অবাক করলে! মন কোন চুলোয় থাকে তাই ভাবি।

গম্‌গম্‌ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া যান প্রতিমা।

মেজবোন অতসীর এখনো স্কুলে যাওয়ার অনুমতি আছে, সকাল বেলাটা সে 'মীনা দিদিমণি'র কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে কিছু কাজ আদায় করিবার আশায়, সুরেশ বাবুই শিখাইয়া দিয়াছেন। স্কুলের মাষ্টারকে বাড়ীতে পাওয়া—কম সুবিধের কথা? ইক্‌মিক্ কুকারে রান্না চাপাইয়া যে অমূল্য সময়টুকু তিনি খবরের কাগজখানা লইয়া বসেন সেই সময়ে অতসী হাজির হইবে পড়ার বই আর অঙ্কের খাতা লইয়া।

এদিকে যেমন স্কুলের ছাত্রী তেমনি বাড়ীওয়ালার মেয়ে।

'না' করিতে চক্ষু লজ্জায় বাধে, তাই নিত্য সকাল বেলা মিস মীনা দত্তর সেই অমূল্য সময়টুকু হত হয় অতসীর আক্রমণে।

পড়াটা ভালমত বুঝিয়া লইয়া অতসী হৃষ্টচিত্তে দিদিমণির ঘর হইতে বাহির হইয়া এদিকে আসিতেই মাধবী শিথিল কণ্ঠে কহিল—অতস তোর পড়া হ'ল? ডালটা পুড়ে যায় কি না দেখবি একটু? শরীরটা কেমন করছে যেন, একবার শুয়ে নিই।

'দিদি' অতসীর দেবতা।

পিঠোপিঠি বোনের মত খুনস্থুড়িতো নাইই বরং উপরওয়ালা-দের রোষদৃষ্টির আওতা হইতে উভয়ে উভয়কে আগলাইয়া বেড়ায়। দিদির মুখের পানে চাহিয়া অতসী ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া ওঠে—ডাল দেখছি—কিন্তু কি হ'ল তোর দিদি? মাথা ঘুরছে? মাকে ডাকবো?

—এই খবরদার! পাগল হয়েছিস? রোস এক মিনিট শুয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু একমিনিটের মধ্যে 'ঠিক হওয়ার' পরিবর্তে যখন রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া অতসী বারবার 'দিদি দিদি' করিয়া ডাকিয়াও সাড়া পায় না—তখন মাকে না ডাকিয়া উপায় থাকেনা।

—সে আবার কি? কি হ'ল?

প্রতিমা উদ্বিগ্ন মুখে কোলের ছেলেকে নামাইয়া উঠিয়া আসেন।

—উনি বাড়ী নেই?

—না তো। বাবা তো সেই সাতটার সময় বেরিয়েছেন রতনচাঁদ না কার সঙ্গে দেখা করতে।

—এখন উপায়? তোমরা এইবার আমাকে পাগল করবে মা।···

মাধু! অ মাধু! মাধবী!···একি গো মেয়ে যে সাড়া দেয় না। আমি কি করি! হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন হতচ্ছাড়া মেয়ে! ডাকনা তোর দিদিমণিকে?···বলি একখানা পাখা আনবারও হুঁস হয়নি এতক্ষণ?

অনেক কর্ত্তব্য শোধ করার ভঙ্গীতে মেয়ের মাথার কাছে বসিয়া কাছে পড়িয়া থাকা একখানা ভাঙা শেলেট লইয়া বাতাস করিতে থাকেন প্রতিমা।

হ্যাঁ দিদিমণি একটা মানুষ বটে—যাঁহাকে ভরসা করা চলে। অতসী ছুটিয়া বাহির হইতে গিয়া ধাক্কা লাগে তাঁহারই সঙ্গে।···মাধবীর নাম ধরিয়া বারবার ডাকাডাকিটা কানে পৌঁছিয়াছে তাঁর।

—কি হয়েছে? মাধবী! মাধবী!···ফেণ্ট হয়ে গেছে দেখছি—তা আপনি কাঁদছেন কেন? থামুন।···

প্রায় ধমক দেয় মীনা প্রতিমাকে।

—মেয়ে যে সাড়া দিচ্ছে না গো—

—অজ্ঞান হয়ে গেলে সাড়া দেওয়া যায়? আপনার

সবই অদ্ভুত। ও কি রকম বাতাস হচ্ছে ?…অতসী, আমার ঘর থেকে পাখাটা আনো শিগগির।

ঘরের কোণ হইতে কুঁজোটা আনিয়া ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা চোখে মুখে দিয়া বাতাস করিতে করিতে মীনা মৃদুস্বরে বলে—ডাক্তার আনা দরকার—তোমার বাবা বাড়ী নেই না ?

অতসী মাথা নাড়ে।

—আচ্ছা একটু সামলাক—আমিই দেখছি, সামনের বাড়ীতেই একজন কে ডাক্তার আছেন না ?

—হ্যাঁ অনিরুদ্ধ বাবুর দাদা। লেখক অনিরুদ্ধ মিত্রের নাম শুনেছেন তো ?

মীনা মাথা নাড়িয়া যা বলে, শুনিয়াছে কি না বোঝা যায় না। আসল কথা, সময় তার এত বেশী নয় যে—পড়িবার মত ভালো বই বা খ্যাতিসম্পন্ন লেখকের লেখা ছাড়া—দেশী বিদেশী সকল বই নির্ব্বিচারে পড়িয়া উঠিবার সময় পাইবে।

কিন্তু প্রতিমার খটকা লাগে…মাধবী বড় হইলেও অতসীও তো শিশু নাই ? সন্দিগ্ধস্বরে বলেন—ওদের ছেলের নাম তুই জানলি কি করে ? কে লেখক, কে ডাক্তার, তাই বা কে বললে তোকে ?

—বলবে আবার কে ? পাড়ায় আছি এতদিন, জানা যায় না ?

—কিন্তু আমিও তো এতদিন আছি, কই কারুর নাড়ি নক্ষত্রর খবর তো রাখিনা ! দিনরাত জানালায় দাঁড়ানো ছাড়া আর কাজ নেই তোমাদের কিনা।

এক মেয়ের নৈতিক চিন্তায় আর এক মেয়ের জন্য দুর্ভাবনাটা যেন সহনীয় হইয়া আসে প্রতিমার।

...এরকম অবস্থা হবেনা মেয়েদের—মীনা ভাবে—শাসনে শাসনেই স্নায়ু শিরা সব এলিয়ে আছে বেচারাদের!—অতসী পা দুটো ভালো করে ঢেকে দাওতো দিদির—একটু তাকালে মনে হ'ল না?

... ...

হাঁ তাকাইয়াছে।

ঠাণ্ডা জলের উপর একটানা পাখার হাওয়ায় বোধকরি শিথিল স্নায়ুতন্ত্রী আবার কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিল মাধবীর।

—আচ্ছা আর একটু বাতাস কর অতসী, আমি দেখি ও বাড়ীতে ডাক্তারটীকে পাই কিনা।

—আবার ডাক্তার কেন?

প্রতিমা অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন—জ্ঞানতো হয়েছে—এই যে দিব্যি তাকাচ্ছে—মাধু একটু ভালো বোধ করছো মা?

মায়ের মুখে এমন অভূতপূর্ব্ব স্নেহ সম্বোধনটা বোধকরি মাধবীর সদ্যকার্য্যক্ষম স্নায়ুরা ঠিক বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারে না—হঠাৎ একঝলক জল আসিয়া চোখের কোণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে।

মীনা জানে এসব মানুষকে—প্রতিমার মত মানুষকে—জব্দ রাখা যায় শুধু ধমকে। নত হইলেই পাইয়া বসে। তাই ধমকের মত সুরেই বলে—আছে দরকার। দেখছেন না চোখ

মুখের চেহারা? ওষুধ দিতে হবে না? তাছাড়া—হঠাৎ এরকম হ'ল কেন সেটাও দেখা দরকার নয় কি?

—তবে যাও। উনি এসে আবার রাগ না করেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বে অনুমতি দেন প্রতিমা।

শাড়ীর আঁচলটা গায়ে টানিয়া লইয়া চটিজোড়ার মধ্যে প.. গলাইতে গলাইতে আপনার মনে হাসিয়া ফেলে মীনা।... আশ্চর্য্য 'উনি,' আর ততোধিক আশ্চর্য্য 'উনির' আতঙ্ক।—আচমকা একটা শক্ত রোগ হইলে বাড়ীতে ডাক্তার ডাকিবার স্বাধীনতাটুকুও নাই। অথচ 'গৃহিনী' নামের অপার গৌরব বহিয়া সংসারে চরিয়া বেড়ায় ইহারা। একি অন্ধ আনুগত্য মাত্র? না উপরওয়ালার চাপ? হয় তো—এইজন্যই দোষ দেওয়া যায় না প্রতিমাকে—প্রতিমার মত গৃহিনীদের। অধস্তনদের উপর শাসনের মাত্রায় মাত্রাজ্ঞান তার আসিবে কোথা হইতে—মাত্রাহীন শাসনের দুর্ব্বহ বোঝায় নিজেরই যার ঘাড় ভাঙিয়া আছে?

চার

অরুণেন্দু ডাক্তার। নেহাৎ সদ্যপাশকরাও নয়, ইতিমধ্যেই প্র্যাকটিস্‌টা জমাইয়া লইয়াছে বেশ। সারাদিন অনেকগুলা রোগী, আর সারারাত্রি একটিমাত্র রোগিণী লইয়া সে রীতিমত সুখেই আছে বলা যায়।···তবে অলকার রোগটা অদ্ভুত, স্বামী যতক্ষণ কাছে থাকে ততক্ষণই তার যত পাগলামী—রাগ অভিমান, কান্নাকাটি, মাথাধরা, বুক ধড়ফড়, আর মূর্চ্ছা সব-কিছু লক্ষণ তার দেখা দেয় স্বামীকে হাতের গোড়ায় পাইলেই। যে ডাক্তার নিজের স্ত্রীর অসুখ ভালো করিতে পারেনা কোন মুখে সে পরের অসুখ সারাইবার দায়ীত্ব নিতে যায়—বারবার এই কূট প্রশ্নটাই করিতে থাকে অলকা।

তবু অরুণেন্দু রাগিতে জানেনা। সমস্ত কটু কাটব্য সহাস্যে হজম করিয়া লয় 'অমৃতং বালভাষিতম্' হিসাবে।···মাথার যন্ত্রণায় যখন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে অলকা, নয়তো বুকের ধড়ফড়ানিতে বসিয়া থাকিতে পারেনা, তখন অনায়াসে 'সোডি-বাইকার্ব্বে'র ব্যবস্থা দিয়া হাসিতে হাসিতে ক্লাবে চলিয়া যায় অরুণেন্দু।

ফিট হইয়া পড়িয়া থাকিলে—উমাশশীকে নয়তো শান্তিকে ডাকিয়া বলে—দেখতো তোদের বৌদির আবার 'তাই'

হ'ল বুঝি, পাখাটা খুলে দে দিকিন, মেলা জলটল দিস্‌নি, সর্দ্দি হবে।

অতএব সুখে থাকিতে তাহার বাধা নাই।

অনিরুদ্ধর যেমন কিছুতেই আনন্দ নাই, অরুণেন্দুর তেমনি সব কিছুতেই আমোদ। বাড়ীতে একটা বড় মাছ আসিয়া পড়িলেও অরুণেন্দুর স্ফুর্ত্তির মাত্রা এত প্রবল হয়, মনে হয়—বড় রুইমাছের মুড়োর অভাবেই এতদিন আধমরা হইয়াছিল অরুণেন্দু।

পথে ঘাটে অরুণেন্দুকে দেখিয়াছে মীনা, তবে বাক্যালাপের প্রয়োজন হয় নাই কখনো, 'মিত্তিরবাড়ী'তে বেড়াইতে আসিবারও প্রয়োজন অনুভব করে নাই, তবে আজ নিতান্তই গরজ লইয়া আসা। নিজের গরজ না হোক পরের গরজেও—দায়ে পড়িয়া আসিতে হইয়াছে।

মিত্তিরবাড়ীর বৈঠকখানার দরজায় আসিয়া একবার মনে করিল—দূর হোক ফিরিয়াই যাই···কি দরকার? মাধবীর মা নিজেই যখন আবশ্যক অনুভব করেন নাই······কিন্তু না। ডাকিতেই বা বাধা কি? সে তো পর্দ্দানশীন নয়। তাছাড়া—নিজের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে যে কুণ্ঠা—সেটাকে সে মনে আসিতে দিবে কেন পরের বেলায়?···অবশেষে দ্বিধা কাটাইয়া একটা ছোট ছেলেকে ডাকিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করে—তোমার কাকা বাড়ী আছেন? যে কাকা ডাক্তার?

—এটা আমার মামার বাড়ী—গম্ভীর মুখে উত্তর করে ছেলেটী—কাকা আসবে কোথ্‌থেকে ?

কৌতুক লাগে।

মীনা হাসিয়া ফেলিয়া বলে—আচ্ছা বেশ মামাও তো আছেন ? ডাক্তার ?

—থাকবেনা কেন ? সেজ মামা তা'হলে কি ?

বলিয়া হাতের 'লেত্তি' ও লাট্টুর উপর গভীর মনঃসংযোগ করে ছেলেটী, ভদ্রমহিলাকে আর বেশী গ্রাহ্য করে না।···সহবৎ শিক্ষার বালাই বিশেষ নাই, থাকা সম্ভবও নয়। নানা বয়সের অনেক ছেলে মেয়ে জঙ্গলের আগাছার মত যেদিকে সেদিকে শাখা মেলিয়া যথেচ্ছভাবে বাড়িয়া ওঠে মাত্র।

খাওয়াপরা, মাষ্টার, স্কুল প্রভৃতি ব্যাপারে ত্রুটি অবশ্য বিশেষ নাই—কার্পণ্যও যে খুব আছে এমন নয়—কিন্তু গড়িয়া তোলা ? সে যে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। গোয়ালের গরুকে হঠাৎ 'মানুষ' করিতে চাহিলে তো চলে না। সুযোগ কোথা ? তা'ছাড়া—মানাইবে কেন ? এতগুলি বাঁকাচোরা অসমাপ্ত নমুনার মাঝখানে নিজস্ব একটীকে হঠাৎ সুন্দর সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার বায়না লইলে আশপাশের লোক কখনো ক্ষমা করে ? নিন্দনীয় ব্যাপারে নিন্দা তাহারা করিবেই।

অতএব 'কেষ্টর জীব' কেষ্ট বুঝিবেন তাই বলিয়া নিজের সুনামের ক্ষতি ? সর্ব্বনাশ! ইচ্ছা থাকিলেও ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো চিন্তা মনের মধ্যে ঠাঁই দিতে পারে না কেউ।

এক্ষেত্রে—ছেলেরা ক্লাশ প্রমোশন পাইলেই যথেষ্ট। নম্বর বেশী পাইলে পুত্রগর্ব্বে স্ফীত হওয়াও চলে। আর মেয়েরা? সে তো পরের ভোগের জন্য, 'মেয়ে দেখাইবার' কালে বলিবার মত দু'চারটী জিনিস শিখিয়া রাখিলেই ঢের।

তা' এবাড়ীর মেয়েরা নেহাৎ ফেলনা নয়। সুক্ত, মোচার ঘণ্ট রাঁধিতে ও হারে না—আবার বক্স হারমোনিয়ম কোলে টানিয়া অর্দ্ধএলায়িত ভঙ্গীতে বসিয়া রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনাইয়া দিতেও পারে।

কিন্তু সে কথা থাক্। বর্ত্তমান সমস্যা—এ বাড়ীর মেয়েদের নয়, ও বাড়ীর মেয়ের। মীনা যে সমস্যা বহন করিয়া আনিয়াছে।

ছেলেটীকে আর একবার ডাক দিয়া বলে—আচ্ছা তোমার সেজমামা—আছেন তিনি?

—খুব আছেন। মনের সুখে এখন লুচির দিস্তে ওড়াচ্ছেন।

চমৎকৃত মীনা বলে—তাঁকে একবার খবর দাও গে দিকিন—বলোগে—সামনে বাড়ীর একটী মেয়ের হঠাৎ অসুখ করেছে, দেখতে যেতে পারবেন?

ছেলেটী অসঙ্কোচ স্বরে প্রতিপ্রশ্ন করে—ব্যাগারের তো? তাহলে ডেকে দেব না; সেজমামী আস্ত রাখবেনা আমাকে।

লাট্টু সম্বন্ধে আবার তৎপর হইয়া ওঠে সে।

হতাশ মীনা ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হয়, ডাক্তারের

উপরও বড় বেশী শ্রদ্ধা থাকে না। ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই দেখা অনিরুদ্ধর সঙ্গে, সেই মাত্র বোধ করি বেড়াইয়া ফিরিতেছিল।

মুখচেনা থাকিলেও পথে দেখা হইলে বিনা প্রয়োজনে ভদ্রমহিলার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিবার সখ অনিরুদ্ধর নাই। কাজেই অনেক সময় মুখোমুখি হইলেও পরস্পরকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু এটা নিতান্তই ঘরের ঘোরের ব্যাপার বলিয়া অনিরুদ্ধ মীনার আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করে।···

—মাধবী? মাধবীর অসুখ করেছে?

—হ্যাঁ। চেনেন নাকি মাধবীকে?

অনিরুদ্ধ ধাতস্থ হইয়াছে, গম্ভীর ভাবে বলে—পাড়ার মেয়ে—নাম চিনে রাখা আর শক্ত কি? কিন্তু ডাক্তার না নিয়েই যাচ্ছেন যে?

—তিনি তো শুনলাম ব্যাগারের রুগী দেখেন না—সেজমামী তা'হলে আস্ত রাখেন না।

একটু বাঁকা হাসি দেখা দিবে বৈ কি, স্বাভাবিক সেটা। ব্যাপারটা বুঝিতে অনিরুদ্ধর দেরী লাগে না।

—বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের কারো মুখে শুনলেন বুঝি? সেজবৌদি পাগল। কিন্তু দাঁড়ান আমি ডেকে দিচ্ছি।

লজ্জায় তাহার দুই কাণ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

•

কিছুক্ষণ পরে অরুণেন্দু বাহিরে আসে, সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধও।

অরুণেন্দু স্বাভাবিক দরাজ গলায় বলিয়া ওঠে—কি ব্যাপার? অসুখ কার? সুরেশ বাবুর মেয়ের? কি হ'ল হঠাৎ?···ফেন্ট হয়ে পড়েছে? বিবাহিতা?···নয়? বলেন কি? ভাবিয়ে তুললেন যে—মাথা ধরে? বুক ধড়ফড় করে? অকারণ মন খারাপ লাগে?—

—আঃ সেজদা কী হচ্ছে?

—আচ্ছা আচ্ছা চলুন চলুন কিছু মনে করবেন না। আমার ওস্তাদ ভাগ্নেটী খুব ঘাবড়ে দিয়েছিল আপনাকে, কি বলেন? ওরা সব আগামী যুগের জন্যে তৈরি হচ্ছে কি না—ঘোরতর প্র্যাকটিকাল।

—শিক্ষাটা তো দিচ্ছেন বর্ত্তমান যুগের অভিভাবকরাই।

মীনার কণ্ঠের শ্লেষের সুর ঢাকা পড়েনা।

—শিক্ষা? পাগল হয়েছেন? ওরাই আমাদের শিক্ষা দিয়ে দিতে পারে। তবে—"সেজমামীর" কথা স্বতন্ত্র।

বলিয়া মুচকি হাসে।

ডাক্তার ডাকিতে আসিয়া আচ্ছা কৌতুক! মীনা অরুণেন্দুর সেলের চশমা পরা নীটোল মুখখানির উপর একনজর চাহিয়া বলে—আপনিই তো সেজমামা না?

—চিনেছেন তো? ভাগ্যবান লোকদের দেখলেই চেনা যায়।

সুরেশ বাবুর খোলা দরজার ভিতর উভয়ের অপস্রিয়মান মুর্ত্তি মিলাইয়া যায়···এ বাড়ীর চৌকাঠে দাঁড়াইয়া অনিরুদ্ধ ভাবিতে

থাকে।···না মাধবীর অসুখের কথা নয়—ভাবিতে থাকে নিজের অতীতের কথা।···পদার্থ বিত্তার চর্চ্চা না করিয়া চিকিৎসা বিত্তা শিখিলেই বা ক্ষতি কি ছিল?···সব সময় সব বুদ্ধি যোগায় না কেন?······

ডাক্তারকে লোকে কত সহজে অন্তরঙ্গের মত অন্তঃপুরের দরজা খুলিয়া দেয়।······

এদিকে ভিতর বাড়ীতে তখন এই সামান্য ঘটনাটুকু কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে সেটা নেহাৎ সামান্য নয়। বাড়ীর মধ্যে আসিয়া অনিরুদ্ধ শুধু বাড়ীর ছেলেদের ভব্যতার অভাবের মূল কারণ সম্বন্ধে একটা তীক্ষ্ণ মন্তব্য করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু পিছনে তর্ক উঠিয়াছে উদ্দাম। 'সেজমামী' বা অলকা এ হেন 'মিথ্যুক' 'নিন্দেকুটে' 'লাগানে' ছেলের উদ্দেশে যা মত প্রকাশ করিলেন তাহা এই—নেহাৎ পরের ছেলে বলিয়াই অমন ছেলে এ যাত্রা তরিয়া গেল, অলকার নিজের ছেলে হইলে অলকা ও ছেলেকে খুঁটিতে বাঁধিয়া জলবিছুটি লাগাইত।

কি হইলে কি হইত সে বিবেচনা পরে, কিন্তু সেই—নিরবয়ব জলবিছুটির জ্বালায় যে তিড়বিড় করিয়া উঠিল সে বাসন্তী, আসামী বালকের মা। শ্বশুরঘরে অভাবের সংসার। শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনা ইত্যাদির ছুতায় বছরের অধিকাংশ কাল বাপের বাড়ী কাটাইয়া যায়। কাজেই রসনাকে খাটো করিতে শেখে নাই।

সবেমাত্র—বালক বালিকা এবং পুরুষদের জলযোগের পাট মিটিয়া 'বৌ ঝি'র চায়ের আসর বসিয়াছে।···পোর্সিলেনের পেয়ালা হইতে সুরু করিয়া রংচটা এনামেলের বাটি ও কানা-ভাঙা মোটা কাঁচের গ্লাস পর্য্যন্ত সবাই আছে এ আসরে। ···সত্যিকার ভালো পেয়ালায় চা খাওয়ার কথা এখন আর বড় কারো মনেও পড়েনা। যে কয়টা নেহাৎ ভালো—তোলা থাকে অতিথি অভ্যাগতের জন্য। বাসনওয়ালীর কাছে ছেঁড়া কাপড়ের বিনিময়ে কেনা মোটা মোটা দেশী কাপগুলা আছে পুরুষদের ভাগ্যে, মেয়েদের ভাগ্যে হাতলভাঙা প্লেট বিহীন ছু'একটা সে যুগের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে মিশিয়াছে এযুগের লোহার বাটি, কাঁচের গ্লাস।···দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিক্ষা।

যুদ্ধ আমাদের শিক্ষা দিয়াছে বৈকি! অনেক শিক্ষা অনেক উপকার লাভ হইয়াছে এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কছে।··· ভালোমন্দ বিচারের খুঁৎখুঁতুনি আমাদের ঘুচিয়াছে, সামান্যকে যথেষ্ট বলিয়া মানিতে শিখিয়াছি।

তবু ওরই মধ্যে যারা নেহাৎই খুঁৎকাটা স্বভাবের তাদের বরাদ্দে একটু বিশেষ ব্যবস্থা রাখিতেই হয়।···কাঁসার রেকাবে বসানো বাহারী পোর্সিলেনের পেয়ালাটা হাতে তুলিতে গিয়া নামাইয়া রাখিয়া বাসন্তী তেলে-বেগুনে জ্বলা স্বরে বলিয়া ওঠে—তা'তো তুমি বলবেই সেজবৌদি, তোমার মুখে নইলে কার মুখে শোভা পাবে এমন কথা? ছেলের মর্ম্ম যদি বুঝতে

তা'হলে আর এতবড় কথা মুখে আনতে পারতে না।···ভগবান কি আর সাধে বঞ্চিত করেছেন ?

মেজবৌ নীলিমা আবার যেমন ভালমানুষ তেমনি ভীতু। একটা প্রবল ঝড়ের সূচনা দেখিয়াই সে ব্যস্ত কাতর ভাবে দু'দিক সামলাইতে বসে—ওকি বাসু ঠাকুরঝি, ছিঃ ওকথা কি বলতে আছে ? তা'ছাড়া—সেজবৌয়ের কি আর হবার বয়েস পেরিয়ে গেছে ? এই তো—আমার বাপের বাড়ীর পাড়ায়—

—থাক মেজদি, তোমার বাপের বাড়ীর পাড়াকে আর টেনে এনে কাজ নেই—বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছে।

বলিয়া ঠোঁটের কোণে একটু বিষহাসির আভাস টানিয়া আনিয়া অলকা চায়ের গ্লাস আর খাবারের পাত্রটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

—এই এক পাগল—উঠে পড়ছিস কেন সেজবৌ ? ছিঃ ছিঃ এতখানি বেলা হয়েছে কিছু খাওয়া হয়নি—

—যথেষ্ট খেয়েছি, এ বাড়ীতে ঢুকে পর্য্যন্ত বাক্যবাণ যা খেলাম আর খাচ্ছি, চোখে দেখবার জিনিষ হলে পৃথিবী চমকে যেতো।

বলিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতে উদ্যত হয় অলকা।

ফর্সা মুখে টকটকে আভা দেখিয়া নীলিমার আর ভয়ের সীমা থাকেনা, এই আরক্ত মুখ আর আতপ্ত কাণ লইয়া গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে ঠিক অরুণেন্দু আসিবার

প্রাক্কালে যে ফিট্ হইয়া পড়িবে অলকার, একথা তো আর জানিতে বাকী নাই তাহার।

বয়সে বড় বলিয়া সেজঠাকুরপোর সঙ্গে কথা বলেনা নীলিমা, ঘোমটা দিয়া চলে—কিন্তু ভারী মায়া হয় তার উপর··· আর আশ্চর্য্য লাগে নিজের স্বামীর কথা মনে করিয়া। এক মায়ের পেটের সন্তান অথচ কী আকাশ পাতাল তফাৎ দুই ভায়ে। তার স্বামীটি যেমনি রাগী তেমনি গোঁয়ার, রাগিলে কাণ্ডজ্ঞানের বালাই থাকেনা।···'মেজদাদাবাবু' অথবা 'মেজকাকা' এ বাড়ীর বিভীষিকা।....শুধুই কি বাড়ীর ছেলে-পুলের, আর চাকর বাকরের?···নীলিমার?

—আমার মাথা খাও সেজ বৌ, এসো—

নীলিমা হাত চাপিয়া ধরে ছোট জায়ের।

—তোমার মাথাতো বাড়ীশুদ্ধ লোকের কাছে বিকিয়ে রেখেছো মেজদি, ওতে আমার কিছু রুচি নেই। ছাড়ো, খাবার প্রবৃত্তি আর নেই।

—মুখের জিনিস ফেলে উঠলে—মা লক্ষ্মী কুপিত হ'ন সেজবৌ, আজকের মত—

নীলিমার করুণ কণ্ঠ নির্ব্বাক করিয়া দিয়া রঙ্গমঞ্চে উদয় হইয়াই চড়া স্বরের পর্দ্দায় ঘা দিলেন পিসশ্বাশুড়ী জ্ঞানদা।

তা' বাপ মা মিছা নাম রাখেন নাই—জ্ঞান দিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে।

—খোসামোদ করতে তোমার লজ্জা করে না মেজবৌমা?...বলি—সেজবৌমা রেগে ঠরঠর করে চলে যাচ্ছো যে? মেয়েমানুষের এত অহঙ্কার তো ভালো নয়! বাসুকে যা মুখে আসে তাই অপমান করলে—ছেলেটাকে নাহক্ গালমন্দ করলে, আবার তেজ দেখিয়ে খাবার ফেলে চলে যাচ্ছো—কেন বাছা?

—অপমান আমি কাউকে করিনি—নিজের মান নিজে রাখতে জানলে অপমানী হতেও হয়না কারুর।

শাড়ীর আঁচলে জোরে জোরে কপালের কাল্পনিক ঘাম মুছিতে থাকে অলকা।

পিসিমাকে 'ভয়ভক্তি' সকলেই করে, করেনা কেবল অলকা।

—বাসুকে তুমি অপমান করোনি?

—না।

চা এবং খাবারের পাত্রটা নিঃশেষ করিতে ব্যস্ত ছিল বাসন্তী, এইবার উঠিয়া আসিয়া ফোঁস্ করিয়া বলে—করোনি? আমার ওই একফোঁটা রোগা ছেলেকে জলবিছুটি লাগাবার কথা বলনি তুমি? কেন ও কি মিছে কথা বলেছে? সেজদার রুগী এলে দূর করে দিতে বলনা তুমি?...এই তো সেদিন আমার সামনেই সেজদাকে বললে—যতরাজ্যের ব্যাগারের রুগী দূর করে দিতে পারনা?

—তোমার সেজদাকে আমি কি বলি না বলি সে কথা সমাজে ওঠে কেন বলতে পারো? আমি যদি কারুর ঘরে

আগুন দিতে বলি ? আমি যদি কাউকে বিষ দিতে বলি ? তা'তে কার কি ? যাকে বলবো সে বুঝবে।···কিন্তু থাক- এই রকম 'হাড়াই ডোমাই' কাণ্ড করতে তোমাদের লজ্জা করে না—আমার মাথাটা কাটা যায়।···

আপনার শয্যায় গিয়া যেভাবে মাথাটা লুটাইয়া শুইয়া পড়ে অলকা, আশঙ্কা হয় কাটিয়াই পড়িল বুঝিবা।

বাপের বাড়ী পড়িয়া থাকে বলিয়াই যে ভাজেরা এত অপমান করিতে সাহসী হয়—ভাইদের সায় না থাকিলে যে পরের মেয়ের এতদূর আস্পর্দ্ধা সম্ভব হইত না—সেজদার মত 'মেনিমুখো' পুরুষের যে শাড়ী পরিয়া হেঁসেলে বসিলেই মানাইত—এসব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া বাসন্তী প্রতিজ্ঞা করে—এবাড়ীতে আর নয়···এমন অপমানের অন্ন যে খায় সে—ইত্যাদি ইত্যাদি। এক নীলিমা ছাড়া অবশ্য আর বিশেষ কেউ ভয় পায় না। দিন দুইবেলা এই একই প্রতিজ্ঞা করে বাসন্তী।

সকাল বেলাটা—হেমলতা ঠাকুর ঘরেই কাটান, নীচের তলার কলহ কিচিকিচি উর্দ্ধলোক অবধি পৌঁছায় না এই সুবিধা।

পাঁচ

রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় মীনা দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসে, অরুণেন্দু ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলে—মেয়েটীকে একটু সাবধানে রাখবেন, বড় বেশী উইক্। আচ্ছা অসুখ কি প্রায়ই হয় ?

—না, এমনি জ্বর টর কই হ'তে দেখিনা তো বিশেষ, কিন্তু সাবধানে রাখার কথা বলছেন ? আমি কি তার মালিক ? নেহাৎই পর মাত্র। তবে ভারী মায়া লাগে, ছেলেমানুষ— এত পরিশ্রম করতে হয় দেখলে অবাক লাগে।

—কেন বলুন তো—সুরেশ বাবুর অবস্থাতো—

—হ্যাঁ অবস্থা ভালই, কিন্তু একশ্রেণীর লোক আছে জানেন তো, যারা ব্যবস্থার গুণে অবস্থাকে দুরবস্থা করে রাখতেই ভালবাসে। মানুষের মত বাঁচতে এরা চায় না— শুধু বেঁচে থাকতে পেলেই সন্তুষ্ট।...সত্যি বলতে কি, মোটে ভাল লাগেনা আমার, চলে যেতে পেলে বেঁচে যাই, কিন্তু স্কুলটাও কাছে—তা'ছাড়া একখানা ঘর জোগাড় করাও অসম্ভব। সন্ধানে থাকে তো বলুন না ?—বেশ শান্তিতে থাকতে পারি এমনি একটা আস্তানা—

মীনা সাধারণতঃ কম কথার মানুষ, বাড়ীতে এত ঘর

ভাড়াটে আছে—সুরেশবাবু স্বয়ং আছেন পাশাপাশি ঘরে—কিন্তু মাসে একটা কথা কাহারও সঙ্গে কয় কিনা সন্দেহ, অথচ অরুণেন্দুর সঙ্গে দুইদণ্ড আলাপ করিবার ইচ্ছা হয় কেন? এত অল্প পরিচয়ে অন্তরঙ্গের মত সুবিধা অসুবিধার কথা জানাইবার মেয়ে তো নয় মীনা।

মীনার পক্ষে একটু আশ্চর্য্য বৈকি।

ডাক্তার ভদ্রলোককে হঠাৎ ভালো লাগিয়া গেল নাকি তাহার? এমন হঠাৎ ভালো লাগা তো ভালো নয়।···

··· ··· ··· ···

কালো 'সেলের' বেষ্টনীবদ্ধ পুরু লেন্সের ভিতর হইতে চোখের দৃষ্টিটা কেমন একটু গভীর দেখায় না? তা' নয় তো অরুণেন্দুর কি দায় মীনার মত এমন অসাধারণত্ব বর্জ্জিত নেহাৎ সাদাসিধে শ্যামবর্ণ মেয়েটীর মুখের পানে অমন গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিবার?···যখন উত্তরটা দিলে নেহাৎই হালকা।

—শান্তির সন্ধান চান? আমার কাছে? সেই যে কী একটা গল্প আছে না—কাণা অন্ধকে ডেকে বললে 'ভাই রে—পথটা চিনিয়ে দে।'

—তার মানে?

—মানে আর বুঝতে হবে না।· আচ্ছা মেয়েটী কেমন থাকে খবর দেবেন—দরকার বুঝি ওবেলা দেখে যাবো একবার ···নমস্কার।

—নমস্কার।···খবর দেবো, যদি সুরেশ বাবু এসে আমার জন্য লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা না করেন।

—বলেন কি? অপরাধ?

—অপরাধ অনধিকার চর্চ্চা।

—বা-রে, মজার লোক তো!···পৃথিবীটা একটা বড়গোছের চিড়িয়াখানা, কি বলেন?···আচ্ছা নমস্কার···চল্লি।

—নমস্কার।

··· ··· ···

আচ্ছা একদিন স্কুল কামাই করিলে কেমন হয়? ধরো যদি আজকের এই মেঘলা দুপুরটা কাটাইয়া আসা যায়···বেলুড়··· ব্যারাকপুর···বোটানিক্যাল গার্ডেনে.?···যাওয়ার পথটা কি নোংরা বিশ্রী! হাজার মানুষের নিঃশ্বাসে ভারাক্রান্ত ট্রাম বাসের কথা স্মরণ করিলে ও সব কবিত্ব দাঁড়াইবার ঠাঁই পায় না।···তার চাইতে মন্দকি নিজের ঘরে অলস ভঙ্গীতে বিছানায় পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ পড়া?···

আচ্ছা ডাক্তার বাবুর স্ত্রীটি কি সত্যই দুর্দ্দান্ত?

অমন হাসিখুসি ভদ্রলোক!···

—ডাক্তার কি বলে গেল বাছা?···

সিঁড়ির উপর হইতে প্রতিমার উদ্বিগ্নকণ্ঠ শোনা যায়।

কী আশ্চর্য্য, মীনা এমন বোকার মত দাঁড়াইয়া

আছে কেন? তাহার জন্য কেউ উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে সে কথা খেয়ালই নাই···অভ্যাস তো নাই কখনো।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বলে—বললেন আর কি! মানে ভয়ের কিছু নেই, তবে একটু সাবধানে রাখবেন, বড় বেশী দুর্ব্বল।

—কি জানি কিসের দুর্ব্বলতা তাও বুঝিনে—প্রতিমা নিঃশ্বাস ফেলিয়া দীর্ঘ.বিলম্বিত স্বরে কথা শেষ করেন—গেরস্থ ঘরের মেয়ে ডালভাত খাবে, খাটবে খুটবে—তাই জানি,' এ সব যে আজকাল কি ফ্যাসানই হ'ল!···তবু তো বে'থা হয়নি, আমরা অমন বয়সে দু'ছেলের মা হয়েছি।···যাক গে—ভয়ের কিছু নেই বলেছে তো? তুমি সেই ডাক্তারের পেছু পেছু নেবে গেলে—আর আসছোনা দেখে ভয়ে মরি···আগের থেকে চেনা জানা ছিল বুঝি?

—চেনা জানা? কই? কেন? না তো—

—না তাই বলছি।

প্রতিমা এবার আর মেয়ের ঘরে না ঢুকিয়া রান্নাঘরের তদারকে যান। সেখানে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর আকস্মিক অন্তর্ধানে বিশৃঙ্খলা তো কম হয় নাই।

দশটা বাজিয়া গেল।

সাড়ে দশটায় হাজিরা দিতে হইবে স্কুলে।···কত কাজ এখনো মীনার···তাড়াতাড়ি সারিয়া নেওয়া ছাড়া

উপায় নাই···পাগল তো নয় যে খামোকা কামাই করিয়া বসিবে ?

লোকটা অতি চামার বুঝলি নিরু !

বাড়ী ঢুকিতেই সামনে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া অরুণেন্দু আপনার রুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করে।···

অনিরুদ্ধ কি সেই একই ভাবে পথের সামনে দাঁড়াইয়াছিল না কি ? না দৈবগতিকে আবার আসিয়া পড়িয়াছে ? অরুণেন্দু জোর দিয়া বলে—সামনের বাড়ীর স্থরেশ বাবুর কথা বলছি—নাঃ তোমাদের শাস্ত্রে বুঝি আবার পরনিন্দা মহাপাপ।···যাকগে বরং তোদের সেজবৌদির কাছে জমিয়ে তুলি গে—যে এপ্রিসিয়েট করবে।

—জমিয়ে ? সেটা বোধকরি তিনিই এতক্ষণে তুলেছেন। কুরুক্ষেত্রের প্রথম পর্ব্ব হয়ে গেছে ইতিমধ্যে ।

—হয়ে গেছে ? বেশ বেশ।

অনিরুদ্ধ অবাক দৃষ্টিতে সেজদার গতিভঙ্গী লক্ষ্য করে।··· লাফাইয়া লাফাইয়া সিঁড়ি উঠিতেছে।···সেজদা কিছুতেই দমেনা কেন ? সেজবৌদিকে দেখিলে—মাঝে মাঝে অনিরুদ্ধর তো—যাক অনিরুদ্ধর কি মনে হয় না হয় সে কথা না তোলাই ভালো, কিন্তু অরুণেন্দু এমন হাসিমুখে সহ্য করে যেন দুরন্ত শিশুর দৌরাত্ম্য উপভোগ করিতেছে।···

কোথায় আছে এই সহ্য শক্তির উৎস ? অষ্টপ্রহর যে আবেষ্টনীতে প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিতেছে অনিরুদ্ধর, সেখানে অরুণেন্দুকে কে জোগায় এতো স্ফূর্ত্তি ?···অলকা ? আর কারও হাতে পড়িলে কি অলকাকে মার খাইতে হইত না ?··· ভদ্রঘরে জন্মানোর গৌরব সত্ত্বেও ?

ছয়

টিফিনের সময় গ্রেপ্তার করিল তটিনী বোস।

—এই মীনা আজ তোর কি হয়েছে রে ?

—কেন ? কি হবে হঠাৎ ?

মীনা অবাক হইয়া তাকায়।

—হয়েছে সামথিং, দু'দুবার ডাকলাম শুনতেই পেলিনা।

—তা'হলে বোধ হয় কাণের দোষ হয়েছে।

—উঁহু আমাকে ও সব বলে ভোলাতে পারবেনা, চলো শুনিগে তোমার গুপ্তকথা।

তটিনী বোস টানিয়া লইয়া যায় মীনাকে বোর্ডিংের দিকে। নিজে সে বোর্ডিংে থাকে।

খাবার ঘরে মেয়েরা হুল্লোড় সুরু করিয়াছে। পাশের একটা ছোটঘরে যে কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী বোর্ডিংে থাকেন তাঁদের টিফিন রুম।...মাঝে মাঝে তটিনী মীনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে এখানে।...

সে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, কলিকাতার মধ্যেই নিজেদের বাড়ী, বাপ ভাই আছেন, তবু কেন যে নিজেকে নির্ব্বাসন দিয়া

রাখিয়াছে সেই জানে। প্রশ্ন করিলে হাসে—বলে—"বড় বেশী গোলমাল।"

পাচককে খাবারের অর্ডার দিয়া তটিনী বলে—তা'পর বলো দিকিন কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার তুমিই বলতে পারো, আমি তো জানিনা।

—আচ্ছা বেশ। দেখি, আগুন কি আর চাপা থাকবে ?

—কী পাগলামি জুড়ে দিলি ? তোর নিজেরই বুঝি হঠাৎ ঘরে আগুন লেগেছে ? তাই সব অগ্নিময় দেখছিস।

—আমার ?

রহস্যময় হাসি হাসিয়া তটিনী বলে—এখানে সবই ভস্ম, আগুন লাগবার আর কিছু নেই।···এই পরমেশ্বর উড়ে, কি রেঁধেছিস আজকে ? শুধু আলুর দম ? ডিমের বড়া ভাজিসনি ? পটল ভাজা ? তাও না ? ধুত্তোরি—যা যা বেশী করে দই নিয়ে আয়, এই নে টাকা। বেশী চুরি করিসনি, কম করে নিস।

বাচ্ছা বামুনটা হাসিতে হাসিতে ছোটে দই আনিতে।

—এই মীনা ছুটিতে কোথায় যাচ্ছিস ?

—আমি ? যমের বাড়ী গেলে হয়।

—দি আইডিয়া ! তা'চল্ বৈতরণী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিই।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ—মহাসমুদ্রের এপার পর্য্যন্ত। তারপর "ওপার হ'তে যা সঙ্গীত ভেসে আসে" শুনো বসে বসে।···সত্যি যাবি পুরী ?

—কেন যাচ্ছিস নাকি ?

—মনে তো করছি।

—ছুটিটাও বাড়ী থাকবি না ? সত্যি আশ্চর্য্য ! মার জন্মেও মন কেমন করেনা তোর ?···আমি তো ভাবি আমার যদি ঘর বাড়ী মা বাপ থাকতো তা'হলে কেটে ফেললেও এই হতচ্ছাড়া কাজ করতে আসতুম না। ভালো লাগে তোর ?

—ভালো লাগে ? যমের অরুচি।

—তবে ? ছুটিটা পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকতে চাস না—

—চাইনা নয় ঠিক, বরং বলতে পারো থাকতে পারিনা। আসল কথা কি জানিস—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া বাহিরের মেঘলা আকাশের পানে দৃষ্টি মেলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে তটিনী।

—কি আসল কথা ?

—আসল কথা হচ্ছে—হিংসে ! হিংসের জ্বালায় বাড়ীতে টি*কতে পারিনে। হাসছিস ? কিন্তু মিথ্যে নয়, আমি নিজেই, কি বলে তোমাদের—'মনো বিশ্লেষণ' করে দেখেছি ওছাড়া আর কোনো সংজ্ঞা দেওয়া যায়না, স্রেফ্ হিংসে। বৌদিরা সব উড়ে এসে জুড়ে বসে জমিজায়গা দখল করে দিব্যি জমিয়ে নিলেন···মা বাপ বুদ্ধিমানের মত নিজেদের পরিধিটা সঙ্কুচিত করে নিয়েছেন, আর আমার অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত।···চির-দিনের জায়গায় হঠাৎ নিজেকেই যেন কেমন বেমানান বাড়্তি জিনিস মনে হ'তে লাগলো, তা'ছাড়া—অহোরাত্র ওনাদের

দাম্পত্যলীলার দর্শক হয়ে থাকা সে এক সাংঘাতিক বিড়ম্বনা, বাপস্।...এ বাবা দিব্যি আছি। ছোড়দা যে কি করে বাস করে তাই ভাবি।

—তা' কেবলমাত্র সে লীলার দর্শক না হয়ে নিজের ব্যবস্থা করে নিলেই তো গোল মিটে যায়?

—ওই তো—গলদ তো ওইখানেই, "এ হৃদয় ভস্মময়" বুঝলে!

হেসে ওঠে তটিনী।

—কি জানি—রহস্যময়ী না হতাশ প্রেমিকা কে জানে।... একলাই যাচ্ছো পুরী? "সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরী মালা?"

—নাঃ। এবারে মার সঙ্গেই যাচ্ছি। মার স্বাস্থ্যটা ইদানীং বড় খারাপ হয়ে গেছে তাই ছোড়দা যাচ্ছে মাকে নিয়ে চেঞ্জে, ভাবলাম—ওর মাতৃসেবার পুণ্যটায় কিছু ভাগ বসাই। চল না আমাদের সঙ্গে?

মীনা কুণ্ঠিত না হইয়া পারে না।

তটিনীর সঙ্গে অবস্থার তফাৎ তাহার আকাশ পাতাল, একথা তটিনীও না জানে এমন নয়, তবু কেন যে তাহাকে সমশ্রেণীভুক্ত করিতে চায়! তটিনীর মত খুসির খেয়ালে চলিবার সামর্থ্য কি মীনার আছে? খরচ খরচা অবশ্য তটিনীই করিবে সেটা ঠিক, বন্ধুত্বের দাবীতে কুণ্ঠা ত্যাগ করিয়া নেওয়াও গেল না হয় সেটুকু, কিন্তু শুধুই কি তাই?...ছুটির দু'মাস

বাজে নষ্ট করার বদলে সে একটা টিউশনি জোগাড় করিয়াছে—পড়ানোর নয়, সেলাই শেখানোর—পাকা কথা কহিয়া আসিয়াছে সেদিন।…তা'ছাড়া—ছুটির মধ্যে নিজেই সে খানিকটা টাইপ-রাইটিং শিখিয়া লইবার মনস্থ করিয়া রাখিয়াছে—সামান্য কিছু জানা আছে, ভালভাবে আয়ত্ত নাই বিদ্যাটা। হাতটা দুরস্ত হইলে—ক্লান্তিকর "দিদিমণিগিরি" ছাড়িয়া কোনো অফিসেও তো কাজ জুটাইয়া লইতে পারে ভবিষ্যতে!…সব ছাড়িয়া দিলেও—যেটা নেহাৎই তুচ্ছ ব্যাপার অথচ তুচ্ছ করা চলেনা—বসন ভূষণের অপ্রাচুর্য্য! লোকের কাছে বলার মত নয়, অথচ লোকের বাড়ী থাকিতে যাওয়ার পক্ষে কী প্রকাণ্ড বাধা!…তার সেই স্বল্পায়তন সুটকেসটী সম্বল করিয়া পাড়ি দিলে ক'দিন সভ্যতা বজায় রাখা চলিবে? নেহাৎ স্কুলে আসার জন্য খানকয়েক সাদা শাড়ী ব্লাউজ করাইয়া রাখিয়াছে—সস্তার চটকদার পোষাকের চাইতে সাদাই ভালো এই হিসাবে। প্রজাপতিমার্কা দিদিমণিরা হয়তো অনেকেই এটা তার একরকম চাল বলিয়া গণ্য করেন কিন্তু মীনা তো জানে মনটা তার সত্যই একেবারে সাদা মারিয়া যায় নাই। দোকানে দোকানে ঝুলাইয়া রাখা চিত্তআকর্ষণকারী চমকপ্রদ শাড়ীগুলা দেখিলে সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লয় পাছে কাহারও চোখের সহিত তার লোভার্ত্ত চাহনির বিনিময় ঘটিয়া যায় এই ভয়ে।…কোমল উজ্জ্বল মসৃণ একখানি পছন্দসই শাড়ী কোনো অনধিকারীর অঙ্গে জড়ানো দেখিলে মুচকি হাসিয়া মনে মনে

একবার নিজের সুঠাম দেহে জড়াইয়া লইয়া কল্পনায় নিজের এবং শাড়ীর উভয়ের মর্য্যাদাই বাড়াইয়া লয়। অস্বীকার করা চলেনা— ভদ্রসমাজে বাহির হইতে বেশভূষার দীনতায় গর্ব্ববোধ করিবার মত মানসিক বল তাহার নাই। কিন্তু কথাটা উল্লেখ করিবার মত নয়।

তটিনী হাসিয়া ফেলিয়া বলে অত কি ভাবছিস? বাবা— মেয়েকে যেন ফাঁসির হুকুম দেওয়া হ'ল। বেশ বাবু না যাবে —না যাবে—বয়ে গেল আমার। ভালোর জন্যেই বলা— ...'ন দিন যা শুঁটকিমাছ হচ্ছিস, এরপর আর বর জুটবেনা।

—সে আশা এখনো আছে নাকি?

মীনা সশব্দে হাসিয়া ফেলে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তটিনীর ইচ্ছার কাছেই হার মানিতে হইবে—এ মীনার অজানা নয়।...কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার ইচ্ছায় তেমন জোর পাওয়া যায় না কেন? বাহিরের বাধাগুলো ছাড়াও আর কোনো বাধা আছে নাকি কোথাও?

সাত

সেজকাকা উত্তেজিত ভাবে সিঁড়ির মুখেই আটক করেন।

—আজকের কাগজ দেখেছ নিরু?

ভাইপোদের তিনি কদাচ 'তুই' বলেন, বাপ কাকার সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় এক হইয়া যাওয়ার মত ছেলেতো নয় আজ কালকার! দূরত্ব আপনিই আসিয়া পড়ে।

—কাগজ? পড়বনা কেন?

—পড়েছ? তাও জিজ্ঞেস করছো 'কেন'? আশ্চর্য্য! তোমরা না ইয়ং ম্যান!

এর চাইতে বড় ধিক্কারের ভাষা বোধকরি খুঁজিয়া পান না সেজকাকা।

অথচ কাউকে উত্তেজিত হইতে দেখিলেই ভারী আমোদ লাগে অনিরুদ্ধর, ছোট ছেলের হাত পা ছোঁড়া দেখিলে যেমন হয়। তাই নিজে সে এই সব সময় একেবারে ঠাণ্ডা মারিয়া যায়, উত্তেজনার উপর বরফজল ঢালিয়া দিবার মত নিষ্ঠুর গোছের ঠাণ্ডা।

—ইয়ংম্যানের পক্ষে 'কেন' জিগ্যেস করা অন্যায় নাকি?

—আঃ সেকথা হচ্ছে না, আজকের খবরটা জেনেছো?

—আপনি কোন খবরটার কথা বলছেন কি করে বুঝবো? 'রবীন্দ্র মেমোরিয়ালে' কত টাকা উঠলো—

—আরে ধেত্তারি নিকুচি করেছে 'রবীন্দ্র মেমোরিয়ালে'র। বলি—সিমলের খবর দেখোনি? ক্যাবিনেট মিসন যে ফেল করলো!

—এই কথা!

প্রচ্ছন্ন একটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ মুখের উপর ফুটিয়া ওঠে—নিরবয়ব একটু হাসির আভাসে।

সেজকাকা মর্ম্মাহত হইয়া চাহিয়া থাকেন, এদের সঙ্গে কথা কহিতে আসিলেই ভিতরে ভিতরে কেমন একটা সূক্ষ্ম অপমানের জ্বালা ধরে, কিন্তু ঠাহর হয় না অপমানটা করিল কখন।···অথচ ঘরের ছেলেদের সঙ্গে বারোমাস কি কথা বন্ধ করিয়া থাকিবে মানুষ?

বিমূঢ় ভাবে বলেন—এটা একটা সামান্য কথা হল? তোমাদের কাছে কিছুই নয়?

—থিয়েটার শেষ হলে ড্রপসিন তো পড়বেই কোন সময়, তার বেশী আর কি?

থিয়েটার···ড্রপসিন···এসব কি কথা!···অথচ প্রতিদিন কি অদ্ভুত আগ্রহে সেজকাকা এই বৈঠক আলোচনার বিবরণ পাঠ করিয়া আসিতেছেন। মিত্রপক্ষীয় নেতার মুখ প্রফুল্ল দেখাইলে সেজকাকা স্বর্গে উঠিয়া যান, ভারতের মালিকানাস্বত্ব ত্যাগ করিয়া হেঁটমুণ্ডে ঘরে ফিরিয়া যাইবার সময় হৃত-সর্ব্বস্ব ভূতপূর্ব্ব

প্রভুদের দীনহীন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া স্ফূর্ত্তির আর শেষ থাকেনা তাঁর। আবার অপর পক্ষীয় নেতার সঙ্গে কর্ত্তাদের গলাগলির সংবাদ চোখে পড়িলেই সব উৎসাহ স্তিমিত হইয়া পড়ে, বাড়ীর ছোট ছেলেরা সেদিন বেশী করিয়া বকুনি খায়—উমাশশীর ব্যবহারে আগাগোড়াই অসঙ্গতি দেখিতে পান।

গত তেতাল্লিশ দিন ধরিয়া আশা নিরাশার এই নাগরদোলায় দুলিতে দুলিতে দড়ি ছিঁড়িয়া সশব্দে আছাড় খাইয়াছেন আজ। অথচ এই ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয়ে একতিল মাথাব্যথা কাহারও নাই।

হায় হায়! এরাই নাকি আবার দেশের যুবশক্তি! দুঃখিনী ভারতমাতা এদের মুখপানে চাহিয়াই শৃঙ্খলমোচনের স্বপ্ন দেখিতেছেন।...এত পরিষ্কার করিয়া না ভাবুন এমনি একটা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে বিদ্বেষের ভাব সেজকাকার উত্তেজিত মস্তিষ্কে পাক খাইতে থাকে...অনিরুদ্ধ যদি সমুখ হইতে সরিয়া যাইত তো ছিল ভালো, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিলে কথা না কহিয়া আলোচনার মাঝখানে ছেদ টানিয়া দেওয়া যায়? তাই প্রায় বোকার মতই প্রশ্ন করিয়া বসেন—স্বাধীনতা তা'হলে চাওনা তোমরা?

—চাইবনা কেন! আপনিই কি প্রাইম মিনিষ্টারের পোষ্টটা চান না?

অনিরুদ্ধ নীচে নামিতে থাকে আর অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন সেজকাকা।...কতদিন আগের কথা? যখন অনিরুদ্ধর

পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে সারাদিন 'ধর ধর' করিতে হইত? এই সিঁড়ির মুখেই পাহারাদার রাখিতে হইত সর্ব্বদা, দুরন্ত ছেলে বিদ্যুৎবেগে হামা দিয়া ছুটিয়া আসিত সিঁড়ির ধারে।...বিশ? বাইশ? তার বেশী নয়। কিন্তু অতই বা হইল কখন? বছরগুলা কি ঝড়ের মত ছোটে?...নাঃ। না হইবে কেন!

তিনি নিজেই বা কি ছিলেন তখন? মোটা মাহিনার চাকরী ছিল (অবশ্য তখনকার আমলের মোটা)—সাড়ে আটটায় ভাত খাইতেন, বাড়ীশুদ্ধ তটস্থ থাকিত তাঁহার খাওয়া পর্য্যন্ত। 'সেজবাবু' বলিতে থরহরিকম্প ছিল সকলের।... গণিয়া গণিয়া তিরিশটী পান জার্ম্মানসিলভারের বড় একটী কৌটায় ভরিয়া লইয়া পাকানো চাদরটী গলায় ঝুলাইয়া যখন অফিস যাইতেন কী আত্মতৃপ্তিতেই মনটা ভরা থাকিত!...মনে হইত বিশ্বশুদ্ধ লোক যেন ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাঁহার এই বিজয় অভিযানের দিকে চাহিয়া আছে।

উমাশশী আসিয়া বলে—বাবা চান করবে না? ঠাকুর রাগ করছে—

বাবা বিরক্ত কণ্ঠে যতটা সম্ভব তিক্ততা যোগ করিয়া উত্তর দিলেন—হচ্ছে হচ্ছে, আর সবুর সইছে না? কেউ হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকতে না পারে ভাত বেড়ে ফেলে রাখোগে যাও। বাড়ীশুদ্ধ লোকের কাছে তো কুকুর হয়ে আছি, এইবার ঠাকুর

চাকর শুদ্ধু ধরে জুতো মারতে চাইবে আর কি! চাইবে না কেন—সকলের প্রশ্রয় পেলে—

উমাশশী বাপের উত্তাপের কারণ অনুধাবন করিতে পারেনা। খবরের কাগজে সে হাত দেয় না বটে, কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে পড়িলেই কি আন্দাজ করিতে পারিত—কোন আশার মূলে ছাই পড়ায় এত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন তিনি?···কোন স্বপ্নসৌধ ভাঙ্গিয়া পড়ায়?

স্বাধীনতার অর্থ কি উমাশশী জানে?

জানে বই কি। ভাত কাপড়ের আর অভাব থাকিবেনা তখন, পয়সা ফেলিলেই—কম কম পয়সা ফেলিলেই—বাজারে জিনিস মিলিবে। থানের অভাবে—বাপ ভাইয়ের আধপুরণো ধুতিগুলা জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিতে হইবে না। লুকাইয়া এক আধপেয়ালা বাড়তি চা খাওয়ার মত গুরুতর অপরাধও হয়তো ধর্ত্তব্য হইবেনা, চিনির খোঁটায় নাকের জলে চোখের জলে করিয়া ছাড়িবেন না ন'খুড়ি। ভিখারীকে একমুঠা চাল দিতে গেলে চালশুদ্ধ মুঠাটা চাপিয়া ধরিবেন না মেজজ্যেঠি, ভাবী 'আকালে'র আশঙ্কায়।

এই তো।

স্বাধীনতার আর হাত পা আছে না কি?

তেলের বাটি আর গামছা আগাইয়া দিয়া উমাশশী এক-পাশে জাঁতি আর সুপারি লইয়া বসে। বসিয়া থাকিলেই

ব্যাগার খাটিতে হয় এই উমাশশীর ভাগ্য।...বাপ প্রত্যেক কথায় খিঁচাইয়া ভিন্ন কথা বলেন না। উমাশশীকে দেখিলেই যে তাঁহার হাড়পিত্ত জ্বলিয়া যায় একথা না বুঝিবার মত অত নীরেট বোকা সে নয়, তবু সময় সুযোগ মিলিলেই বাপের কাছে আসিয়া বসে।...পৃথিবীতে তা'র নিজস্ব বলিয়া, আপনার বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার আর কোন কিছুর অভাবেই হয়তো আসে।...মেজজ্যেঠি বলেন—"ইহকালটা মিথ্যে হয়ে গেল মা, পরকালের সম্বল কিছু রাখো এইবেলা, এখন থেকে যদি গোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারো তবে আর তোমার ভাবনা কি? পথ খুঁজে মরতে হবেনা, তিনিই দেখিয়ে দেবেন পথ।...নিজের কাছে টেনে নেবেন বলেই তিনি তোমায় মুক্ত করেছেন, রাস্তাতো তোমার খোলা হয়ে গেছে মা।"...

ভাল কথাই বলেন মেজজ্যেঠি, বাড়ী বসিয়া সাধু উপদেশ পায় উমাশশী, তবু মেজজ্যেঠিকে দেখিলেই কেমন যেন আতঙ্ক হয় তা'র।...পথ কি, মুক্তি কি, কিছুই তা'র কাছে সহজবোধ্য নয়। এত লোক থাকিতে গোবিন্দর কেবল তাহাকেই কাছে টানিবার ইচ্ছা এমন প্রবল হইল কেন এ রহস্যও বেচারার অজ্ঞাত, কাজেই মেজজ্যেঠি এবং গোবিন্দ দুইটা লোককেই সে সমান সন্দেহের চোক্ষে দেখে।...

খিঁচুনিটা তবু বোধগম্য জিনিস, রক্তমাংসের মানুষের কাছ হইতে আসে...বাপের কাছে বকুনি খাওয়ার পর বসিয়া বসিয়া দুই দণ্ড কাঁদাও তো চলে? সে কান্নার হিসাব দিতে তো

বেগ পাইতে হয় না।···কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া ছাদের কোণে ঘুমাইয়া পড়ে হয়তো—তখন পিসিমা অথবা মেজবৌদির সস্নেহ আহ্বানের মধ্যে যে শান্তি পাওয়া যায়—গোবিন্দর কাছে সে শান্তি মেলে? গোবিন্দ ভাবিতে গেলে মেজজ্যেঠির পূজার ঘরের পাথরের বিগ্রহটুকু ছাড়া আর কিছুই মনে আসেনা উমাশশীর।···

সুপ্যারি লইয়া বসিতেই আর একদফা খিঁচুনি আসে—আবার এখন কাণের গোড়ায় ঘ্যানর ঘ্যানর করতে এলে তো? কোনোখানে যদি একটু শান্তি আছে, তু'মিনিট বসে ভাববার জো নেই বাড়ীতে।···তোমাদের খাওয়া দাওয়া চুকেছে?

উমাশশী জাঁতির শব্দটা যত সম্ভব আস্তে করিয়া চুপি চুপি বলে—ও হেঁসেলে ন'খুড়ির এখনো রান্নাই হয়নি—

—রান্নাই হয়নি? কেন কি রাজকার্য্যটা হচ্ছিল এতক্ষণ?

বাঙালীর ঘরের মেয়ে বিধবা হইলেই স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধার সামিল হইয়া পড়ে। উমাশশীর যে বাইশ বছরের বেশী বয়স নয়, বেশী ক্ষুধা পাইলে যে তাহার গা মাথা ঝিমঝিম করে, ঘুম পায়, সামান্য কারণে হঠাৎ চোখে জল আসিয়া পড়ে, এ কি আবার খেয়াল করিবার বিষয় একটা?···নিরামিষ হেঁসেলের পাট চুকিতে বেলা তিনটা চারটা চিরকালই হয়, উমাশশীর খাতিরে তো তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না।···

বরং সে বিষয় উল্লেখ করাই অপরাধ।

তাই ভয়ে ভয়ে স্বর নামাইয়া পিতাকে সাবধান করে উমাশশী।

—আস্তে বাবা, ন'খুড়ি শুনতে পেলে রেগে বাড়ী মাথায় করবেন।

কিন্তু সেজকাকা তো আর ন'খুড়ির তাঁবেদার নয়, যে চুপ করিবেন? বরং আরো চীৎকারই করেন—ওঃ! বাড়ী মাথায় করবেন! বাড়ীর লোকের মাথাগুলো কিনে রেখেছেন কিনা! বলি—কি রাজকার্য্য হচ্ছিল, যে এতক্ষণ চারটি আলোচালের পিণ্ডি রাঁধতে বেলা দুটো বাজে? চালাকি! এসব ইচ্ছাকৃত, বুঝি না আমি?···জল খেয়েছিস্ সকালে?

উমাশশী এই অগাধ পিতৃস্নেহের পরিচয়ে আনন্দিত হইবে কি শুকাইয়া 'কাঠ' হইয়া যায়, প্রতিফল তো তোলা থাকিল উমাশশীর জন্য। যে মেয়েমানুষ পেটের জ্বালায় পুরুষ মানুষের কাছে 'লাগানি ভাঙানি' করিতে যায়, পেটে তাহার আগুন ধরিয়া যায় না কেন—এ প্রশ্নের উত্তর তো উমাশশীকেই দিতে হইবে? তাই বাপের কাছে একটা মিথ্যা কথাই কহিয়া বসে।

খুব বেশী মিথ্যা আর কি! 'জল' সে খায় নাই এমন নয়—কর্পোরেশনের জলের কলটার দয়া-দাক্ষিণ্য এখনো বজায় আছে যে!

বিরক্তভাবে ঘসঘস করিয়া তেলটা গায়ে রগড়াইতে

রগড়াইতে সেজকাকা শেষ মন্তব্য করেন—হুঁঃ এ দেশ আবার স্বরাজ পাবে! মারো ঝাড়ু।

স্নানান্তে ভিজা গামছাটী কাঁধে ফেলিয়া সেজকাকা যখন একখানি পুরণো আমলের রংজ্বলা গাল্‌চের আসনে আসিয়া গুছাইয়া বসেন, তখনকার সতৃপ্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া তাঁর স্বরাজপিপাসু অতৃপ্ত আত্মার কথা কল্পনা করা যায় না।

বড় কাঞ্চননগরের ভারী থালার চতুর্দ্দিকে অনেক গুলি বাটী সাজানো। নিরামিষ হেঁসেলের রান্না এতক্ষণে প্রায় শেষ হইয়াছে। দু'তরফের তরিতরকারি একত্র করিলে সংখ্যায় বড় কম হয় না।...চাখিয়া চাখিয়া প্রত্যেকটী বস্তুর দোষগুণের সমালোচনা করিয়া আহার পর্ব্ব সারিতে ঘণ্টাখানেক লাগে তাঁহার।

এ সময় কাছে আসিয়া বসেন জ্ঞানদা।

স্ত্রী নাই—কাজেই সংসারের খুঁটিনাটি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সেজদার কর্ণগোচর করিবার দায়ীত্ব লইয়াছেন জ্ঞানদা নিজে। তা'ছাড়া তদারক করিয়া খাওয়াইবার ভারও।... সেজদার পাতেই যে ছোট টুকরার মাছগুলা পড়ে, দুধে সরের অভাব দেখা যায়—এসব জ্ঞানদা লক্ষ্য না করিলে করিবে কে?...পাখা নাড়িতে নাড়িতে বারবার হাঁক পাড়েন —শাকের ঘণ্টটা কি তোমার এখনো নামেনি ন'বৌ? ধন্যি, বাবা!...কই পোস্তর বড়া দিলে না সেজদাকে?

ধোঁকার ডালনা আর একটু দিয়ে যাওনা গা, চিমটি কেটে অতটুকুনই বা দেওয়া কেন—এক কাঁসি ভর্ত্তি তো হয়েছে দেখলাম। নজরকে বলিহারি যাই! একটা বৈ পঞ্চাশটা ভাসুর শ্বশুর নয়, তা' একটু যদি ছেদ্দা আছে!...উর্মি, এই উর্মি, হতভাগা মেয়ে বাপের খাওয়াদাওয়াগুলো দেখতে পারোনা একটু? কেন, একটুকরো পাতিনেবু কেন—কাগজীনেবুগুলো গেল কোথায়? দু'খানা কেটে দিতে পারো না?...দই আনিয়েছিলে? তা' আনাবে কেন? বাপের ওপর দরদ কতো! চব্বিশ ঘণ্টা যাদের কন্না করে মরছো তা'রা তোমার সগ্‌গে বাতি দেবে?.. দিনরাত ছেলে বইছিস কিসের জন্যে লা? মাইনে দিয়ে ঝি রেখেছে তোকে? বিবিরা সব ছেলে ছেড়ে দিয়ে অজ্ঞান হয়ে নভেল নাটক পড়ছেন, আর উনি ছেলে বয়ে মরছেন।...যেমন হাবা পেয়েছে তোকে—অমন বুদ্ধি না হ'লে অমন কপাল হয়?

... ...

সেজদার সামনে সেজদার মেয়ের উপর দরদের অন্ত থাকেনা জ্ঞানদার।...অবশ্য একেবারে ভুয়োও বলা চলে না—মা মরা মেয়েটা কতকটা তো তাঁর হেফাজতেই মানুষ হইয়াছিল।

শুধু উমাশশী নিজে বুঝিতে পারেনা—কার স্নেহ-সমুদ্র কখন উথলাইয়া উঠিবে তাহার উপর, আর কখনই বা

বজ্র উদ্যত হইবে। বাড়ীর সকলের কথা সকলে ভুলিয়া থাকে—তাকেই বা ভুলিতে পারে না কেন এই আশ্চর্য্য।...

তার হাসিটা নিন্দনীয়, গাম্ভীর্য্যটা অপরাধ। ক্ষুধাটা নির্লজ্জতা, ক্ষুধাহীনতাটা ঢং। খাটিয়া মরিলে 'খোসামুদে মনযোগানী', বসিয়া থাকিলে 'নবাবি আদিখ্যেতা'। তা'র রোগটা অরুচিকর, দস্থির গতরটা চক্ষুশূল। তাহাকে লইয়া মাথা ব্যথার আর অন্ত নাই লোকের।

উমাশশীর পক্ষে ঠিক কোনটা যে ন্যায়সঙ্গত স্পষ্ট করিয়া যদি বলিয়া দিত কেউ!

আট

দু' দু'বার ফিট্‌ হইয়া—ছাড়িয়াছে, বেলার অতিরিক্ত বাড়া-বাড়িতে ভাতও খাইতে হইয়াছে, অথচ অরুণেন্দুর দেখা নাই ইচ্ছা করিয়াই যেন অন্যায় দেরী করিতেছে সে।...একবার নাকি আসিয়াছিল—অলকা তখন মূর্চ্ছাপন্ন, সেই মারাত্মক অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া যে স্বামী—ডাক্তার স্বামী—নিশ্চিন্ত চিত্তে সারা বেলাটা বাহিরে কাটাইতে পারে তা'র স্ত্রীর কেন মৃত্যু হয় না এই কথাটাই বুঝিতে পারে না অলকা।...মূর্চ্ছার মাঝখানে মরিয়া থাকিয়া একদিন যদি অলকা অরুণেন্দুর অবহেলা আর দুর্ব্যবহারের উচিৎ জবাব দিতে পারিত!... কত কিছু ভাবিয়া রাখে অলকা, কিছুই হয় না—শেষ পর্য্যন্ত উঠিতে হয় খাইতে হয়, সেই হৃদয়হীন স্বামীর সহিত হাসি গল্পও করা হইয়া যায় এক আধ সময়।...সে যখনি আসে—তখনি যেন খুসিতে টগ্‌বগ্‌ করিতে থাকে, কাঁদিয়া কাটিয়া মান অভিমান করিয়া তার নাগাল পাওয়া শক্ত।...কিন্তু কেন? কেন অরুণেন্দু বৌ লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করেনা? বৌ মরিয়া যাইবার আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া থাকেনা? যে বৌয়ের বুকের অসুখ, তাহাকে বুকের ভিতর আগলাইয়া রাখিতে চায়না কেন—একটা ছেলেপুলে পর্য্যন্ত নাই যাহার?

সংসারে কে যে কত আপন সে তো আর চিনিতে বাকী নাই অলকার। নিজের মা, গোবিন্দগতপ্রাণা অমন ভক্তিমতী মা, তিনি শুদ্ধ যে রোজগারি ছেলে বলিয়া অরুণেন্দুকে বেশী মায়া দেখান, এ কথা আর কেউ না বুঝুক অলকার কি এখনো বুঝিতে বাকী আছে?

কই অলকা কি স্বামীর অর্থের উপর নজর দিতে যায়? এই তো এত টাকা—সবই বারোভূতে খাইতেছে—সংসারের দশজনের সঙ্গে ভাতের উপর মাছ জোটেনা অলকার, অথচ টাকাগুলা পাখা মেলিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উড়িয়া যায়। অলকার একলার সংসার হইলে রাজার হালে থাকিতে পারিত না কি?…সে সব কিছুই চায়না বেচারা, চায় শুধু স্বামীকে একটু বেশী করিয়া কাছে পাইতে—সে সাধটুকুও মিটিবে না?"

বিছানায় পড়িয়া হাঁসফাঁস করিতে করিতে এই 'কেন'র আঘাতে নিজেকে নিজে ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে অলকা।

…ঘড়িটা বাজেনা। তাই দরকার পড়িলে মাঝে মাঝে দালানে আসিয়া দেখিতে হয়। অলকা খোলা জানলা দিয়া দেখিতে পাইয়া ডাকে—ছোট ঠাকুরপো শোনো।

অনিরুদ্ধ দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়।

—ভেতরে এসোনা কথা আছে একটা।

—কি বলুন না।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনবার দরকার কি? বোসোনা বলি।

—ঠিক আছি, বলুন না।

—নাঃ! এই এক সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন বাবা! আচ্ছা ভাই ছোট ঠাকুরপো, তুমি তো দেদার বই পড়েছ, বিদ্যের জাহাজ ভরা আছে পেটে, একটা কথা বলো দিকিন।

প্রশ্ন করে না, জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখেনা, শুধু শোনার অপেক্ষায় গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে অনিরুদ্ধ।

—বলছিলাম—বলছি—নাঃ যাও তোমরা সবাই সমান।.... বাস চলে যাচ্ছ অমনি? শোনই না ছাই, আচ্ছা ছেলেপুলে একেবারে না হওয়া ভালো?

—আমার মত চান?

—আঃ কী মুস্কিল, মতের কি আছে? ভালো কি ভালো নয় তাই বলো না?

—কে বলেছে ভালো? মাদুলী পরুন—

—নাঃ তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই দায়, কেবল পালাই পালাই...ধরো যদি তোমার গিয়ে—ইয়ে মানে মাদুলীই যে পরতে হবে তার কি মানে আছে? এমনিও তো হ'তে পারে?

—হ'তে কি না পারে—কিন্তু আমার মতামতের মূল্যটা কি?

—বাঃ যতই হোক—তোমরা হ'লে বিদ্বান মানুষ—

—ডাক্তার নই।...

অনিরুদ্ধর ছায়াটা সরিয়া যাইতেই অলকা অস্ফুট মন্তব্য করে—নির্ব্বিকার পরমহংস...অহঙ্কার দেখনা....তেজে মট্‌মট্‌ কর্চ্ছেন!

স্বামী ভিন্ন মনের কথা খুলিয়া বলিবার দ্বিতীয় লোক না থাকাও এক মুস্কিল।...স্বামীর কাছেই কি মনের কথা সব বলা যায়? "মেয়েমানুষের বারোআনা চক্রান্তই তো স্বামীর বিপক্ষে।"

নয়

মনোজ আর সুরেখার বয়সের তারতম্যটা এত কম যে স্বামী স্ত্রী না হইয়া সহপাঠি হইলেই যেন মানাইত ভালো। অবশ্য সহপাঠিত্বের অনাবিল প্রেম পূর্ব্বরাগের তুমুল আবর্ত্তে পাক খাইতে খাইতে অবশেষে দাম্পত্য সমুদ্রে নির্ব্বাণ প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু সে কথা যাক।

সুরেখা যেমন সপ্রতিভ চটপটে, লজ্জাসরমের বালাই হীন, মনোজ তেমনি মুখচোরা লাজুক, 'বৌ' নামক জীবটীর নাম শুনিলেই তাহার আকর্ণ লাল হইয়া ওঠে।....

একে তো এ বাড়ীর আইন-কানুন কড়া, ছেলেমানুষ বৌ, দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে কথা কহিয়াছে—এমন রিপোর্ট পাইলে গৃহিণীরা স্তম্ভিতবিস্ময়ে বাক্যহারা হইয়া পড়েন, আর মধ্যবর্ত্তিনীরা নিন্দায় শতমুখ হইয়া ওঠেন, তার উপর আবার লাজুক বর। লুকাইয়া চুরাইয়া একটু আধটু সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইবার ফন্দী ফিকির আবিষ্কার করিতে হয় একা সুরেখাকেই।

ছোট ছোট মেয়েগুলিকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিবার জো নাই, বিশ্বাসভঙ্গের গৌরব অর্জ্জন করিতে পরাঙ্মুখ কেহই নয়। বিশেষতো মনোজের পরীক্ষা আসন্ন, এবং নারী যে

সকল সাধনার বিঘ্নস্বরূপিণী একথা কে না জানে? কোন ছুতায় একবার তপস্বীর ধ্যানভঙ্গ করিতে আসিলেই পঞ্চমবাহিনী মারফৎ সংবাদ মুহূর্তে প্রচার হইয়া পড়িবে সে কথা সুরেখার অজ্ঞাত নয়।

তবু আসে।

না আসিয়া থাকা সম্ভব?

উনিশ বছর বয়সের উৎফুল্ল হৃদয় কি কেবল শ্বাশুড়ী ননদের চরণতলে অর্ঘ্য দিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে? পলায়নপর উদগ্র মনকে কতক্ষণ বন্দী রাখা যায় পাঁচফোড়ন আর হলুদ বাটার অমোঘ বন্ধনে?

পৃথিবীতে এত ভীড় কেন? মানুষ অনর্থক এত কাজ করে কেন?....অর্থহীন এত কথা কহিয়া কি সুখ পায় ওরা?...ওদের পৃথিবী কি চিরদিন এমনি ছিল?...আলোহীন বাতাসহীন নিরন্ধ্র! নিজেদের গতি থামিয়া গিয়াছে বলিয়াই কি অপরের সুস্থ সহজ গতিবেগকে আটক করিতে চায় পাথর চাপাইয়া?

সুরেখার বাপের বাড়ীর সংসারটা এত ছোট যে সংসারের দায়টা কখনো চোখে ঠেকে নাই তাহার। লেখাপড়া গানবাজনা সেলাই-বোনার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া দাওয়াটাকেও আনুষঙ্গিক একটা প্রয়োজন হিসাবে দেখিয়া আসিয়াছে...কিন্তু এ বাড়ীর 'সংসার' নামক দৈত্যটা কি ভয়ঙ্কর!

একমাত্র আহারপর্ব্বকে কেন্দ্র করিয়া অহরহ যে বিরাট কর্ম্মচক্র পাক খাইয়া মরিতেছে—এতগুলা মানুষের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায় তাহাতে তেল জোগাইতে।··· বর্ত্তমানের পাওনা মিটাইয়া কিছুটা সময়ও যদি উদ্বৃত্ত থাকে—ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে দোষ কি?....কুল-কাসুন্দি বড়ি আমসত্ত্বের কাজ তো আর ফুরায় না!···কিছু না হো'ক—অবসরসময়ে চাল-ডালের কাঁকরগুলাও তো বাছিয়া রাখিলে হয়, ছেলেমানুষ বৌ বলিয়া যখন ভারী-কাজের দায়ীত্ব চাপানো হয় না! তা'ছাড়া উদয়াস্ত ভারীকাজ করিতে করিতে যাদের দমবন্ধ হইয়া আসিতেছে তা'দের সেবা করিবে কে? লঘুজন ছাড়া? ছেলের বৌ তবে আনে কেন লোকে? শুধু 'বরটী আর ঘরটী' চিনিলেই তো চলেনা—বাপ মা তবে 'পাঁচজনের ঘর' দেখিয়া মেয়ে গছাইয়াছে কেন?

প্রত্যক্ষ অভিযোগের তবু উত্তর আছে—কিন্তু 'পাঁচজনের ঘরে' সরাসরি ব্যবস্থাটা কম। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ যেন বাতাসে ছড়াইয়া বেড়ায়। 'ফিসফিস গুজগুজ', আসামীর ছায়া দেখিলেই থামিয়া যাওয়া, ঠারে ঠোরে হাসি টিট্‌কারির ছলে কিছুটা বলিয়া লওয়া, এর বেশী নয়।

কিন্তু দাহটা কি বেশী তীব্র হয় না তা'তে?

হয়।

তবু বুদ্ধিমতী সুরেখা অবুঝের ভাণে প্রতিকূল অবস্থাকে কিছুটা ঠেকাইয়া রাখিয়া আবহাওয়া সরস রাখিতে চেষ্টা করে। ...সুযোগ পাইলেই তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতে আশ্রমে আসিয়া হানা দেয়।

—এলাম আবার জ্বালাতে—

অধ্যয়নরত তপস্বীর মুখে মুহূর্ত্তে বিদ্যুত জ্বলিয়া ওঠে।... স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া আবেগে জড়াইয়া ধরে কিন্তু সে মুহূর্ত্তেই। ছাড়িয়া দিয়া বিপন্ন ভঙ্গিতে বলে—আচম্‌কা এমন লোভ লাগিয়ে দাও—দালানে নেই তো কেউ ?

—থাকতে পারে। খালি আর থাকে কখন ?

—সর্ব্বনাশ! বলতে হয় আমাকে। দেখ দেখ লক্ষীটি কে আছে ?

—যেই থাকুক, ফাঁসির হুকুম দেবে তোমাকে? এই বে-আইনী কাণ্ডর জন্যে ?

—হুকুম দিতে হয় কি? নিজেই মরতে হয় লজ্জায়, অথচ—তুমি এরকম হঠাৎ এসে পড়লে এত ভালো লাগে! ঠিক এক্ষুণি পড়ার বইগুলো কি বিশ্রী যে লাগছিল!

—লোক লজ্জার ভয়ে এখন তো তার চেয়েও বিশ্রী লাগছে আমাকে!

—কি যে বল, দুষ্টু মেয়ে! কত ভালো যে লাগে, সে হয়তো তোমায় বোঝাতে পারিনা আমি, কিন্তু কি করি বলো ?

তোমাকেই যে শেষকালে নানাকথা শুনতে হয়, ওই আমার ভাবনা।

—কথা শোনাকে আমি গ্রাহ্য করিনা, যদি তোমায় পাই একটু। শ্রীরাধিকা কি বলে গেছেন জান তো ?

—জানিতো—কিন্তু তোমার 'গলায় কলঙ্কের হার' দেখতে আমার যে ভালো লাগেনা।

—তার মানে—ভালোবাসার কিছু বোঝোনা তুমি—এ, বি, সি, ডি ও পড়া হয় নি। আমার সুখ চাওনা, শুধু প্রশংসা চাও।

—দুটোই চাই, তুমি তোমার সমস্ত গৌরব আর প্রতিষ্ঠা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকো এই দেখতে চাই।

—তত্ত্বে ওকে 'মধ্যম প্রেম' বলা হয়, যাক সবাই কিছু আর উত্তম জিনিসের অধিকারী হয় না। এখন কথা হচ্ছে—

বিজয়িনীর ভঙ্গীতে পাশে আসিয়া গুছাইয়া বসে সুরেখা, মনোজের সন্ত্রস্ত ভাবকে উপেক্ষা করিয়া।....

পড়িবার জন্য আলাদা ঘর অবশ্য নাই, শোবার ঘর যে একটা পাইয়াছে এই যথেষ্ট। পাইয়াছে—নেহাৎ বিবাহিত বলিয়াই—এই সেদিনও খুড়তুতো জ্যেঠতুতো কাকা দাদা আর ভাইপো ভাগ্নের সঙ্গে গাদাগাদি করিয়া নীচের ঘরে শুইয়াছে। পরীক্ষার পড়া তৈরী করিয়াছে বন্ধুর বাড়ী গিয়া।

এখন ঘর একখানা নিজস্ব দখলে পাইয়াছে বলিয়াই হোক কিম্বা বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছার অভাবেই হোক,

'পড়িতে যাওয়ার' ব্যবস্থাটা বাতিল।...বিছানার উপরই খাতা-পত্র বই পেন্সিল ছড়ানো এবং তাহারই একান্তে একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া চোখের উপর হাত চাপা দিয়া পড়িয়া পড়িয়া বোধকরি পাঠ্যপুস্তকের দুরূহ স্থানগুলিই চিন্তা করিতেছিল মনোজ।

ঘরের বাতাসে একটা নাম-না-জানা পুষ্পসারের মৃদু সৌরভ যেন গুঞ্জরণ করিয়া বেড়াইতেছে—গতরাত্রির মোহময় অনুভূতির ক্ষীণ একটুখানি রেশ লাগিয়া আছে বিছানায় বালিশে, জাগরণক্লিষ্ট দুই চোখের পাতায়।

সুরেখাকে দেখিয়া অবাক লাগে মনোজের, সবসময় ওকে টাট্‌কা মনে হয়, চঞ্চল দুইচোখ নাচিয়াই আছে, কম-ঘুমের নালিশ লাগিয়া থাকেনা চোখের কোলের করুণ ছায়ায়।

মনোজের এত ঘুম পায় কেন ?

অথচ সারাদিনের আকাঙ্ক্ষিত সেই ঘুম, রাত্রি আসিলেই চোখ ছাড়িয়া উধাও হয় কোথায় ?

কপালের উপর ঠাণ্ডা হাতটা বুলাইয়া দিয়া সুরেখা চাপাহাসির সঙ্গে প্রশ্ন করে—এই সকালবেলাই তোমার ঘুম পাচ্ছে ? কেন বলো তো ?...

—কাল 'নাইট্ ডিউটি' ছিল অফিসে—বলিয়া উঠিয়া বসে মনোজ।

পরিহাস করিয়া উত্তর দেয় বটে, কিন্তু তাহার উৎকণ্ঠিত দুই চোখ ও উৎকর্ণ দুই কাণ বর্ত্তমান পরিস্থিতি ছাড়িয়া ঘরের বাহিরে—দালানে আর ওদিকের বারান্দায় গিয়া আটক পড়ে।...কে কোথা হইতে দেখিয়া যেলিবে বাবা কে জানে!

সুরেখার ঠাণ্ডা নরম হাতখানা জ্বালাকরা গরম গরম চোখ দুইটার উপর চাপিয়া ধরিতে পারিলে চমৎকার আরাম লাগিত—না? কিন্তু অত সাহস মনোজের নাই।...সঙ্কুচিত ভাবে বেশ খানিকটা তফাৎ রাখিয়াই বসে। নিজের বাড়ীটাতো সে জানে!

সুরেখাও কি এতদিনে জানে নাই?...মেয়েরা বরং বেশীই বুঝিতে পারে এসব ব্যাপার, তবু ওর কি যে অন্যায় সাহস! মনোজের ভীত সন্ত্রস্ত ভাবটা যেন ওর কৌতুকের বিষয়।

—অতদূরে সরে বসলে যে? বিছানার এখানটায় ছারপোকা ছিল বুঝি?

—হ্যাঁ ছিল—ছারপোকা নয় বিচ্ছু, কিন্তু তুমি কি যেন বলতে এসেছিলে না?

—তার মানে তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে চাও কেমন?

—এ রকম কথাগুলো বলে খুব সুখ পাও না?

—নিশ্চয়, সত্যি কথা বলার চাইতে সুখ আছে?...আচ্ছা আমার বক্তব্যটা বলে নিই—এক জায়গায় নিয়ে যাবে আমাকে?

—কোথায়?

মনোজের বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া ওঠে।...হয় তো বাপের বাড়ী যাইবার আব্দার ধরিয়া বসিবে।...এই একটা জায়গায় বৌগুলোকে বোঝা দায়। এত ভালবাসাবাসি... মুহূর্ত্ত বিরহে পৃথিবী অন্ধকার দেখে...মিলন রাত্রির মধুর আবেশে স্বর্গসুখের ভাব দেখায়, কিন্তু বাপের বাড়ীর নাম হইলেই সব গোলমাল।...বরের মুখে চোখে আপত্তির ছায়া দেখিলেই, মান অভিমান উথলাইয়া পড়ে তাহাদের। স্বার্থপর পুরুষজাতকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না তখন।

কিন্তু সুরেখা যা বলে সে যে আরো সাংঘাতিক।

—লেকচার শুনতে যাবো। নিয়ে চল না লক্ষ্মীটী।

—লেকচার ? কার লেকচার ?

—বাঃ তুমি যেন আকাশ থেকে পড়ছো ? এই তো কাছেই...নতুন পার্কে শা নওয়াজের লেকচার হবে শুনছ না ?...পাড়ার ছেলেরা ভলান্টিয়ার হচ্ছে—

হাঁ শুনিয়াছে বটে মনোজ, কিন্তু মিত্তিরবাড়ীর জবরদস্ত বনেদী দেয়াল ভেদ করিয়া যে খবরটা সুরেখার কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং মনের দরজায় ঘা দিয়াছে এইটাই চট করিয়া মনে আনিতে পারে নাই।

—তুমি আবার লেকচার শুনতে যাবে কি করে ?

উড়াইয়া দিবার ভঙ্গীতে বলে মনোজ।

—কি করে আবার ? যেমন করে সবাই যাচ্ছে। কেন যেতে নেই ? মেয়েরা যাচ্ছে না সেখানে ?

—যাবেনা কেন? অজস্র যাচ্ছে। কিন্তু সকলের বাড়ী তো ঠিক আমাদের বাড়ীর মতন নয়—

—আশ্চর্য্য! "বাড়ী" বলতে তোমরা কি বোঝ জানিনা—বাড়ী কি একটা দৈত্য? পৃথিবী বদলাচ্ছেনা? আইনকানুনের পরিবর্ত্তন হচ্ছেনা? শুধু তোমাদের বাড়ীটাই সেই মধ্য যুগের ছাঁচে ঢালাই করে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে? আজকাল কোন্ বাড়ীর মেয়েদের এত পর্দ্দা এত কড়াকড়ি আছে বলো তো?

—আছে আমাদেরই মতন সব স্থবির পরিবারের মধ্যে। কিন্তু···সু, লেকচার শুনতে যাবার তোমার দরকার কি? নিজেই তো খাসা লেকচার দিতে পারো!

আলোচনাটাকে পরিহাসের খাতে আনিয়া ফেলিতে পারিলেই বাঁচে মনোজ।

সুরেখা মনে মনে অস্বীকার করিতে পারে না, স্বামীকে তাহার নেহাৎ ছেলেমানুষ লাগে, কাজেই সহজে রাগ করে না। হাসিয়া বলে—তার জন্যে অন্য সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সত্যি আমি যাবোই। নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। এটা তো কোনো খারাপ কাজ নয়—বা আর কোনো মেয়ে করছে না তা নয়—তবে অত ভয় কি?···চিরকাল ভয় করে চললে তোমাদের এ অচলায়তন কি কোন দিনই ভাঙবে? মেয়ে মানুষ তো জেলের আসামী নয়? তা'ছাড়া অহরহ এই চারখানা দেয়ালের মাঝখানে ঘাড় গুঁজে পড়ে থেকে কী সঙ্কীর্ণ মন

হয়ে গেছে সব বলো দিকিন? ওতে কি নিজেদের কিছু লাভ হচ্ছে তোমাদের?

মনোজ বিস্মিত না হইয়া পারে না।

এসব কথা নিজে সে অবশ্য জানে, মাঝে মাঝে না ভাবে এমন নয়, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তাহার কোনো দাম আছে কি না যাচাই করিয়া দেখিবার চেষ্টা কোনোদিন করে নাই।··· কিন্তু এই লীলাময়ী কিশোরী, আদরে আবদারে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ যাহার নাই, সে আবার এত বড় বড় কথা ভাবিল কখন?

কথাগুলা শুনিতে ভালো কিন্তু কাজে খাটানো বড় সহজ নয়।

"বৌ লইয়া লেকচার শুনিতে গেছে মনোজ"—কথাটা মনে মনে সকলের মুখ হইতে একবার শুনিয়া লইবার চেষ্টা করে ···নাঃ অসম্ভব।

সিনেমা থিয়েটার হইলেও বা কথা ছিল, বাড়ীর আরো মেয়েদের জুটাইয়া দল বাঁধিয়া যাওয়া চলিত।···অনর্থক এমন এক বাজে আবদার করিয়া বসিল সুরেখা! ভুলাইবার ছলেই বলে—তা'র চেয়ে "সাতনম্বর বাড়ী" দেখতে যাবার কথা বলছিলে সে দিন—তাই চলো।

—আহা মরে যাই কী বুদ্ধি! লেকচারের বদলে সিনেমা—আমার বদলে—ওই চৌধুরী বাড়ীর বৌটাকে তোমার কাছে রেখে যাবো?

—ধ্যেৎ। অসভ্য।

—তা' তোমার যেমন বিবেচনার ছিরি।···না না তোমরা ঃসব ভয়ডর একটু ছাড়তে শেখো, যা অন্যায় নয় তা'তে ভয় ফরবে না। শুধু বড়রাই যে ছোটদের শিক্ষা দিতে পারে তা' নয়, বড়দেরও কিছু শেখবার থাকতে পারে ছোটদের দিক থকে—বুঝলে ?....অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নেবার শিক্ষা, মানুষকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা, কিছুদিন আগে পৃথিবীতে এসেছে :লেই দাবীটা আঠারো আনা—এটা ভোলবার শিক্ষা।···

মনোজ বোধকরি উত্তর খুঁজিতেছিল, হঠাৎ মিনু হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া পাকাগিন্নীর মত দাঁড়াইয়া পড়িয়া :লে—ঠিক তাই! বৌদি এই ঘরে। দেখগে যাও নীচে সব্বাই কী ভীষণ রাগ করছেন।

মনোজ শুষ্কমুখে বলে—কেনরে মিনু ?

—কেন আবার। বৌ মানুষ সব সময় খালি খালি তিন-তলায় এসে বসে থাকা কি ? বাসু পিসীমা বললেন—"অমন বৌকে পাঁশ পেড়ে কাটতে হয়"—পাঁশ কি বড়দা ?

—সে একটা ভারী মজার খাবার রে মিনু—বলিয়া চঞ্চল চোখে বিদ্যুৎ হানিয়া ছুটিয়া নামিয়া যায় সুরেখা।....আর মনোজ পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া থাকে।...নীচের তলার আন্দোলনের রূপ তাহার অজানা নয়। বাল্যকালে—যখন রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘরের এলাকায় অধিকাংশ সময় কাটিত তখন দেখিয়াছে—কাকীমাদের বিরুদ্ধে উদ্যত বজ্রের শাসন।

নিজের বিপদ নিজে ডাকিয়া আনিয়া কী সুখ পায় সুরেখা!

একেই তো আজই সকালে সেজকাকীমাকে লইয়া কা কেলেঙ্কারীটাই হইয়া গেল।

এগার

পুরী যাওয়ার বিরুদ্ধে আপীল চলিল না।

নিতান্ত আবশ্যকীয় কয়েকটা জিনিস সংগ্রহের জন্য মীনা একটা ষ্টেশনারি দোকানের উদ্দেশে বাহির হয়।...টাকা কিছু সঙ্গে লইয়াছে, সময় থাকিলে জুতাও একজোড়া কিনিয়া লইবে। অবশ্য পুরীর বালিতে নতুন জুতা কাজে লাগেনা, তবু সৌষ্ঠব একটু থাকা চাইতো! ট্রেনেও তো যাইতে হইবে বড়লোকের সঙ্গে! শুধু তটিনী বা তটিনীর মা হইলেও বা কথা ছিল, আবার তার সেই মহাপণ্ডিত ছোড়দাটী চলিয়াছেন সঙ্গে।...কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে।

কি যে এক ঝোঁক চাপিয়াছে তটিনীর!

মোড়ের মাথায় আসিতেই কে একজন গাড়ীর ভিতর হইতে ডাক দিল। কি বলিয়া ডাকিল কে জানে, তবু বোধহয় কণ্ঠস্বরে নিজের নামটার আভাস কাণে পৌছাইয়া থাকিবে—মীনা ইতস্ততঃ করিয়া এদিক ওদিক চায়।

গাড়ীর আরোহী ততক্ষণে নামিয়া পড়িয়াছে।

অরুণেন্দু!

এ লোকটা আবার তাহাকে ডাকিয়া থামায় কেন!

মীনা বিস্মিত হইয়া তাকায়।

অরুণেন্দু সহাস্যে কাছে আসিয়া বলে—কোন দিকে যাচ্ছেন?

—এমনি একটু মার্কেটিঙে—কিন্তু কেন বলুন তো?

—কিছু না, নিছক কৌতূহল। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল গভীর চিন্তামগ্ন। শাড়ী ব্লাউজ কিনবেন বোধহয়? মেয়েরাতো শুনেছি—ওই জিনিসটাকেই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর মনে করে।

মীনা হাসিয়া ফেলে—তা' হয়তো করে—কিন্তু ওই জিনিসটাই হ্রস্বতর করিবার চেষ্টায় তো কর্ত্তারা উঠে পড়ে লেগেছেন। যাক্—এখন সে উদ্দেশ্যে বেরোইনি—

—তবে?

মীনা অনিচ্ছুকভাবে বলে—এই দু'একটা ষ্টেশনারির দরকার ছিল—সামান্য কিছু।

ঘটা করিয়া বলিবার মত রেস্ত হাতে না থাকিলে যেমন কুণ্ঠা আসা স্বাভাবিক তেমনি কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর করে মীনা।

—সামান্য জিনিসকে অসামান্য করে তোলবার ক্ষমতা তো আপনাদের যথেষ্ট আছে। একটা পাউডার কিনতেই তো একঘণ্টা সময় লাগাতে পারেন। দোকানে বাজারে আমরা তো এখন গৌণ হয়ে গেছি। সেদিন এক ভদ্র মহিলা কয়েক খানা রুমাল কিনছিলেন—

মীনা বাধা দিয়া এবার একটু দৃঢ়স্বরে বলে—আপনার একটু ভুল হচ্ছে—সময় নিয়ে সৌখিন বিলাস করবার মত ভদ্রমহিলা আমরা নই, খেটে খাওয়া মুটে মজুরের দল।

—রাগ কেন? চলুন আপনাকে একটু সাহায্য করি।

—সর্ব্বনাশ! সাহায্যের কি দরকার?

—ভয় খাবেন না—ভুলিয়ে গাড়ীতে তুলে নিয়ে পালাবনা। আপনার গন্তব্যস্থলেই পৌঁছে দেব।

—আমার গন্তব্যস্থল তো এই এখানে—

লজ্জায় রাঙা হইয়া ওঠে মীনা, লোকটার জিভের খিল ছিটকিনি নাই কেন?

অরুণেন্দু গাড়ীর দরজাটা খুলিয়া প্রায় তুলিয়া লইবার ভঙ্গীতে বলিয়া ওঠে—তা'তে কি? ষ্টেশনারি দোকান তো কলকাতা সহরে দু' দশ হাজার আছে, বিশেষ কারো ওপর পক্ষপাতিত্ব করবার কি দরকার?

নেহাৎ ছোট একখানা টু'সিটার মাত্র। দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলা সম্ভব নয়। মীনা উঠিয়া বসে বটে কিন্তু সহজভাবে নয়। ছোট ঘরখানিতে থাকে, ছোট ছোট কয়েকটা মেয়ের পড়ার তত্ত্বাবধান করে, নিজের যৎসামান্য প্রয়োজন মিটাইতে বাছিয়া বাছিয়া ছোট দোকানে ঢোকে, এইটুকু মাত্র সীমানা। গণ্ডির বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিবার সখ বা সুযোগ কিছুই আসে নাই কখনো। তাই অস্বচ্ছন্দ ভাব কাটাইয়া উঠিতে দেরী লাগে।

খানিকটা চলিবার পর পাড়ার সীমানা ছাড়াইয়া অরুণেন্দু হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলে—গাড়ীটা নতুন কিনলাম—'বউনি' ভালো হ'ল।

—আজই কিনলেন না কি ?

—তা ঠিক নয়। তবে আজই প্রথম রুগী দেখতে বেরিয়েছি।

—'বউনিটা' যাঁর করা উচিৎ তিনি খুব বেড়িয়ে নিয়েছেন তো ?

—কে ? কার কথা বলছেন ?

—কেন আপনার স্ত্রী ! খোকার 'সেজমামী'।

মীনা হাসিয়া ফেলে।

—ওঃ। সত্যি বলতে তাঁর পায়ের ধূলায় পবিত্র হবার সুযোগ এখনো পায়নি গাড়ীটা।

—বলেন কি ? তার মানে ?

—তার মানে ! তার মানে শুনতে চান ? গাড়ীটা এতই সংক্ষিপ্ত যে একত্রে দু'চারজনকে ঠাঁই দেওয়া চলেনা, কাজেই—ছোট ছেলেদের পালা করে দু'চার দিন বেড়িয়ে আনলাম—মা কাকীমা পিসিমাদের ধরে ধরে গঙ্গায় চুবিয়ে আনা গেল কয়েকদিন, কাকা আছেন—তাঁকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ঘুরিয়ে এনেছি, আর কি করবো ? সময় পাইনা মোটে, নিজস্ব বাহন একটা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

—ছি ছি কি অন্যায় ! তিনি চটলেন না ?

—তিনি ?

অদ্ভুত কৌতুকের হাসিতে মুখ ভরিয়া ওঠে ডাক্তারের।

—ওই একটা মস্ত সুবিধে আছে আমার, কোন কিছুতে নতুন করে চটতে হয় না তাঁকে, টেম্পারেচারটা সব সময়ই শেষ ডিগ্রীতে উঠে আছে। অপরাধ করে ফেলবার ভয় আমার নেই।

—খুব বুঝি রাগী ?

—রাগী ? ব্যাপারটা কি জানেন—খুব রাগী, কিম্বা খুব অনুরাগী সেটা এখনো ধার্য্য হয়নি, এ্যানালিসিস করছি।

—আপনার সব কথাতেই ঠাট্টা।

—আমাদের জীবনটাই কি একটা ঠাট্টা মাত্র নয় ? বিধাতা পুরুষের একটু সৌখিন ঠাট্টা ? কথায় ঠাট্টা ছাড়া আর কিসের ছাপ পড়বে ?···

কাটিতে থাকে সময়···অকারণ অনেকটা পেট্রল খরচ করিয়া নানা রাস্তা ঘুরিয়া অবশেষে কমলালয় ষ্টোর্সের সামনে আসিয়া থামে।

—নেমে পড়ুন, কি কিনবেন বলুন।···কি হ'ল অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন ? অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে রাগিয়ে দিলাম নাকি ?

—না রাগ নয়, তবে আগেই তো বলেছি আপনাকে, প্রয়োজন আমার সামান্যই, এতবড় জায়গায় ঢুকতে বিশ্রী লাগে।

—এই কথা ! কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্তই না হয় কিছু নিলেন, এসব তো আর পচে নষ্ট হবার জিনিস নয়-বলিয়া নামাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেয়।

ভঙ্গীটা এত সহজ স্বাভাবিক যে প্রসারিত হাতের উপর হাত রাখা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

অরুণেন্দুর স্বভাবের মধ্যে এমন একটা জোর আছে যে তাকে এড়ানো মুস্কিল, ফিরাইয়া দেওয়া কঠিন।…কিন্তু তাই বলিয়া রাশিকৃত জিনিস কিনিয়া দাম দিবে নিজের পকেট হইতে—এ বরদাস্ত করা যে আরো কঠিন।…

দোকানের মধ্যে বিশেষ কিছু বলা শোভন নয়, গাড়ীতে উঠিয়া বেশ গম্ভীর চালেই বলে—আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যেতেই হবে আপনাকে, উপায় নেই। বেশী টাকা তো আনিনি সঙ্গে।

অবশ্য বাড়ীতে তাহার টাকার গাছ পোঁতা নাই, সে কথা সে জানে। ভরসা প্রতিমা, কিছু ধার লওয়া ছাড়া উপায় নাই।…ভালো ঝঞ্ঝাটে ফেলিল লোকটা !

মুখের ভাবে মনের কথা ধরা পড়েই।

অরুণেন্দু একবার সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকায়, গভীর দৃষ্টিতে। কিন্তু চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মুখের কথার অমিল তার বরাবর। হাসিয়া বলে—একথা আর দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করবেন না। বুঝলেন ? প্রভুর দেশের আদব-কায়দা গুলো এখনো শিখতে পারলেন না ? ওরা—ঈশ্বর করুন একদিন যদি এদেশ ছেড়ে দিয়ে নিতান্তই যায়—যা আদব

'কায়দাগুলো ছড়িয়ে রেখে এসেছে এতদিন ধরে, কিছুকাল তার ফসলে চলে যাবে, যাবে না? এই ধরুন—ভদ্রমহিলার পার্শ্বরক্ষক হিসেবে এসে ভ্যানিটী ব্যাগের কাছে হাত পাতা? শেম্ শেম্!

—কিন্তু দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি আমি ওসব আদব-কায়দায় অভ্যস্ত নই, দাম না নিলে জিনিসগুলো নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

—কি আশ্চর্য্য! সামান্য কারণে বিচলিত হচ্ছেন কেন? মনে করুন আমাকে কৃতার্থ করবার জন্যেই নিলেন?

—না না কিছুতেই না, কক্ষনো না।

হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়া নিজের কাণেই স্বরটা বড় রূঢ় শোনায়।

কিন্তু ডাক্তার করিল কি!

তিনখানা সাবান সমেত "অজন্তার" বাক্সটা রাস্তায় ছুঁড়িয়া দিয়া দামী সেন্টের শিশিটা তুলিয়া লইয়া হাত উঠাইয়াছে!

অগত্যা হাত চাপিয়া ধরা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব? ভাবিয়া দেখিবার আগে স্বভাবধর্ম্মেই বাধা দিতে হয়—মুখের উপর আঘাত আসিতে দেখিলে যেমন চোখের পাতা আপন ধর্ম্মে বন্ধ হইয়া যায়।

হাতটা ধরিয়া রাখিয়াই আরক্ত মুখে বলে—ক্ষেপে গেলেন না কি? ও কি হচ্ছে?

—কি করবো বলুন, নেওয়া যখন চলেনা—তখন ফেলে দেওয়ার চাইতে সদ্‌গতি আর কি হ'তে পারে ?

যেখানে কঠোর হওয়া উচিৎ, হইবার চেষ্টাও আছে, সেখানে মানুষ হাসিতে পারে ? কিন্তু পারিতেই হয়, উপায় কি ? 'ভদ্রতা' 'চক্ষুলজ্জা' প্রভৃতি বাজে বালাইগুলার দায়ও তো কম নয়।...তাই—অরুণেন্দুর এই খামখেয়ালী ব্যবহারে বিরক্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে মীনাকে হাসিতে হয়। হাসিয়া বলে—রাগ তো দেখছি আপনারও কম নয়। খোকার সেজমামীর সঙ্গগুণে বুঝি ? নেহাৎ আমার ঘাড়ে চাপাবেনই জিনিসগুলো ?...তবে যান ওটাকে কুড়িয়ে আনুন। যেমন ফেললেন পাগলামী করে ! আচ্ছা ছেলেমানুষী !

বার

ষ্টেশনে যাওয়ার সময় তটিনী মীনাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে —এই ব্যবস্থাই স্থির ছিল, কিন্তু তটিনী আসিল না—আসিল তাহার সেই মহাপণ্ডিত ছোড়দা। চিরদিনের নিষ্কণ্টক জীবনে হঠাৎ এক সঙ্গে এত উপদ্রব কেন?···কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছাটা একেবারে ফিকা মারিয়া গিয়াছে।···

পুরী, তটিনী, তটিনীর রুগ্না মা, আর পণ্ডিত দাদা মীনার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন অবান্তর।···কেনই যে মত দিল মীনা!···আচ্ছা আপত্তির কারণটাই বা কি? অরুণেন্দুর আকর্ষণ নয় তো? সদ্য পরিচয়ের একটা প্রত্যাশিত মোহ!

দূর, মীনাতো আর পাগল নয় যে একজন বিবাহিত গৃহস্থ ভদ্র লোকের আকর্ষণ স্বীকার করিয়া লইবে?···বাজে কথা। কলিকাতা তাহার ভাল লাগে, তা ছাড়া—এখন কলিকাতা ছাড়িয়া গেলে আর্থিক ক্ষতি অনিবার্য্য। সেই সব সাত পাঁচ ভাবিয়াই না মীনার এত দ্বিধা···।

আচ্ছা এখন যাওয়ার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া দিলে কি হয়? ধরো এমন কথা বলিয়া দেওয়া যাক, হঠাৎ একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে মীনা, এখন পথে বাহির হওয়া সঙ্গত

নয়। দু' চারদিন পরে নয় নিজেই গিয়া হানা দিবে সে। ঠিকানা জানা থাকিলেই হইল।...

মনে মনে অনেক কিছু ভাবিতে থাকে, অথচ হাত চলে বিপরীত গতিতে। বেডিং সুটকেস গোছানোই ছিল। প্রতিমা আসিয়া দরজায় উঁকি দিয়া বলিলেন—ওগো বাছা, তোমার গোছগাছ হয়েছে? ওই দেখ নীচে গাড়ী নিয়ে এসে বসে আছে।

—গাড়ী এনেছে? কই? গাড়ীতে আছে কে? তটিনী আসেনি?

—কি জানি, একটী সোন্দর ফুটফুটে ছোকরা তো গাড়ী চালিয়ে এনেছে দেখলাম। নীচের ভাড়াটেদের ছেলে এসে বললো কি না—"কে পুরী যাবে তাকে নিতে এসেছে—" তাই উঁকি দিয়ে দেখলাম। কে ওটি? কোনো বড়মানুষের ছেলে বুঝি? রূপখানা খুব! তা'—বড়মানুষদের কি ড্রাইভার নেই? একলাই বুঝি যাবে ওর সঙ্গে পুরী?

মীনা বিরক্তভাবে বলে—ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাবো। বলেছিতো—বন্ধু, বন্ধুর মা সবাই যাবেন।

—বলেছিলে বটে, তা দেখছি না তো কাউকে—নাও চট্‌পট্ নাও, আবার ট্রেন ফেল না হয়ে যায়, এখনকার মেয়েদের তো সাজতে গুজতে ফিঙেরাজা।

গৃহিণী এবং বাড়ীওয়ালী জনোচিত যথাকর্ত্তব্য সারিয়া প্রতিমা সরিয়া পড়েন।...

মীনা ঠেলা-খাওয়া মালগাড়ীর মত তাড়াতাড়ি সারিয়া লয় বাকী কর্ত্তব্যগুলা। মোট ঘাট নামাইয়া দেয় প্রতিমার নতুন বামুন ঠাকুরটা, যাকে মাধবীর অসুখের পর হইতে রাখা হইয়াছে।···মাধবী কাছে আসিয়া ম্লান মুখে দাঁড়ায়···'মীনাদি' তাহাদের দুরন্ত মরুভূমির ওয়েশিস্। ঘরের দরজায় তালা লাগাইয়া মাধবীর হাতে চাবিটা দিল মীনা। তালা লাগাইয়া চাবিটা লইয়া যাওয়া যেন নেহাৎ লজ্জা করে।

—আমার ঘরে বইটই আছে পড়িস ইচ্ছে হলে কেমন ?··· আর দেখ মাধবী বেশী খাটিস না—বেশী ভয়ে ভয়ে থাকিস না—ডাক্তার বলেছে তোর একটু সাবধানে থাকা দরকার।··· হাঁ কাল পথে দেখা হ'ল কি না, জিগ্যেস করছিল তোর কথা। ···আচ্ছা চললাম কেমন ?

—ঢং করে আবার চাবি রেখে যাওয়া কেন ?···প্রতিমা বিরক্তভাবে বলেন—পরের ঝঞ্ঝাট রাখতে আছে ? কোন দিন কি 'খোয়া' যাবে বাবা, শেষটা নিজেদের বদনাম।

—'খোয়া'ই বা যাবে কেন, আর আমাদেরই বা বদ্‌নাম কিসের ?

মুখখানা ঘুরাইয়া চলিয়া যায় অতসী। মার কথাবার্ত্তা তার আদপে ভাল লাগেনা। মীনাদি—অমন যে সভ্যভব্য ভদ্র মহিলা— তার সঙ্গে এবং তার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় যদি কোনো ভব্যতা, কোনো শ্রী থাকে প্রতিমার।

অবশ্য মেয়ের মনোভাব বুঝিয়া সামলাইয়া চলার কথা প্রতিমার নয়, তিনি তাঁর খুসীমত যা কিছু বলিতে পারেন। আর না বলিয়া থাকাই কি সম্ভব? এই যে মীনা···এদিকে তো বলে 'বেম্ম' নয়, খ্রীষ্টান নয়—হিঁদু, তা' যাচ্ছিস যে পুরী, কই জগন্নাথের নাম করেছিস একবার?—বিরক্তভাবে বলেন—তোমাদেরও বলি বাছা, 'দিদিমণি দিদিমণি' বলে অজ্ঞান হয়ে যাও, এই সব অহিন্দুপানা শেখবার জন্যে না? পরকাল ঝর্‌ঝরে হচ্ছে আর কি, দু'জনেরই হচ্ছে। একটি ভিজে বেড়াল, একটী দজ্জাল। চোখের ওপর সর্ব্বদা এই দৃষ্টান্ত—তার চেয়ে দুদণ্ড নীচের তলার ভাড়াটেদের সঙ্গে ভাব করে আয় দিকিন। যেমনি আচারবিচের হিঁদুয়ানী, তেমনি মিলুনে মিশুনে। দেখলে আহ্লাদ হয়।

তের

কেমন যে আনমনা ভাবে সারা পথটা আসিয়াছে মীনা··· চমক ভাঙিল একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া। কি আশ্চর্য্য, এতটা পথ সে একটাও কথা বলে নাই, অথচ সাগরময়—তটিনীর ছোড়দাকে সে যে একেবারে চেনে না এমন নয়, তটিনীকে আনা নেওয়া করিতে প্রায়ই আসে স্কুলে।

কিন্তু সাগরময়ই বা কেমন ভদ্র লোক? বোবা না কি? শিখ ড্রাইভারগুলার মত গম্ভীর চালে গাড়ীই চালাইতেছে। অথচ আজই সকালে—অরুণেন্দুর সঙ্গে এক গাড়ীতে চলিতে—কথার জ্বালায় হাঁপাইয়া উঠিতে হইয়াছিল। কত রকমই যে মানুষ থাকে!

নামিতে না নামিতে তটিনী হৈ হৈ করিয়া উঠিল—বাব্‌বাঃ। এত দেরী কেন? আমি তো স্থির নিশ্চয় করে ফেলেছিলাম ট্রেন ফেল সম্বন্ধে। উঃ তবু যদি—স্বরটা কিছু খাটো করিয়া—কাউকে বিরহ সাগরে ভাসিয়ে অনাথ করে আসতিস! কি করছিলি এতক্ষণ?

—কি আবার করবো। ট্রেন বেরিয়ে গেছে?

—যায়নি যেন, যেতে কতক্ষণ?

—গল্পটা ভবিষ্যতের জন্যে রাখলে হ'ত না তনু?

এতক্ষণে সাগরের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।

রিজার্ভ কামরা, গুছাইয়া বসিতে দেরী হয় না।

অভিজাত যাত্রীদের সুখ সুবিধা বর্ত্তমানে কিছু পরিমা কমতি হইলেও যথেষ্টই আছে। অন্ততঃ মীনার অভ্যাসের তুলনায়। পথখরচা এরা লইবে না অবশ্যই, ফার্স্ট ক্লাশ ট্রেনের ভাড়া কত মনে মনে তাহারই হিসাব করিতে থাকে মীনা।

রুগ্ন মাকে সযত্নে শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে দুই চারিটা কথা কয় সাগর—গম্ভীর মৃদু কণ্ঠ। সব ঠিক হইতেই একখানা বই খুলিয়া বসে।···

ট্রেন চলিতে সুরু করিলে—মীনা চুপি চুপি বলে—তোর ছোড়দা তা'হলে বোবা নয় ?

—কেন তোর সঙ্গে আলাপ করেনি বলে ? ও ওইরকম ছেলেবেলা থেকেই। আমি যেমনি বাচাল, ও তেমনি মুখচোরা বাড়ীতে বৌদিদের সঙ্গেই কথা কয়না ভালো করে। অনেকে ভাবে চালিয়াৎ, কিন্তু তা' নয়—যার সঙ্গে একবার মিশে যাবে তার কাছে খুব সপ্রতিভ কিন্তু।···যাক আর বেশী ওকালতি করবোনা, তুই আবার কিছু ভেবে না বসিস।···

এক্সপ্রেস ট্রেনের দুরন্ত গতিবেগে কণ্ঠস্বর হারাইয়া যায়··· গল্প তেমন জমেনা। তা'ছাড়া রাত্রির অবসন্নতা—'ঘুমাইবনা' প্রতিজ্ঞা করিয়াও হাই ওঠে।···

—তবু তোরা ঘুমিয়ে নে, মিথ্যে জেগে লাভ কি ?

বলিয়া সাগর একবার উঠিয়া মায়ের ঢাকাটা ভালভাবে টানিয়া দিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পুনশ্চ বই খুলিয়া বসে. অর্থাৎ অভিভাবকের কর্ত্তব্য যথেষ্ট করা হইয়াছে।

... ...

বাড়ী তটিনীদের নিজেদেরই আছে সমুদ্রের বুক ঘেঁসিয়া।

সমুদ্র যখন তোলপাড় করিয়া ছুটিয়া আসে, একতলার রেলিং ঘেরা বারান্দার নীচেয় জল ছুঁইয়া যায়।

চমৎকার! সারাদিন বসিয়া বসিয়া ঢেউ গণিলেও যেন ক্লান্তি আসে না। শুধু দিন ? রাত্রির সমুদ্র কী ভয়ঙ্কর সুন্দর ! কালো ঢেউয়ের স্তরের চূড়ায় চূড়ায় রূপার প্রলেপ! ঢেউ ভাঙ্গিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়াইয়া পড়িতেছে কালো স্তরের খাঁজে খাঁজে....আবার আসিতেছে নূতন দল···আবার হারাইয়া যাইতেছে···বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।···কী অদ্ভুত লাগে মীনার! গভীর রাত্রেও কি দুইদণ্ড স্থির হয় না বেচারা!···কে ওকে এই চাকরীটা দিয়াছে! নিরলস, নিরবসর চির চঞ্চল! যুগযুগান্ত, কোটি কল্পকাল ও কি এই একই কাজ করিয়া যাইবে ?···

সাগর সমুদ্রেরই একটা নাম না ? ···

তটিনীর দাদাকে এমন অনুপযুক্ত নামটা কে দিল ?

কী অদ্ভুত গম্ভীর !

চৌদ্দ

মিত্তির বাড়ীর মুখ অপমানে কালো হইয়া উঠিয়াছে।

এ বংশে—এ বংশের উপরওয়ালাদের উজ্জ্বল মুখের উপর এমন করিয়া চূণকালি আর কখনো কেউ লাগায় নাই।... বিচারের কথা পরে...

এই আকস্মিক আঘাতে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেছে সকলে।

বাড়ীর কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মনোজ গিয়াছিল বৌ লইয়া মিটিঙে, লেকচার শুনিতে!...সেখানে যে পাঁচহাজার লোকের ভীড়, মেয়েদের পর্দ্দার প্রশ্নই ওঠেনা, এরকম গুরুতর কথাটাও গৌণ হইয়া গিয়াছে, বিনা নোটিশে যে এ বাড়ীর বৌ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙাইয়াছে সেইটাই অবিশ্বাস্য মুখ্য ব্যাপার।

সারাবাড়ীতে কাণাকাণি, এখানে ওখানে কনফারেন্স... সকলেরই কপালের উপর চোখ, গালের উপর হাত। নূতনবৌ করিল কি! মনোজের স্পর্দ্ধা যে অসহনীয় সেটা ঠিকই, তবু সে পুরুষমানুষ, ছেলেমানুষও বলা চলে, কিন্তু সুরেখা? অতবড় বুড়োমাগী এমনই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন! আর কিছু নয়, বুকের পাটা!

সাংঘাতিক বুকের পাটা! মনোজেরই বা দোষ কি, বৌয়ের কাছে তো সে 'কেঁচো'। একরত্তি ছেলের গলায় ওই আগুণের খাপরাকে ঝুলাইয়া দিল সে আর ছেলেমানুষের কাঁচামাথাটা গ্রাস করিয়া বসিবে না?...দোষ কর্তৃপক্ষেরই। ওই বৌ যে মনোজের মত ভ্যাবাগঙ্গারাম বরকে নাকে দড়ি দিয়া পাক খাওয়াইবে—সে বিবেচনাটুকু বিবাহের সময়ই করা উচিৎ ছিল।

রাজ্য চুঁড়িয়া সুন্দরী বৌ আনার প্রতিফল বোঝো!

রূপ দেখিয়া গলিয়া পড়িলে এই শাস্তিই হয়। সুন্দরী বৌ দেখাইয়া পাঁচজনের কাছে বাহবা লইবার খেসারৎ ভোগ করো এখন! রূপসী বৌ আনা খাল কাটিয়া কুমীর আনার মতই বোকামী ছাড়া আর কি? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা।

এখনকার ধর্ম্মজ্ঞান এবং হিতাহিতজ্ঞান শূন্য ছেলেরা রূপসীর পাদপদ্মে চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিবে এ আর বিচিত্র কি? তার ওপর আবার লিখিয়ে পড়িয়ে বিদ্যেবতী মেয়ে।

কথাগুলা নানা আকারে নানা বেশে এ মুখ হইতে ওমুখে, এ কাণ হইতে ও কাণে হাঁটিয়া বেড়ায়।

বাসন্তী বিরক্ত হইয়া বলে—রূপের কথা আর বলিসনে বাবু, ওসব ছক্কাপঞ্জা মেয়েদের বারো আনা রূপ তো ঠাটঠমকে। সাবান পাউডার টিপ কাজলের রূপ। রূপের কথা বলছিস? বলি—আমাদের মেজ জ্যেঠির রূপটা কি কম? এখনো বুড়ো

বয়সে—হস্তেলের মতো রং। মুখ চোখ গড়ন পেটন তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। কই মেজজ্যেঠি কি কখনো—

বলিতে গিয়া থামিয়া যায়। মেজজ্যেঠি আজীবন যে অপ্রতিহত প্রতাপে সংসার করিয়া আসিতেছেন সে কথা আর যারই হোক বাসন্তীর অন্ততঃ অজানা নাই। স্বর্গগত মেজজ্যেঠার সদাসন্ত্রস্ত উদ্বিগ্ন মুখচ্ছবি স্মরণে আসিতেই বোধকরি থামিতে বাধ্য হয়।

অলকা মুখখানা ঘুরাইয়া বলে—তোমরাই রূপ রূপ করো, আমি তো রূপের কিছু দেখতে পাইনে, তবে হ্যাঁ 'তুক' করতে জানে বটে। এইতো বাবা আমরাও এ বাড়ীর বৌ হয়ে এসেছি। আমাদের ওপর কী শাসন, কী জবরদস্তি! ইনি নাতবৌ হয়ে সাপের পাঁচ পা দেখেছেন। আস্পর্দ্ধা বাড়বেনা কেন? প্রশ্রয় পেলেই আস্পর্দ্ধা বাড়ে। কিন্তু এও বলে রাখছি ঠাকুরঝি, আমরাও আর পর্দ্দানশীন হয়ে থাকছিনা—কালকের বৌ যদি এত স্বাধীন হতে পারে—

আস্ফালন আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পায় না—হেমলতা পূজার ঘর হইতে নামিয়া আসিয়াছেন।...মটকার থান পরণে, হাতে জপের মালা, কপালে চন্দনের ছোট্ট একটী টিপ। সুন্দরী যে ছিলেন সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।...মুখের ভাবে স্নিগ্ধ লাবণ্যের বদলে ঈষৎ কাঠিন্যের ছাপ।...

—কিসের আলোচনা হচ্ছে সেজবৌমা?

সেজবৌমা চুপ করিয়া থাকেন, উত্তর দেয় বাসন্তী—আর কিসের মেজজ্যেঠি, বাড়ীতে আজকাল যে সব নতুন হাওয়া উঠেছে তারই। বাড়ীর বৌরা এইবার স্বাধীন জেনানা হ'তে চান।

হেমলতা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একবার সভার প্রত্যেক সভ্যার মুখচ্ছবি দেখিয়া লইয়া মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—দিবারাত্র বাজে গল্প, অসার আলোচনা করে তোমরা কি সুখ পাও বাছা বুঝিনা। কই একবারও তো একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ খুলে পড়তে বা দু'টো সদালোচনা করতে দেখিনা কাউকে?

অপরাধ বোধের ভারেই বোধহয় কেউ আর মুখ তুলিয়া চায় না।

নিঃশব্দে আবার কিছুক্ষণ মালা ঘুরানোর পর সেটা কপালে ঠেকাইয়া হেমলতা আসল কথা পাড়েন।

—'মনু' কোথায় উমা।

'মনু' অর্থে মনোজ।

উমাশশী শঙ্কিতভাবে বলে—সেইতো তখন থেকে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে বসে আছে, সাহস করে বাড়ী আসতে পারছে না।

—সাহস?—তোরা যে হাসালি উমি! অতবড় দুঃসাহসের কাজটা করতে সাহস হ'ল আর এখন বাড়ী ঢুকতে সাহস নেই? ...তিনি কোথায়? তোমাদের বৌ?

—কে বৌমা? সেও সেই থেকে ঘরে বসে আছে।

—ভালই। এখনকার মেয়ে—লেখাপড়া জানা মেয়ে যা করেছেন অবিশ্যি ভালো বুঝেই করেছেন, কিন্তু আমাদের তো এবার সংসার ছাড়তে হয় মা।…

অলকা সকলের অলক্ষিতে মুখটা বাঁকাইয়া ঘুরিয়া বসে। ভঙ্গীটাকে ভাষায় রূপান্তরিত করিলে বোধহয় এইরূপ দাঁড়াইত "—হ্যাঁ তুমি নইলে আর সংসার ছাড়বে কে! মুঠোর ফাঁক দিয়ে পিঁপড়েটী গলতে পায়না—উনি ছাড়বেন সংসার! বৈরাগ্য কত!"

বাসন্তী খরখর করিয়া বলে—সংসার এবার সকলকেই ছাড়তে হবে গো মেজজ্যেঠি, যে রকম স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হয়েছে। আমরা আর পাত্তা পাবো না।

হেমলতার আর যাই থাক পক্ষপাত দোষ নাই।

বাসন্তীর দিকে একটী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হানিয়া বলেন—গোবিন্দ করুন, এখানের আদরে যেন দরকার কখনো না হয় তোমার, আসল ঘর বজায় থাকুক মা। উর্মির কপাল মনে করলে—নারায়ণ! নারায়ণ!…জামাই এসেছিলেন শুনলাম—নিয়ে যাবার কথা বলতে বুঝি?

বাসন্তী মুখ কালি করিয়া বলে—নিয়ে যাবার জন্যে তো নাছোড়বান্দা, আমিই বলে কয়ে আর দু'টো মাস থাকার ব্যবস্থা করলাম। আমার তো এই শরীর—শ্বাশুড়ী ঠাকরুণতো সেই বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর 'কন্না'! আবার শুনছি ননদ এসেছেন একপাল ছেলে নিয়ে। কিসের

সুখে যে নিত্যি ভাইয়ের বাড়ী আসতে ইচ্ছে হয় তা' জানিনে। সে না গেলে বাবা আমি যাচ্ছিনে।

বলিয়া বাসন্তী একটা কাজের অছিলায় উঠিয়া যায়।

মেজজ্যেঠির এত তোষামোদ করে বেচারা, তবু সুযোগ পাইলেই এই শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কথা তুলিয়া কি যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় তাঁর! সুরেশের যে আজ তিনমাস চাকরী নাই, অমন রসালো খবরটা কি এখনো চাপা আছে তাঁর কাছে?

তবে?

বাপকাকার ঘরে এত ভাত থাকিতে বাসন্তী কি উপোস করিয়া মরিবে না কি?

বাসন্তীর ব্যবহারের ভব্যতার অভাব বেশী মর্ম্মাহত বড় কাহাকেও করে না। একটা পাগল অথবা সং থাকিলে যেমন মনোভাব হয় লোকের, অনুরূপ মনোভাবই প্রায় সকলের, তবু উমাশশী বোকা বলিয়াই বলিয়া বসে—বাবা সেজদি যেন কি! শ্বাশুড়ী ননদকে এত হতচ্ছেদ্দা কিসের মেয়েমানুষের? 'শ্বশুরবাড়ী যাবোনা'—এ কী অনাচ্ছিষ্টি বাবু!

—তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও মা। ও তবু দু'মাস ছ'মাসও যায়, তোমার তো সে পথও রাখেননি ভগবান। ···গোবিন্দ! গোবিন্দ!···ওখানে কে রে? শান্তি? তোদের বড়দাকে একবার ডেকে দে তো।

উমাশশীকেও পাথর করিয়া দিয়া হেমলতা এতক্ষণে নিবিষ্টমনে জপেরমালা ঘুরাইতে থাকেন।

বড়দাকে ডাকিবার তাৎপর্য্য বুঝিতে কেউই পারে না। কারণ 'বড়দা' বা অপূর্ব্ব এ বাড়ীতে একটা ঘটী বাটীর সামিল। সংসারের কোনো ব্যাপারে তাহার মতামতের যে কিছুমাত্র মূল্য আছে এ কথা যেমন সংসারের লোক স্বীকার করে না, সে নিজেও তেমনি গা ছাড়িয়া দিয়া বাঁচে।... দাম্পত্যজীবনের শৈশবাবস্থায় স্ত্রীটী গত হইয়াছেন, ব্যস! মার্চেন্ট অফিসের চাকরীটুকু আর অবসর সময়ে সময় বিনোদনের জন্য সখের ইঞ্জিনিয়ারিং, এই লইয়াই নিশ্চিন্ত-সুখে দিন কাটে তার।

বাড়ীতে জলের পাইপ ভাঙিলে, ইলেকট্রিক খারাপ হইলে, ছোটখাটো মেরামতীর কাজের প্রয়োজন ঘটিলে, মিস্ত্রী ডাকিবার প্রয়োজন হয় না—'বড়দা'কে খবর দিলেই সব ঠিক।...এছাড়া ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন্, রেডিও, সেলাই কলের ব্যাপারেও তার নিপুণতা অদ্ভুত।...কী কৌশলে যে টুকটাক করিয়া সমস্ত কলকব্জাগুলা আলাদা করিয়া মাটিতে ছড়াইয়া ফেলিয়া, আবার আস্ত জিনিসটা খাড়া করিয়া তোলে সেই জানে।...অথচ যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা দেখিলে হাসি পায়।

একটা নরুনের সাহায্যে একটা বাতিল করা হারমোনিয়মকে রীতিমত কার্য্যক্ষম করিয়া তোলা তার ইতিহাসে বিরল নয়।

সাময়িক প্রশংসা যে একটু আধটু না জোটে তা' নয় —তবে প্রশংসার জন্য মাথাব্যথা তার নাই। কাজটা যেন তার জীবনের খোরাক বাড়ীর সমস্ত জিনিসগুলা যখন নিষ্ঠুরভাবে আস্ত হইয়া বসিয়া থাকে, তখন হতাশ অপূর্ব্ব পাড়ার লোকের আর অফিসের বাবুদের 'ব্যাগার' চাহিয়া চাহিয়া বাড়ীতে জড় করে। সর্ব্বদাই অপূর্ব্ব কাজে মসগুল। বাড়ীতে লাঠালাঠি হইয়া গেলেও তার চৈতন্যের দরজা অবধি পৌঁছায় না।

বড়ছেলেকে হেমলতা কমই ডাকেন, যা কিছু পরামর্শ মেজছেলের সঙ্গে। আজ হঠাৎ তার খোঁজ কেন?...অলকা বিস্মিত হইলেও উঠিয়া গিয়া বাঁচে। শ্বাশুড়ীর সামনে বসিয়া থাকিতে গায়ে তাহার জ্বর আসে। ভাসুর আসার ছুতায় তবু সরিয়া পড়া গেল।

অপূর্ব্বের অবশ্য মরিবার সময় নাই, তবু মা ডাকিতেছেন —কাজেই একখানা কলঙ্কপড়া তামার চাকতি, আর একখণ্ড শিরিষকাগজ হাতে লইয়া ব্যস্তভাবে আসিয়া দাঁড়ায়।

—মা ডাকছো নাকি?

—ডাকছি তো—তোমার কি দু'দণ্ড বসবার সময় হবে?

হেমলতা অল্প একটু হাসেন।

—সময়? হুঁঃ মরবার সময় আছে আমার? যতরাজ্যের জঞ্জাল আমার ঘাড়ে চাপাবে সবাই! কই কি বলছো বল না?

হেমলতা গম্ভীরভাবে বলেন—আমাকে বিন্ধ্যাচলে গুরুদেবের আশ্রমে রেখে আসতে হবে তোমায়।

—আমায় রেখে আসতে হবে? আমি কখন যাবো? বাঃ!

—'কখন যাবে' সে ব্যবস্থা তোমার, কিন্তু সবতাতে গা ঝেড়ে দিলে তো চলবে না অপূর্ব্ব, এ ভার তোমাকেই নিতে হবে।

—কী মুস্কিল! 'নিতে হবে' বল্‌লেই নিতে হবে? হঠাৎ তোমার গুরুআশ্রমে যাবার কী দরকার পড়লো বাপু? ও সব ফ্যাচাং ছাড়ো, পূজোর সময় যেও তখন। সে সময় জলহাওয়া ভালো, এখন এই পচা গরম কালে—

—আমি তোমায় উপদেশ দিতে ডাকিনি অপূর্ব্ব, হুকুম করছি।...সামনে দু'দিন ছুটি রয়েছে তোমার, তৈরী থেকো।

—আচ্ছা বিপদ!...অপূর্ব্ব হতাশভঙ্গীতে দুইহাত উল্টাইয়া বলে—অফিসের ছুটি হলেই হ'ল? আর কাজ নেই?

—কাজ তো ওই ভাঙ্গা টিনের টুকরো আর মরচে পড়া পেরেক ইস্ক্রুপ নিয়ে? দু'দিন বন্ধ থাকলে পৃথিবী থেমে থাকবে না।

—থেমে থাকবে না? বেশ কথা তো তোমার! খামোকা আশ্রমের জন্য ক্ষেপলে কেন তাই বলনা ছাই?

—সে বললেও তোমার মাথায় ঢুকবেনা বাবা। তুমি পারবে কি না তাই বল পষ্ট করে।

—পারবোনা কেন, শক্তটা কি ?....কিন্তু বিপিনবাবু কি মুস্কিলে পড়ে যাবেন বলো ? ভদ্রলোক বন্ধুর ঘড়িটা চেয়ে পরে গিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ী। সেখানে একটা হতভাগা ছোট শ্যালা দিয়েছে সেটার দফা নিকেশ করে। এখন বন্ধুর কাছে মুখ দেখানো দায় হয়েছে। ঘড়িটা না ঠিক করে—

—পরের ঘড়ি চেয়ে পরে যারা বাহার দেয়—তা'দের শাস্তি হওয়াই ভালো—

অপূর্ব্ব তামার চাক্তিখানা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলে—তুমি তো বললে "ভালো," আমিও বুঝলাম ভালো, কিন্তু বিপিনবাবুর দিকটাও তো দেখতে হবে ? ভদ্রলোক অপমানী হয় সেটা তো ঠিক নয় !

'মালা ফেরানো' সমাপ্ত করিয়া শেষ গ্রন্থীটা কপালে ঠেকাইয়া নমস্কারান্তে ঠোঁটের আগায় সামান্য একটু হাসির আভাস আঁকিয়া হেমলতা বলেন—বিপিন বাবুর মান-সম্মান রাখাটাই বড় কাজ হ'ল কেমন ? আর নিজের মার সম্মান বজায় রাখাটা কিছুই নয় কি বলো ?

—মার সম্মান ?

অপূর্ব্ব বিমূঢ়ভাবে বলে—সেটা আবার কি কথা হ'ল ?

—সব কথা যাকে ওষুধ গেলানো করে ধরে বোঝাতে হয় তাকে ও সব বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয় বাবা, কিন্তু থাক তুমি যখন পারবেই না তখন কথা বাড়িয়ে লাভ কি !

—কি মুস্কিল! পারবো না কে বলেছে? ছুটিই রয়েছে যখন—না পারবার আছে কি? তবে হঠাৎ গুরুদেবের জন্মে মন কেমন করলো কেন তাই বলছি। যাক গে—তুমি তাহলে ঠিক হয়ে নাও কাল রাত্রেই বেরিয়ে পড়া যাক। পর্শু তর্শু ছুটি রয়েছে —

মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন হইয়াই গিয়াছে এইভাবে অপূর্ব্ব ঘরে গিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে শিরিষ কাগজ ও তামার টুকরায় মনোনিবেশ করে।···

আঃ তুইদণ্ড সুস্থির হইয়া কাজ করিবার জো নাই।···অপূর্ব্বর যে কত কাজ কেউ বুঝিতেই চায় না। ঘড়িটার জন্য বন্ধুর কাছে মুখ দেখানো দায় হইয়াছে বিপিনবাবুর, সে দিকে দৃষ্টি নাই। হুজুগ কি? না, বিন্ধ্যাচলে যাও।

নাঃ সবদিক মাটি করিয়া ছাড়িলেন এই মা'টা।

রাতভোর খাটিলে ঘড়িটা অবশ্য ঠিক করা অসম্ভব ছিলনা, কিন্তু মুস্কিল বাধিয়াছে একটা স্প্রীং লইয়া। অত সূক্ষ্ম স্প্রীং সহজে যোগাড় করা কঠিন। অমূল্যর অফিসের কাছাকাছি একটা ঘড়ি মেরামতের দোকান আছে, অমূল্য যদি একবার চেষ্টা দেখে···বুঝাইয়া বলিবার জন্য অমূল্যর ঘরের দিকে পা বাড়াতেই সোজাসুজি দেখা অমূল্যর সঙ্গেই—তাড়াতাড়ি স্নান করিতে যাইতেছে।—"এই যে অমূল্য"—বলিবার আগেই

অমূল্য নিজেই বলিল—এই যে দাদা, শুনলাম নাকি মাকে বিন্ধ্যাচলে নিয়ে যেতে রাজী হচ্ছনা তুমি ?

কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আভাস। কিছুটা অভিযোগও।

অবশ্য সেটা এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়, অমূল্য সদাই বিরক্ত।

অপূর্ব্ব থতমত খাইয়া বলে—রাজী নই বললে ছাড়ছে কে ? মা তো যাবার জন্য ব্যস্ত।

—ব্যস্ত না হয়ে উপায় কি ? বাড়ীতে তো আর মান সম্ভ্রম নিয়ে বাস করা চলেনা।

অপূর্ব্ব এবার একটু যেন অবহিত হয়, সকৌতূহলে বলে—ব্যাপার কি বলো তো, হঠাৎ বাড়ীতে এমন মানসম্ভ্রম যায় যায় অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো কখন ? কেনই বা ? কিছুক্ষণ আগে মাও যেন ওই ধরণের কি একটা বলছিলেন—হল কি ?

—চোখ বুজে বাস করো বৈ তো নয়, খবর তো রাখো না কিছু। তবে আমি এই বলে দিচ্ছি—মাকে যদি অপমানী হয়ে এ সংসার ছাড়তে হয়, তা'হলে মা লক্ষ্মী আর একদিনও দাঁড়াবেন না।

অমূল্য যখন যা বলে তার মধ্যে আর যাই হোক উত্তেজনার অভাব থাকে না।

অপূর্ব্ব নাচার। হতাশভাবে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না তার।...আরে বাপু মান আর অপমান

শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল—বলি কে কাকে অপমান করলো তাই তো বুঝলাম না ছাই।

—তুমি আর ন্যাকা সেজোনা দাদা, বলি এই যে বাড়ীর বৌরা সব মার অনুমতির অপেক্ষামাত্র না করে সভাসমিতি করে বেড়াচ্ছেন, মিটিঙে যাচ্ছেন, এটা কি দস্তুরমতো অপমান করা নয়?

অপূর্ব্ব একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলে—সেই অপমানে মা যদি দেশত্যাগী হ'তে চান তবে বরং বিন্ধ্যাচলের বদলে রাঁচী পাঠিয়ে দে মাকে। যতো সব ছেলেমানুষী! আমি তাই ভাবছি—বলা কওয়া নেই খামোকা গুরুদেবের জন্যে 'মনকেমন'! ব্যাপার কি! যাক বাঁচা গেল। ঘড়িটার জন্যে যা দুর্ভাবনা হয়েছিল।...

স্নানের তাড়াতাড়ি ভুলিয়া অমূল্য তাল ঠুকিয়া দাঁড়ায়।

—তুমি তা'হলে নিয়ে যাবে না?

—পাগল হয়েছিস? নিয়ে যাবো কি বল্? যতো সব ছেলেমানুষী!

—তুমি কি মনে করো তুমি না নিয়ে গেলেই মার যাওয়া আটকাবে?

অপূর্ব্ব সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া বলে—পাগল, তাই বা মনে করতে যাবো কেন? বিন্ধ্যাচল কেন বিলেত যেতে চাইলেই বা মাকে আটকায় কে? তা'বলে নিজে তো পাগলের সঙ্গে তাল রেখে পাগলামী করতে পারিনে?

অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে ছুই চোখ পাকাইয়া অমূল্য ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করে বাহাছুরী বোধ করো কেমন? মাকে পাগল বলতে লজ্জা হ'ল না?

—কিছু না। যে যেমন আচরণ করবে তা'কে তেমন বিশেষণ না দিয়ে উপায়? বৌমা মন্নুর সঙ্গে ছ'ঘণ্টা বেড়িয়ে এসেছেন বলে মাকে যদি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে হয়, তা'হলে ওছাড়া আর কি বিশেষণ আছে বলো? মা যদি বাড়ীর বৌদের বোরখা পরে বেড়াতে বলেন—বেড়াবে তাই?

'মাতৃভক্ত' বলিয়া খুব বেশী খ্যাতি যে অমূল্যর আছে এমন নয়, কিন্তু তর্কে হারার ক্ষেত্রে মা কেন—গো ব্রাহ্মণে ভক্তিমান হইতেও আপত্তি নাই তা'র। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আস্ফালন করাই তার পেশা।—কাজেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথায় যেন নাচিয়া ওঠে—আলবাৎ বেড়াবে, নিশ্চয় বেড়াবে, বেড়াতে বাধ্য। মা বেঁচে থাকতে এ বাড়ীতে কারুর কোনো মতামত খাটবে না—ব্যস।

—মজা মন্দ নয়। মা বেঁচে আছেন, অতএব আর কারো বাঁচবার আইন নেই, আশ্চর্য্য!

ঘড়ির জন্য সূক্ষ্ম স্প্রীঙের আবেদন ভুলিয়া চলিয়া যায় অপূর্ব্ব।

কিন্তু হেমলতা যাইবেনই।

নাতবৌ বলিয়া যেটুকু আস্কারা ছিল সুরেখার উপর

সেটুকু শুকাইয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে সুরেখার ঔদ্ধত্যে। হেমলতার সংকল্প ভঙ্গ করিতে—অপমানের তীব্র প্রদাহে স্নিগ্ধ একটু মলম লাগাইতে—পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল সুরেখাকে—জ্ঞানদা আর বাসন্তী, সেজকাকা আর অমূল্যর দিশাহারা বুদ্ধির শেষ উপায় হিসাবে।···নেহাৎ নাতবৌ বলিয়াই যেটুকু আশা, নিজের ছেলের বৌরা এতবড় অপরাধে অপরাধী হইলে এক ঘণ্টাও আটকানো যাইত না হেমলতাকে, সে কথা কে না জানে? কিন্তু উদ্ধত সুরেখা সেটুকু সম্মানও রাখিতে রাজী হয় নাই। আপনার ঘরে রাজাইচালে বসিয়া আছে। বাসন্তী যখন অনুরোধ করিতে গিয়াছিল, দুইহাত জোড় করিয়া বলিয়াছে—আমায় মাপ করবেন পিসিমা!

—ঠাট্ দেখলে সেজবৌ?

—সেজবৌ ঢের দেখেছে, তোমরাই দেখ—বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল অলকা, বাসন্তী অগ্রাহ্যটা গায়ে না মাখিয়া পাকড়াও করে।···সুরেখার সুর নকল করিয়া বলে—"আমায় মাপ করুন পিসিমা—" ঢং কতো! কেন, ওই মাপ চাওয়াটুকু মেজজ্যেঠির কাছে চাইলেই পারতিস! জেদ—জেদ! বাব্বা মেয়েমানুষের এতবড় জেদ! সামান্য একটু মুখের কথা খসালেই যদি এতবড় একটা অঘটন বন্ধ হয়—সেটুকু করবিনা তুই? তোর অহঙ্কারই বড়ো হ'ল?

অলকা অবশ্য শ্বাশুড়ীর অপমানে মর্ম্মাহত হয় নাই, তবু আসামীব্যক্তিটীও তো তার 'প্রাণের পুতুল' নয়, তাই মুচকি হাসি হাসিয়া বলে—অহঙ্কার বজায় থাকবে বলেই অহঙ্কারের সাহস, আমাদের মতো ডোম ডোকলার ঘরের মেয়েতো নয়।

এটা অবশ্য অলকার উল্টা চাপ। বড়মানুষের মেয়ে অলকা নিজেই, শুধু বর ছাড়িয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই এমনভাবে একনাগাড়ে পড়িয়া থাকে। সুরেখা নেহাৎই সাধারণ ঘরের মেয়ে।

—তোমার এক কথা সেজবৌ। বলে কিসের সঙ্গে কি!

সেজবৌ উদাসভাবে বলেন—তা'ছাড়া আর কি বলবো বলো? এই তো এ বাড়ীতে এসে কি হালে আছি তা সবাই দেখছো, আর তোমাদের ভায়ের ওপর কত জোর খাটাচ্ছি তা'ও জানছো। আর এই দেখ কালুকের বৌ এসে এক্ষুনি বরটীকে কাণ ধরে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে।...মনোজকে তো জানি সকলেই, কী মুখচোরা ছেলে—

—আহা মরে যাই—বাসন্তী পিসিমা-জনোচিত সস্নেহ অভিব্যক্তি করে—বাছা বৌয়ের শাসনে কাজটা করে ফেলে যেন মরমে মরে আছে, কোথায় যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—

কথার শেষ না করিয়াই স্থগিত রাখিতে হইল, রঙ্গমঞ্চে অমূল্যর আবির্ভাব। নিজস্ব উত্তেজিত ভঙ্গীতে রুখিয়া উঠিয়া কহিল—এখানে বসে বসে সব আড্ডাবাজী হচ্ছে—ওদিকে মার কি ব্যবস্থা হল দেখা হয়েছে?

উপলক্ষ্যটা বাসন্তী, লক্ষ্যটা অলকা।

ভাদ্রবধুকে 'ঠুকিতে' হইলে একজন শিখণ্ডীর আবশ্যক। নিজের স্ত্রী নীলিমা এতবেশী ভীতু আর ভালোমানুষ যে শাসন করিয়া আশ মেটেনা অমূল্যর। যে মরিয়াই আছে, তাহাকে মারার জন্য তোড়জোড় করাটা যেন বাজেখরচ—ভস্মে ঘী ঢালা।

প্রতিপক্ষ রোখালো হইলে—তবে না মেজাজের ওজন দেখানোর সুখ।

অলকা অবশ্য মাথার ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বসিয়াছে। বাঙালীর ঘরের স্বাভাবিক নিয়মের নমুনা—লজ্জা আর সম্মান দেখাইবার অভ্যস্ত রীতি।

বাসন্তী মুখটা ভার করিয়া বলে—কি করবো বলো মেজদা, রাজকন্যে তো কিছুতেই মাথা হেঁট করবেন না।

—ইয়ার্কি পেয়েছে না কি ?—অমূল্য যেন নাচিয়া ওঠে—যিনি মাথা হেঁট করতে না পারবেন—তিনি অন্য পথ দেখুন, এ বাড়ীতে চলবে না। মার সম্মান রেখে যে চলতে না পারবে তার সম্বন্ধে এই সোজা কথা আমার।

অমূল্য অবশ্য সর্ব্বদাই ভয়ঙ্কর, তবু তার উচ্চারিত কথাগুলা যে একটু বেশী সিরিয়স গোছের দাঁড়াইতেছে—সেটা বোকা নীলিমাও বুঝিতে পারে। তাই আরো বিপজ্জনক গতি লইবার আগেই কাঁদো কাঁদো হইয়া ছুটিয়া যায় তিনতলায় সুরেখার

ঘরে।...অবশ্য তিনতলায় বসিয়া আছে বলিয়া যে তাহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বাক্যসুধা শুনিবার পক্ষে কিছু বাধা ঘটিয়াছে সুরেখার, এমন নয়।...অমূল্যর কণ্ঠস্বরে পৌরুষের অভাব নাই।

তবু শান্ত মুখেই একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল।

নীলিমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে—বৌমা মা আমার, লক্ষীমেয়ে! কেন মিথ্যে ছেলেমানুষী করছো? একটীবার মার কাছে গিয়ে মাপ চাইলেই তো চুকে যায়।...গুরুজন তিনি, পায়ে ধরতে তো লজ্জা নেই মা।

সুরেখা বই মুড়িয়া মৃদু হাসির সঙ্গে বলে—একশো বার নেই মেজখুড়িমা, হাজারবার পায়ে ধরতে পারি, কিন্তু মাপ চাইবো কেন বলুন তো?

কেন, সে কথা নীলিমা যুক্তি দিয়া বুঝাইতে অক্ষম, তবে দোষ যে একটা করিয়া ফেলিয়াছে সুরেখা, সেটা তো ঠিকই? মেয়েমানুষ হইয়া দোষ করিবে, 'ঘাট' মানিবে না, এই বা কেমন কথা?

ব্যাকুলভাবে বলে—দোষ করলেই 'ঘাট' মানতে হয় মা, মেয়ে মানুষের কি অত তক্ক সাজে? চলো—চলো আমার সঙ্গে। চোখকাণ বুজে একবার শুধু বলে ফেলা—'অন্যায় হয়ে গেছে ক্ষমা চাইছি'—এই তো কথার মকদ্দমা!

ভাব দেখিয়া মনে হয় সুরেখার বদলে নীলিমা 'ঘাট' মানিলে যদি কাজ চলিত তবে বাড়ী শুদ্ধ সকলের পায়ে ধরিয়া আর

'ঘাট' মানিয়া বাড়ীর এই ভীষণ আবহাওয়াটা হাল্কা করিয়া বাঁচিত। কিন্তু সেটা তো কাজের কথা নয়, তাই সুরেখার হাত ধরিয়া টানাটানি করে।···রাগ তাহার ধাতে নাই, তবু সুরেখার উপর বিরক্ত না হইয়া পারে না। সত্যই তো, এ কী অসঙ্গত জিদ মেয়ে মানুষের!

সুরেখা হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

—নাঃ মেজখুড়িমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। চলুন যাচ্ছি, কিন্তু সত্যিই বলছি আপনাকে—মেজঠাকুমাকে না যাবার জন্যে অনুরোধ করতে পারি, ক্ষমা চাইতে পারি না।

—চাইলেই বা কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে বলো তো বাছা?

—সে আপনি বুঝতে পারবেন না মেজখুড়িমা, নেহাৎ ভালোমানুষ কি না!—বলিয়া হাসিতে থাকে সুরেখা।

এমন অবস্থায় যে মানুষ হাসিতে পারে কেমন করিয়া সেটা নিতান্তই অবোধ্য বলিয়া নীলিমা হতাশভাবে নামিয়া যায়।··

অতঃপর আসে উমাশশী।

উমাশশীর আবার অন্য জ্বালা।

হেমলতা রায় দিয়াছেন উমাশশী তাঁহার সঙ্গে যাইবে।.... বাইশ বছরের বিধবা মেয়েকে চোখছাড়া করিয়া রাখিয়া যাইবেন এমন বেহুঁস গিন্নী তো নয় হেমলতা। উমাশশীর যখন মা নাই তখন নিন্দা অপবাদ রটিলে গায়ে তো লাগিবে

হেমলতারই।…শুনিয়া পর্য্যন্ত পেটের ভাত চাল হইয়া যাইতেছে উমাশশীর। এতবড় পরিবারের মাঝখানে অনেক কাজ আর অনেক মানুষের আড়ালে 'গোবিন্দ' এবং মেজজ্যেঠিকে তবু বরং মানাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু এ বাড়ী ছাড়িলে?

কেবলমাত্র 'গোবিন্দ' আর মেজজ্যেঠির আওতায় টিঁকিয়া থাকা? মনে করিলেই যে সর্ব্বশরীর হিম হইয়া আসে উমাশশীর।…পিসির পায়ে পায়ে সে বিস্তর ঘুরিয়াছে, জ্ঞানদাও যে উমাশশীর সপক্ষে নয় তা' নয়। মুখ বাঁকাইয়া নেপথ্যে বলিয়াছেন—আহা উনি নইলে আর মেয়ে আগলানো হবে না, বাড়ীতে তো আর লোক নেই, আমরা মরে আছি যে! যেই উনি পেছন ফিরবেন অমনি ঘর ভেঙ্গে পালাবে উমি! তবু যদি চব্বিশ ঘণ্টা "পেঁড়োর মন্দিরে" বসে না থাকতেন। আর কিছু নয়—বিনিমাইনের চাকরাণী চাইতো একটা!

বলিয়াছেন অনেক কিছু, কিন্তু মুখের সামনে স্পষ্ট বলিবার সাহস জ্ঞানদারও নাই। এমনি ভারী রাশ হেমলতার।

কাজেই চাবির কলহীন টিনের সুটকেশটাকে গুছাইয়া নেওয়া ছাড়া উপায় নাই উমাশশীর।…অথচ সুরেখার এতটুকু চেষ্টাতেই সব রদবদল হইতে পারে।…সম্পর্কটা একবার অনুভব করিয়া লইতে চেষ্টা করে উমাশশী…পিসি জ্ঞানদাকে তো দেখে, ভাইপো বৌদের উপর শাসনের মাত্রাটাও দেখিতে পায়, তবে উমাশশীই বা দুইকথা বলিতে পারিবে না কেন মনোজের বৌকে?

পিস্‌শ্বাশুড়ী-জনোচিত মনোভাব লইয়া তিনতলায় উঠিতে থাকে উমাশশী, কিন্তু কি বলিয়া যে কোন কথা আরম্ভ করিবে খুঁজিয়া পায় না।···দরজার বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া লয় মুখটা···টপ্‌ করিয়া বকাবকি করাও তো সহজ ব্যাপার নয়—সুরেখার মতো মেয়েকে! এত গণ্ডগোল আর অঘটন ঘটনার মাঝখানে আসামী হইয়াও যে মেয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে বসিয়া বসিয়া বই পড়িতে পারে তাহাকে দুইকথা শুনাইয়া দিবার সাহস আর যার থাক উমাশশীর নাই।

অগত্যা ফিরিয়া যাইতেছিল···সুরেখা বই রাখিয়া হাসিয়া বলে—ছোটপিসি এসে আবার পালাচ্ছো কেন? এসো—

স্বামীর চাইতে বয়সে ছোট পিসশ্বাশুড়ী, খুড়শ্বশুরদের লইয়া ভারী আমোদ লাগে সুরেখার।

—আসিনি—এমনি ছাতে গিয়েছিলাম তাই—আচার শুকোচ্ছিল ছাতে দেখে নামছিলাম—

অসংলগ্ন একটা কৈফিয়ৎ দিয়া ছাদে উঠার প্রমাণ স্বরূপ মিছামিছি হাঁপাইতে থাকে উমাশশী।

—বাবা! বাবা! রাত্রে তুমি কি স্বপ্ন দেখ ছোটপিসি? আমের আচার? না কুলচুর? এসো এখানে বোসো—হাঁপাচ্ছো।

বলিয়া টেবিল ফ্যানের মুখটা ঘুরাইয়া দেয় সুরেখা।

তিরস্কারের ভাষা আর খুঁজিয়া পায় না উমাশশী, যা বলে

নিতান্তই অনুনয়ের ভাষায়।···সুরেখা এমন অসম্ভব অন্যায় 'গোঁ' ধরিয়া বসিয়া থাকায় কি সুখ অনুভব করিতেছে? সত্যই যদি হেমলতা তাহার উপর বিরক্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন, সে মুখ কি আর দেখাইতে পারিবে সুরেখা?··· ইত্যাদি অনেক কথা গুছাইয়া বলিতে চেষ্টা করে—কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।"

সুরেখা রাগও করে না, তর্কও করেনা, শুধু হাসে আর বলে—আজীবন ভয় করে করে তোমাদের এমন বদভ্যাস হয়ে গেছে ছোটপিসি, ছায়া দেখলেই ভূত ভেবে মূর্চ্ছা যাও।··· সংসার ছাড়া অত সহজ নয়।

সুরেখা তো বলিয়া খালাস সহজ নয়—কিন্তু হেমলতার "গোবিন্দর" সরঞ্জাম যে বাক্সে উঠিল, মিশ্রির বোতল আর ইসবগুলের শিশি আশ্রয় পাইয়াছে সুটকেশে, গোছগাছ তো কম্‌প্লীট।···হেমলতাকে তো চেনে নাই এখনো!

অপারগ উমাশশী রাগ করিয়া উঠিয়া যায়।···হাঁ মনোজকেই কড়াশাসন করা দরকার। অমন মিলিটারী মেজাজের বৌকে যে শায়েস্তা করিতে পারে না সে আবার কিসের পুরুষ মানুষ?—মনে মনে কত লোককে যে কত কি বলিয়া লয় উমাশশী! হেমলতাকেও যা খুসী বলিয়া বসে···মেয়েমানুষের যদি জেদ থাকা ভালো নয় তবে হেমলতারই বা এত জেদ কিসের?···চুল ছাঁটিয়াছেন বলিয়া তো আর পুরুষ বনিয়া যান নাই।—অনেকের জন্য অনেক উত্তর জমানো আছে

উমাশশীর মনে, মনের কথা বাহিরের লোকের কাণে যায়না এই বাঁচোয়া।

তা' উমাশশী নাই বলুক, বৌকে যে কিছুই শাসন করে নাই মনোজ এমন নয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন ফাঁকে চোরের মতো চুপিচুপি আসিয়া ঠাকুরের কাছে ভাত খাইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সুরেখা তখন ঘরে ছিলনা—গুমট ঘরটা নেহাৎ অসহ্য মনে হওয়ায় উঠিয়া গিয়াছে চারতলার ছাদে।...খানিক পরে নামিয়া আসিয়া ঘরে আলো জ্বালাইতেই মনোজ উঠিয়া বসিয়া বিরসস্বরে কহিল—কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

স্বামীর কণ্ঠে এমন সুর শোনা বোধকরি এই প্রথম... হঠাৎ যেন চোখের কোণটা জ্বালা করিয়া ওঠে...কিন্তু সে মুহূর্ত্তই।...গত তিনদিন যাবৎ অনেকের কণ্ঠেই তো নূতন সুরের আমদানী হইয়াছে, মনোজেরই বা না হইবে কেন ?

স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে বলে—কোথায় আর, ছাতে! নির্ব্বাসিতার শেষ আশ্রয় !

—ইচ্ছে করে নির্ব্বাসন নিলে আর কে কি করবে ? দোষ একটা হয়ে গেছে মিটিয়ে ফেললেই চুকে যায়, তা' নয় গোঁয়ার্ত্তুমী করে বসে থাকা ! কোনো যদি মানে আছে !

সুরেখা স্থির স্বরে বলে—মানে যে কার কিসে আছে ! কিন্তু যাক—'মিটিয়ে চুকিয়ে' ফেলার উপায়টা বলে দাও দিকিন ।

—আমি আর নতুন কি বাৎলাবো, শুনলাম তো—বলে বলে সকলের মুখ ব্যথা হয়ে গেছে।

—বেশ তুমিও না হয় একবার ব্যথা করলে।

—হাতী ঘোড়ার কি আছে? মেজঠাকুমা রাগী মানুষ, তাঁর মন রাখতে একবার গিয়ে একটু খোসামোদ করে মাপ চাওয়া—এই তো—এতেই তোমার জাত যাচ্ছে?

সুরেখা আর একটু কঠিন হাসি হাসিয়া বলে—জাত যাওয়ায় আমার ভয় নেই তোমাদের মতো। কিন্তু ক্ষমা চাওয়া মানেই কি অপরাধ স্বীকার করা নয়?

—তা' অপরাধ যখন হয়েই গেছে—

মনোজ কথা শেষ করিবার আগেই উত্তর দিল সুরেখা—ওইখানেই তো তোমাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পাচ্ছিনা। অপরাধের কোন পর্য্যায়ে ফেলা যায় আমার ব্যবহারটা, সে তো ভেবে ভেবে হায়রাণ হয়ে গেলাম। তোমাদের মিত্তির বাড়ীর মান-অপমানের মানদণ্ড এতো সূক্ষ্ম যে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় করে, হিসেব করে ফেললে ভালো হয়। কি জানি পাল্লা নেমে গেল বুঝি বা!···সেদিন মেজকাকার সামনে খবরের কাগজ পড়ে ফেলেছিলাম, শুনলাম সেটা তাঁর পক্ষে অপমান!···'মাথা ধরেছে' বলে মেয়াদের কিছু আগে শুতে এসেছিলাম—শুনলাম সে ও নাকি গুরুজনদের পক্ষে অপমান!···বারোমাস এ মান অপমানের ট্যাক্স জোগানো কি সত্যিই সম্ভব?

—চিরদিনই তো সম্ভব হয়ে আসছে দেখছি।

মনোজ বেশ বিরক্তভাবেই বলে।

সত্যি, সর্ব্বদা এত তর্ক তারও ভালো লাগেনা।...সেও এই বড় সংসারের ছেলে, জানে—কোন রকমে গা বাঁচাইয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে পারিলেই যথেষ্ট। আদর্শের জন্য লড়াই করিবার সখ তার নাই।

সুরেখা বলে—সম্ভব হয়ে এসেছে বলেই তো জের মিটতে চায়না।...পৃথিবীতে যারা দু'দিন আগে এসেছে তারাই যে পৃথিবীর ষোলোআনা উপসত্বের অধিকারী, এ ধারণা আর ঘোচেনা তাদের।...কিন্তু থাক ওসব কথা, তবে দোষ না করে অপরাধ স্বীকার করাবার চেষ্টাটা তুমিও আর কোরোনা লক্ষ্মীটী। ও আমাকে কাটলেও হবেনা।

—তা'হলে মেজঠাকুমা বিদেয় হ'ন সেই তুমি চাও?

ভালোমানুষ মনোজও ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। না উঠিবে কেন? যতই হোক পুরুষমানুষ, বৌয়ের এত অবাধ্যতা সহ্য করা কি সহজ?

—কারুর বিদেয় হওয়াই চাইনা আমি।...সরো, শুই ঘুম পেয়েছে।...বলিয়া কথার যবনিকা টানিতে চায় সুরেখা, কিন্তু মনোজ বলিয়াছে সাংঘাতিক কথা। বলিয়াছে—বিদেয় আমাদেরই হ'তে হবে, বাড়ীর গিন্নী যে আমাদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে বাড়ী ছাড়বেন, সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে

দেখবার ক্ষমতা আমার নেই। মিত্তিরবাড়ীর বাস তোমার উঠলো জেনো।···ঢের ঢের তাঁ্যাদোড় দেখেছি—

সুরেখা কি স্বপ্ন দেখিতেছে?

মনোজ? নেহাৎ ছেলেমানুষ আর বেজায় ভালোমানুষ যে স্বামীটাকে লইয়া তা'র গৌরবের চেয়ে কৌতুক ছিল বেশী, দরকার পড়িলে সেও এত বড় কথা শুনাইয়া দিতে পারে? অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করিতে পারে এমন কঠিন কথা?···

দুইচোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু পড়িতে দিবেনা সুরেখা। জানালা বন্ধ করার ছুতায় পিছন ফিরিয়া বলে —না। আমার মিত্তিরবাড়ীর বাস ওঠাবার ক্ষমতা কারুর নেই। তোমাদের সমস্ত মিত্তিরগোষ্ঠীরও নয়। যে অধিকারের সূত্রে তোমার ঠাকুমার দলের দাবীর আর শেষ নেই, সে অধিকারের একচুলও কম নেই আমার।

পনর

কিন্তু হেমলতাকে যে শেষ পর্য্যন্ত সত্যসত্যই যাইতে হইবে সে কথা বোধকরি তিনি নিজেও ভাবেন নাই। 'গুরুআশ্রমে চলিয়া যাওয়ার' হুমকিটা তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র।··· সংসারশুদ্ধ সকলের এবং অপরাধী যুগলের অনেক সাধ্য-সাধনা, অনেক অশ্রুজল আর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দয়া করিয়া থাকিয়া যাইবেন শেষ অবধি—এমনি একটা সূক্ষ্ম কল্পনা মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া যাওয়ার তোড়জোড়টা চালাইতেছিলেন সাড়ম্বরে।

অথচ শেষ অবধি তেমন আর কি হইল ?

স্থরেখা তো মাথা হেঁট করিলই না, নিজের ছেলেবৌরাই বা বিশেষ আঁকুবাঁকু করিল কই ? অস্ততঃ হেমলতার ওজন অনুযায়ী ! "তুমি গেলে আমাদের দিনচলা ভার হইবে"—এই নিশ্চিত সত্য কথাটুকু মুখ ফুটিয়া বলিবার অপমান স্বীকার করিতে কেহই তবে রাজী নয় ?···অথচ হেমলতা না থাকিলে সংসার যে একেবারে 'বানচাল' হইতে বসিবে সে কি ওরা জানে না ?

তবে ?

অনিরুদ্ধ কোলের ছেলে, মার উপর যার সবথেকে টান হওয়ার কথা, সেই কি না ব্যাকুলতার পরিবর্ত্তে করিয়াছে ব্যঙ্গ !

বলিয়াছে—যাক ভালোই হ'ল যে এতদিনে সুমতি হ'ল তোমার। পঞ্চাশ পার হলেই তো বাণপ্রস্থ নেওয়ার কথা। সে জায়গায় পাঁচসাত বছর তো ওভার-টাইম খাটলে! সেই সঙ্গে অমনি ন'খুড়ী, সেজকাকা, আর পিসিমাকেও নিয়ে যাও না? ঈশ্বর ইচ্ছেয় পঞ্চাশ পার হতে তো বাকী কারুর নেই।

হেমলতা রোষক্ষুব্ধ স্বরে বলিয়াছিলেন—বুড়োবুড়িগুলো বিদেয় হলেই যে খুব সুখ হবে তোমাদের সে আশা কোরোনা বাবা। বৌরা তো "রঙের রাধা", খেতে পাবিনে এর পর।

—আচ্ছা সদলবলে গিয়েই দেখোনা—পাই কিনা। তোমাদের সংসার করার নীতি অনেকটা বৃটিশনীতির মতো অধিকার কায়েম রাখার নীতি। তোমাদের নইলে চলে কি না দেখতেই দাও?

যাক্—অনিরুদ্ধর তো চিরকালই ওই রকম ট্যাক্‌টেঁকে কথা। কিন্তু অমূল্য? মার অপমানের ধূয়া ধরিয়া এতো যে গলাবাজী করিল কিন্তু মাকে তো একবার অনুরোধও করিল না? যে ছুতায় নিমরাজীর ভাবও অন্ততঃ দেখানো যাইত।…অপূর্ব্ব বাবু তো অন্যসময় বড় হইয়াও খোকা কিন্তু এখন আর খোকামী নাই। ঝাড়া জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন "পাগলের পাল্লায় পড়িয়া পাগলামী করিবার সখ তাহার নাই।"

সেজকর্ত্তা সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়া বেড়াইতে-ছেন—আর কি, এবার আমাদেরও পথ দেখতে হ'বে।

যে রকম অবস্থা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এতে আর মান মর্য্যাদা রেখে চলা সম্ভব নয়।···এরপর এ সংসারে থাকলে দাঁড়িয়ে জুতো খেতে হবে···ঘরের লক্ষ্মী অপমানী হয়ে বিদেয় হলে সে সংসারের লক্ষ্মী শ্রী থাকে? মারো ঝাড়ু সংসারের মুখে। —ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক নূতন নূতন জোরালো আর সারালো ভাষার সাহায্যে নিজের ঘৃণা বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কই ঘরের লক্ষ্মীকে তো একবারও অনুনয় বিনয় করেন নাই যে "ওগো তুমি থাকিয়া যাও।" ···জ্ঞানদা জানাইয়াছেন তিনিও কাশী যাইতেছেন ভয় নাই।··· ন'গিন্নী দিবারাত্র আক্ষেপ করিতেছেন—যাইবার মতো কোন চুলাই যখন নাই তাঁহার—যম কেন ভুলিয়া আছে।···একমাত্র বাসন্তী আসিয়াছিল—মৌখিক অনুনয় জানাইতে। কিন্তু 'খোসামুদি রামপেসাদী'কে দেখিলে হাড় জ্বলিয়া যায়, তার কথা শোনে কে?···অলকা ঠাকুরাণীতো কথাই কননা, মদগর্ব্বেই আছেন।

একমাত্র বোকা নীলিমা। সে অবশ্য পায়ে পড়িয়াছে, মাথার দিব্য দিয়াছে, কাঁদিয়া আঁচল ভিজাইয়াছে, কিন্তু নীলিমার কথা ধর্ত্তব্য করিয়া সেই অজুহাতে থাকিয়া যাওয়ার চেয়ে মরণও ভালো নয় কি হেমলতার?···যে নীলিমাকে বাড়ীর ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করেনা—ঝি চাকরে ধমক দেয়!

অতএব মুখ রাখিতে হইলে এযাত্রা যাওয়া ছাড়া উপায় নাই হেমলতার।···শেষ ভরসা অরুণেন্দু, সেই একেবারে

শেষ মাটি করিয়া ছাড়িল।···সোরগোল তুলিতে তুলিতে আসিয়া বলিল—মা ওমা, তুমি বিন্ধ্যাচল বিন্ধ্যাচল করে হাঁপাচ্ছো—তোমার গুরুদেব তো পুরী চল্লেন।

হেমলতা ইদানীং কথাটা খুব কণ্ট্রোল করিয়াছেন—তাই প্রশ্ন না করিয়া চাহিয়া থাকেন।···অরুণেন্দু পকেট হইতে একখানা পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া দেয়—এই দেখ তোমাদের ব্রজদাস বাবাজীর চিঠি—লিখেছেন—'গ্রীষ্মের সময়টা গুরুদেব পুরীধামে থাকা মনস্থ করিয়া গতকল্য রওনা হইয়াছেন।'··· পুরী যাবে?···বলো তো আমি রেখে আসতে পারি।

—তুমি রেখে আসবে?

হেমলতা এতক্ষণে কথা কন—তোমার তো এক মিনিট সময় নেই—অন্যায় জুলুম আমি কাউকে করতে চাইনে বাবা।

—এই দেখো—জুলুমের কথা কে বলছে?—আমার নিজেরই একবার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল—তা'ছাড়া—ইয়ে—একটা পুরনো পেসেণ্ট গেছে চেঞ্জে, চিঠি লিখে লিখে জ্বালিয়ে মারছে—যাতায়াতের খরচাটরচা সব দিতে চায়—যাবোই একবার আমি। তুমি যাও তো চলো।

এরপর বিছানা বাঁধিয়া লওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে? হেমলতা নিজেই যে সংসার ত্যাগের সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছেন—"ভূতের বেগার তো ঢের দিন খাটা গেল, আর কেন?···এখন শেষ দিন ক'টা গুরুগোবিন্দের চরণে পড়ে

থাকি গে···সংসার তো মায়ার নরক—এ নরক থেকে উদ্ধার হতে না পারলে পরকালে কি হবে···ইহকাল তো মিথ্যে গেল···"প্রভৃতি বড় বড় গালভরা কথা কহিয়া রাখিয়া অন্যের অনুরোধ উপরোধের পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—সেকথা আর মনে থাকে না।···মনে হয় বাড়ীশুদ্ধ সকলে ঠেলিয়া বিতাড়িত করিতেছে তাঁহাকে।

"স্মৃতি সৌধ।"

তটিনীর মায়ের নামটাকে অক্ষয় করিবার চেষ্টাতেই বোধকরি বাড়ীর দেয়ালে গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে কবিত্বের ছাঁচে। তটিনী মাঝে মাঝে হাসে আর বলে—'যাই ভাগ্যিস তোমার নামটা 'আন্নাকালী' কিম্বা 'ক্ষেমঙ্করী' নয় মা, বাড়ীর নামকরণ করতে বাবাকে তা'হলে কি মুস্কিলেই পড়তে হত?'

স্মৃতি-সৌধের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বারান্দায় একখানা ডেক-চেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া ভগ্নস্বাস্থ্য স্মৃতি-দেবী কোন স্মৃতির রোমন্থন করেন কে জানে, তাঁর ভালো লাগা না লাগা বোঝা দায়, কিন্তু মীনা আর তটিনী পালাই পালাই করিতেছে।

বিশেষ করিয়া মীনা।

তটিনীর মতো মৌখিক প্রকাশ না থাক মনে মনে অতিষ্ঠ বোধ করিতেছে। নূতন আসিয়া যে সমুদ্রের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে দিশেহারা মীনা শুধু দুই চোখ দিয়া দেখিয়া যেন কুলাইতে পারিত না, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া গ্রাস করিতে চাহিত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিত

অনন্ত কালের চির দুরন্ত শিশুর এই অনলস ক্রীড়া-কৌশল দেখিতে—সে মীনাও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নাঃ সত্যই আর আকর্ষণ নাই।

অহরহ একই লীলা দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি চৈতন্য সবই যেন স্তিমিত হইয়া আসে।

পুরী অপূর্ব্ব !

কিন্তু দুই সপ্তাহের বেশী নয়।

তটিনীর অবশ্য নূতন নয়, আগে সে বারকয়েক আসিয়াছে—সমুদ্রকে চোখে দেখিয়া উপভোগের চাইতে গায়ে মাখিয়া ভোগ করিতেই তার উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সমুদ্রস্নানটাও নেহাৎ একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে, তিন সপ্তাহ পার না হইতেই দুই সখী হাঁপাইয়া উঠিবে ছাড়া আর কি !

চুপচাপ পড়িয়া থাকার জন্য সাগরেরও একটা ডেক-চেয়ার আছে ঘরের ভিতর জানালার গোড়ায়।...তবে নেহাৎ চুপ করিয়া থাকেনা সে—বই আনিয়াছে বিস্তর, সেগুলার সদ্ব্যবহার করে।

প্রথম প্রথম তটিনী বকাবকি করিত—সমুদ্র তীরে এসে বই পড়া ! ছোড়দা, তোর জেল হওয়া উচিৎ।...বই রাখ ছোড়দা, চল গোটাকতক ঢেউ খেয়ে আসি...ছোড়দার 'সী-বাথে' অত ভয় কেন জানিস মীনা ? কালো হয়ে যাবে

বলে।···আমার বাবা ও সব বালাই নেই যতো ইচ্ছে মোটা হবো আর যতো খুসী কালো হবো—কে বাধা দেয় ?···

আজকাল সেই বলে—কি ছাইপাঁশ বই এনেছিস্ ছোড়দা, দে দিকিন দু'খানা, দিন তো কাটছে না বাবা।

আজ সকালে হঠাৎ চায়ের টেবিলে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীরভাবে বলিল—মা আমি আজ কলকাতায় ফিরছি। আমি আর মীনা।

পূর্ব্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত নয়—তাই মীনা অবাক হইয়া তাকায়। স্মৃতি দেবীও। একটু থামিয়া বলেন—আজই যাবে ? কই আগে তো কিছু বলনি ?

—আগে ? আগে কি খেয়াল হয়েছে ? হঠাৎ আজ সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই ভেবে দেখলাম—আমি না হয় আশা ত্যাগ করেছি কিন্তু মীনাকে তো বিয়ে করতে হবে ? দিন দিন যে কাঠকয়লার মতো ঘোরালো রং হয়ে আসছে ওর, ার কি ?

তবু রক্ষে—ঠাট্টা!

মীনা বিব্রতভাবে বলে—আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, নিজের চরকায় তেল দাওগে। এত দুষ্টু বুদ্ধিও খেলে মাথায়।

—থাক্ না বাবা, শাক দিয়ে মাছ ঢেকে আর হবে কি ? সর্ব্বদা উড়ু উড়ু মন, উদাস উদাস চাহনি, ওসব লক্ষণ কি বুঝিনা আমি ?

মীনা হাসিয়া ফেলিয়া বলে—দেখুন মা, আপনার মেয়ে কিছু সমীহ করেনা আপনাকে। যা খুসী তাই বলে আপনার সামনে।

স্বভাবদুর্ব্বল স্মৃতিদেবীর হাসিটাও ম্লান। ম্লান হাসিয়া বলেন—সমীহ করেনা—সেটা তো নতুন নয় মা, করলে কি আর বাড়ী ছেড়ে থাকতে সাহস করতো—না খেটে খেতে সাহস করতো?

—এই হ'ল! এ দুঃখু আর আজ পর্য্যন্ত ধাতস্থ হ'ল না মার···এই ছোড়দা কাগজখানা আর ক'ঘণ্টা পড়বি? দে—কাগজের আড়ালে মুখভঙ্গী গোপন করবার দরকার নেই, কেউ তোর মুখের দিকে তাকাচ্ছে না।

—এই ফাজিলটাকে শাসন করা বিশেষ দরকার হয়েছে।

বলিয়া সাগর কাগজখানা ভাঁজ করিতে থাকে।

—ওই তো—ওই জন্যেই। মার তো দুঃখের অবধি নেই, কিন্তু আমার দিকটা ভেবে দেখেছ? মাথার ওপর তিন দাদা শাসনদণ্ড নিয়ে বসে, তার ওপর আবার তাঁদের শাসনকর্ত্রীরা! উঃ। বাড়ী ছেড়েছি সাধে?

সাগর স্বল্পভাষী বটে, তবে 'হাঁড়িমুখ' নয়। কথা যা কয় হাসিয়াই কয়। তটিনীর কথার উত্তরে মুচকি হাসিয়া বলে—একজনের অন্ততঃ শাসনকর্ত্রী নেই।

—নেই—হতে কতক্ষণ?

বলিয়া অকারণেই একবার আড়চোখে মীনার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার ভালো মানুষের মতো বলে—যাই হোক, মীনা আর কিছুতেই থাকতে রাজী নয়। আজই আমরা যাচ্ছি ছোড়দা, ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসবি তো? অবিশ্যি উঠতে আমরা নিজেরাই খুব পারি, তবে আর কি—তোর দিক থেকেও তো একটা ভদ্রতা আছে? হাজার হোক মীনা তোদের অতিথি—

মীনা অবশ্য যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তবু এভাবে আক্রমিত হইতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে, কিন্তু বলেই বা কে? যা বলিতে চেষ্টা করিবে তটিনী সেইটা ধরিয়াই ঠাট্টার চোটে নাকাল করিয়া ছাড়িবে তো?

কিন্তু সাগরের মুখ অমন ম্লান দেখায় কেন?

না কি মীনার মনের ভ্রম?

মীনার উপস্থিতি অনুপস্থিতিতে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না কি?

ঘরে আসিয়া মীনা সকৌতূহল প্রশ্ন করিল—সত্যিই যাবি নাকি বিনা নোটিশে হঠাৎ?

—যাবো মানে? কী দায় পড়েছে? ওতো শুধু একজনকে ঘাবড়ে দিয়ে প্রাতঃকালে একটু নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করা।

—কোন কথায় যদি মানে থাকে।—মীনা বকিয়া ওঠে—কাজলামী করতে করতে উচ্ছন্ন গেছিস। কে বা ঘাবড়াচ্ছে—কিসের বা আনন্দ কিছু যদি বোঝা যায়।

—নাঃ কিছু কি আর বোঝো ? ইনোসেন্ট গার্ল ! বলি আমি তো আর একলা যাবো বলিনি ? বলেছি সবান্ধবী দেশত্যাগী হচ্ছি। শুনে—আমার পূজনীয় ছোড়দা মশায়ের মুখে যে মেঘ ঘনিয়ে এলো সেটা বুঝি সরলা বালিকার চোখেই পড়েনি ?

মীনা হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া বলে—নাঃ তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। আচ্ছা এতো বাজে কথা বলে কি সুখ পাস ?

—বাজে মানে ?—তটিনী দুই চোখ বড় করিয়া বলে—কেন আমার ছোড়দা কি ফেল্না ছেলে ? আপনার মতে মহামহিমান্বিতার প্রেমের অযোগ্য ?

এবার মীনা যথার্থই গম্ভীর হয়। ধীরভাবে বলে—দেখ তনু, ঠাট্টারও একটা সীমা থাকা ভালো। আমি যে কতো তুচ্ছ সে কথা তোমার অজানা নয়, দয়া করে বন্ধু বলে স্বীকার করো তাই, কিন্তু এরকম ঠাট্টা-তামাসায় সত্যি দুঃখ হয়, লজ্জা হয়।

কিন্তু তটিনীকে দমানো সহজ নয়, মীনার গাম্ভীর্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া মুচকি হাসির সঙ্গে বলে—ও বাবা এ যে ব্যাপার সিরিয়াস মনে হচ্ছে, তাহ'লে তো শুধু একপক্ষ নয় ? 'আমি বলি শুধুই ও পক্ষে "চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর—"

—রাবিশ।

বলিয়া মীনা উঠিয়া আসিয়া স্মৃতিদেবীর কাছাকাছি আশ্রয় লয়। উপলক্ষ্য হিসাবে খবরের কাগজখানা চোখের সামনে মেলিয়া ধরে বটে, কিন্তু সংবাদপত্রের কোন সংবাদই ঠিক বোধগম্য হয় না, কতকগুলা অর্থহীন বাক্য যেন মস্তিষ্কের দরজায় ভীড় করিতে থাকে।...তটিনী এত উচ্ছ্বাসের প্রেরণা কোথায় পায়? সবটাই কি ওর নিজের সৃষ্ট লোক দেখানো স্ফূর্ত্তি? এত সহজে এত অসম্ভব কথা উচ্চারণ করিয়া বসে, শুনিলে বুক টিপটিপ করে যেন।...আচ্ছা সত্যই কি কোন ছায়া পড়িয়াছিল সাগরের প্রসন্ন মুখে? সম্ভব তো নয়—ও তটিনীর স্রেফ্ ইয়ার্কি, নির্জ্জলা ফাজলামী। ...সাগরকে তো আর ভূতে ধরে নাই যে মীনার কলিকাতা যাওয়ার খবরে মুখে মেঘ নামিবে?...তবে হ্যাঁ তটিনীর জন্যও হইতে পারে।...রুগ্না মার ষোলোআনা দায়ীত্বই তো সে বেচারার ঘাড়ে পড়িবে তা'হইলে।...তা'ছাড়া পিঠোপিঠি ছোটবোন—মন কেমন করা তো অসম্ভব নয়।...আর কি —কিছুই নয়।...

কি হওয়া সম্ভব? এই যে—এতদিন একবাড়ীতে আছে, ক'টা কথাই বা হইয়াছে মীনার সঙ্গে?...স্বভাবটা মিষ্ট, ব্যবহার ভদ্র, কাজেই সৌজন্যের ত্রুটি দেখায় নাই হয়তো, এর বেশী আর কিছুই নয়।...বাবা এত ভয়ও দেখাইতে পারে তটিনী।...তটিনী আর সাগর, দু'টী ভাইবোনের নাম দু'টী কিন্তু চমৎকার।...

সঙ্গে সঙ্গে কেন কে জানে অরুণেন্দুর নামটা মনে পড়িয়া যায়।…মুখখানাও। উজ্জ্বলশ্যাম পুরন্ত ভরাট মুখ, কালো সেলের বেষ্টনীবদ্ধ পুরু লেন্সের নীচে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি…কথা কহিবার সময় যেন আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিতে চায় তোমাকে।…সাগরের চোখে চশমার অবগুণ্ঠন নাই, তাই বুঝি এত লাজুক চাহনি!…কিন্তু খামোকা—এত লোক থাকিতে পৃথিবীতে—অরুণেন্দুর সঙ্গে সাগরের তুলনা করিবার কি আছে?…কিছুই নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেও ঘুরিয়া ফিরিয়া ওই দু'খানি মুখই পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিতে থাকে।…তুলনা করিতে চাহিলে—সৌন্দর্য্যের মাপ কাঠিতে সাগরের জিত নিঃসন্দেহ, পুরুষমানুষের পক্ষে এত নিখুঁৎ সুকুমার মুখ, এত উজ্জ্বল রং, যেন বাড়তি বাজে খরচ—বিধাতা পুরুষের অপব্যয়ের নমুনা! সুন্দর! কিন্তু বড় বেশী ঠাণ্ডা নয় কি?…দূর ছাই ঠাণ্ডাই হোক আর টগ্‌বগে ফুটন্তই হোক মীনার কি?…

কিছু নয় বলিয়াও 'কিছু' যেন অবশিষ্ট রহিয়া যায়।

বাজেকথা বলা এই জন্যই খারাপ। সামান্য একটা বাজে ঠাট্টা করিয়া এমন বিশ্রী ধোঁকা লাগাইয়া দিল তটিনী!

সত্তর

বিকলের দিকে বেড়াইবার সাজসজ্জায় সজ্জিত তটিনী তাড়াতাড়ি চুলের উপর চিরুণীর শেষ টান দিতে দিতে পাশের ঘর হইতে চীৎকার করিয়া ওঠে—ছোড়দা, এই ছোড়দা, আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবি ?

'ছোড়দা' ওঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া বলে—যেতে পারি, যদি অভিভাবক হিসেবে স্বীকার করিস।

—দায় পড়েছে, তুই যাবি নিজের গরজে—কৃতজ্ঞ হয়ে।

—কৃতজ্ঞ ?

—না তো কি ? আমার অফারের জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎই তো। নে যাবি তো চল।

—বেশ তো যাচ্ছো দু'জনে, আমাকে আর টানা কেন ?

—ইস! টানা কেন! স্রেফ জীবে দয়া হিসেবেই টানা। তবে বেশী টান সইবে না বুঝলি ? আমার মেজাজ চড়া—

—সে খবর জানতে বাকী নেই—বলিয়া হাসিয়া ফেলে সাগর।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যায়ও।

পুরীর সমুদ্রতীরের বর্ণনাটা বাহুল্য। এত বেশী লোক এত বেশী বার বলিয়া রাখিয়াছেন যে বলিবার মত বাকি আর কিছুই নাই। নাম না জানা ভালো ভালো ফ্যাসনেবল্ দেশে যদি বেড়াইতে আসিত তটিনীরা, তবে না হয় বর্ণনার কিছু থাকিত।...

কিন্তু বিদেশে একখানা বাড়ী খাড়া করিয়া রাখার অসুবিধাই এই, নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়ার উপায় নাই। বছর বছর যাঁদের হাওয়া না খাইলে চলে না, সেই সব বড়মানুষের দল ছুটি পাইলেই তল্পী তল্পা বহিয়া চলিলেন...পুরী আর মধুপুর, দেওঘর আর গিরিডি, ঝাঁঝাঁ আর রাঁচী।...একটা দেশ হইতে আর একটা দেশে বেড়াইতে যাওয়ার আনন্দ, ভ্রমণের আনন্দ, সে আর ভাগ্যে জোটে কই? "বাড়ীখানা সারাবছর ভোগ হয়না"..."মালীটাকে নাহক মাইনে গোণা" ...অতএব চলো।...এক বাড়ী হইতে আর একটা বাড়ী— এই মাত্র। জানালা দরজা ঘর দালান সব মুখস্থ, পথের বাঁকে বাঁকে নাই অজানা রহস্যের আকর্ষণ, প্রতিবেশীর বাড়ীগুলার পরিচিত ভঙ্গী চক্ষুর পীড়াদায়ক, আকাশটা একঘেয়ে।

অথচ বছর বছর তল্পী বাঁধিবার ঝামেলা আছে, খরচ আছে, সুবিধা অসুবিধাও আছে।...তবু যাক্ বাড়ীটাও তো ভোগ হইল? এত অর্থব্যয় করিয়া করা!

গতানুগতিক প্রথায়—সংসার হইতে সরিয়া দু'দণ্ড হাঁপ ফেলিবার প্রয়োজন হইলেই পুরীতে আসিয়া আড্ডা গাড়েন স্মৃতি দেবী।

দলে দলে আর ভাগে ভাগে, যুগলে যুগলে আর একলা একলা বসিয়া আছে লোকে।...অতবড় সমুদ্রতীরে পা বাড়াইবার ঠাঁই খুঁজিয়া মেলা দুষ্কর। এর মাঝখানে—এই হাটের হট্টগোলের ভিতর হঠাৎ পরিচিত ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিয়া বসা কিন্তু কম মজা নয়। কলিকাতার রাস্তায় দৈবাৎ মুখোমুখি হইয়া গেলে দু'চার কথা কহিতে অযথা সময় নষ্টর ভয়ে যাহাকে দেখিয়াও না দেখার ভান করিয়া কাটিয়া পড়া যায়, বিদেশে আসিয়া তাহাকেই পরমাত্মীয় মনে হয়। আবিষ্কারটা যেন রীতিমত সম্পদ।

তা' নয়তো মীনাকে দেখিয়া অত উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করিবার হেতুটা কি ছিল অরুণেন্দুর ?...মীনার দিকটাও ওজনে একেবারে তুচ্ছ নয়, তবে অপ্রত্যাশিত বিস্ময় বলিয়া একটা কথা। হাত তিনেক তফাতে যে তটিনী আর সাগর দাঁড়াইয়া সে খেয়ালটা তখনকার মতো বিস্মৃত হওয়া নেহাৎ আশ্চর্য্য হয় নাই তাহার পক্ষে।

•

অরুণেন্দুর অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মীনা যখন প্রায় কাহিল হইয়া উঠিয়াছে—খানিকটা তফাতে সাগর

যেখানে রুমালটা পাতিয়া সমুদ্রমুখী হইয়া বসিয়া, তটিনী আসিয়া বলে—ছোড়্দা তোর অন্ন মারা গেল। নো ভরসা নো আশা।

চকিত সাগর অবাক হইয়া বলে—কিসের আশা ভরসা ?

—সে আর ছোটবোন হয়ে—দাদা তুই—কি আর বলি তোকে ? নেহাৎ যদি বোকা না হোস বুঝতে আটকাবেনা।··· তাই বলি—মীনা মুখপুড়ির এমন ভাবভঙ্গী কেন ! উড়ু উড়ু মন, বোকা বোকা চাউনি, খিদে কম তেষ্টা বেশী, ভেতরে ভেতরে এত !

তিরস্কারের ভেজাল মিশানো সস্নেহ অনুযোগের সুরে সাগর বলে—তোর এই অসভ্য অভ্যাসটা ছাড়বি তনু ? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইলেই তুই রহস্য আবিষ্কার করতে বসবি ? তার থেকে নিজে একটা বিয়ে কর দিকি, অভ্যাসটা ভালো হবে।

—আমার অভ্যাস ? ম'লেও যাবেনা। আর যাবেই বা কেন ? গণনায় ভুল হয়েছে কবে, তার একটা উদাহরণ দাও। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে রে দাদা।

সাগর মৃদু হাসিয়া সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরায়

অর্থাৎ এ প্রসঙ্গটা পরিবর্ত্তন হোক।

সাময়িক বিস্ময়টা কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মীনা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তটিনীকে তো চেনে সে, পরিহাসের

যে মাত্রাজ্ঞান নাই তাহার। হয়তো বা সাগরের সামনেই কি না কি বলিয়া বসিবে! সব পারে ও।...অরুণেন্দুর কথাবার্তায় কি একটু চাপল্য ছিল?...মীনার মুখে চোখে কি খুসীর ভাব ধরা পড়িয়াছিল?...কিন্তু মিথ্যাও তো নয়, অরুণেন্দুকে দেখিয়া বাস্তবিকই ভারী খুসী খুসী লাগিতেছে।...অথচ কেনই বা?

নিজের কাছেই নিজে উত্তর দিতে পারে না মীনা।

আঠার

চক্রতীর্থে হেমলতার গুরুআশ্রম।

গুরুসঙ্গ সৌভাগ্যলাভ হইলেও শ্রীক্ষেত্রের ক্ষেত্রাধিপতি স্বয়ং জগন্নাথ পড়িয়াছেন দূরে। যানবাহনের তো অপ্রাচুর্য্য আছেই, তা' ছাড়া অভাব সঙ্গীর। হেমলতাকে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া অরুণেন্দু দু'টা দিন এদিকে হোটেলে কাটাইয়াছে। আজ কলিকাতায় ফিরিবার কথা, তাই মার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছিল।...হেমলতা ধরিয়া বসিলেন—আমাকে আর একবার দর্শন করিয়ে আনো।

অরুণেন্দু বিব্রত হইয়া বলে—কী মুস্কিল, আমার যে আর সময় নেই, এই তো একেবারে খাসতালুকে রেখে যাচ্ছি, যতো ইচ্ছে দর্শন করোনা বসে বসে?...রথের আগে তো আর নড়ছো না?

হেমলতা উদাস স্বরে বলেন—রথের আগে না, পরেও না, সংসারে আর ফিরে যেতে বোলোনা তোমরা আমায়।

—তা' ভালো। যাক আমাদেরও মন্দ নয়, একটা তবু শান্তির জায়গা থাকলো। আমরাও যখন সংসার-বিতৃষ্ণ হয়ে উঠবো—এখানে এসে ঠেলে উঠবো, কি বলো?

হেমলতা অরুণেন্দুর হাসিতে যোগ দেন না, তেমনি উদাস গম্ভীরস্বরে বলেন—বাজে কথা থাক বাবা, তুমি মন্দিরে নিয়ে যেতে পারবে না তা' হলে ?

—পারবো না—একেবারে বলা চলেনা—তবে বেশী দেরী করবে না তো ? চলো চট্ করে একবার ঘুরিয়ে এনে দিই।

এরূপ আগ্রহহীন দায়সারা প্রস্তাবটা হেমলতার পক্ষে অন্যসময় হইলে খুবই অপমানকর, কিন্তু সম্প্রতি গোটা দুইটী দিন আশ্রমে বাস করিয়া—"গুরু আশ্রমে পড়িয়া থাকার" গৌরবময় অবস্থা সম্বন্ধেও ধারণার কিঞ্চিত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে যেন।···

এর আগে বিন্ধ্যাচলে বার দুইতিন গিয়াছেন বটে—সে নিতান্তই বেড়াইতে যাওয়া—উৎসব উপলক্ষে।

অর্থব্যয় করিয়াছেন প্রচুর—আদর পাইয়াছেন পর্য্যাপ্ত, "হাঁড়ির খবর" পাইবার সুযোগ হয় নাই।···এখানে নেহাৎই হোটেল বাড়ীর মতো—"ফেলো কড়ি মাখো তেলে"র ব্যাপারটা বড় বেশী দৃষ্টিকটু লাগে।

সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক গুরুভগিনীত্রয়।

সংসারের মায়া কাটাইয়া আসিয়া ইঁহারা আশ্রমে মৌরসী-পাট্টা লইয়া কায়েম হইয়া আছেন, আর আশ্রমটীকেই রীতিমত সংসার করিয়া তুলিয়াছেন। প্রসাদপ্রার্থী ভক্ত-শিষ্যের মধ্যে কেউ পাতে একটু লবণ ফেলিলে বা একটা কাঁচালঙ্কা বেশী খাইলে ইঁহারা রসাতল করিতে থাকেন।···

"গোবিন্দের ভাঁড়ারে"র উপর মমতাটা যত তীব্র, গোবিন্দের উপর তার সিকি হইলেও বোধ করি তিনি বৈকুণ্ঠে বসিয়া অহরহ বিষম খাইতেন !···

তার উপর আবার গুরুদেবের উপর অধিকারবোধের দাবী। গুরুদেব যেন তাঁদের খাসতালুক।

দু'দণ্ড কাছে গিয়া বসিলে তিনজন তিনদিক হইতে 'হাঁ হাঁ' করিয়া ছুটিয়া আসিবেন—"বাবাকে এবার বিশ্রাম করতে দিতে হবে যে হেমলতাদিদি"···"বাবা আমার আত্মভোলা আপনা থেকে তো বলবেন না কিছু"···"আপনি বরং ততক্ষণ কালকের ভোগের চাল ক'টা বেছে রাখুন গে দিদি···"

চিরদিনের অব্যাহত প্রভুত্ব, পদে পদে ব্যাহত হইতেছে।

হয়তো—অরুণেন্দু তেমন জোর করিলে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেন, কিন্তু অরুণেন্দু সে দিক দিয়াও গেলনা। শুধু কর্ত্তব্য সারিতে একবার মন্দিরে যাইতে রাজী হইল।

এতদিন কোন শূন্যলোকে সিংহাসন পাতিয়াছিলেন হেমলতা ?

দশবছর আগে এমন ব্যাপারটা ঘটিলে ?···ঘটিলে যে—ছেলেরা পায়ে মাথা খুঁড়িয়া ফিরাইত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ তিলার্দ্ধ নাই।···এখন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই কি প্রয়োজন মিটিয়া গেল ?···অভ্যস্ত নিয়মে কর্ত্রীত্বটা মানিয়া চলিত এইমাত্র ?

সরিয়া গেলে আটকাইবেনা—সেটা ওদের কাছে—বেটাছেলের কাছেও ধরা পড়িয়াছে ?…কিন্তু কিছুই কি আটকাইবে না ?…এতদিনের পর হঠাৎ আজ দুইবিন্দু অশ্রু দেখা দেয় চোখে।

জগন্নাথ দর্শন সারিয়া ফিরিবার পথে—আবার অপ্রত্যাশিত দেখা মীনাদের সঙ্গে।…অরুণেন্দু দেখে নাই প্রথমটা—কাণে গেল একটী অপরিচিতার কণ্ঠ—"এই মীনা, দেখ্ তোর বন্ধুও পুণ্য সঞ্চয় করতে এসেছেন।"

—এই চুপ, অসভ্য!…সঙ্গে বোধহয় মা।…মীনার চাপা গলার উত্তরটাও কাণ এড়াইল না।

—ও! 'সরি'। মা সঙ্গে থাকলে জমবেনা, না ?

—আয় তোকে খুন করি রাক্ষুসী।…

'দেখা করি কি না করি'র দ্বন্দ্বে পূর্ব্বোক্তটাই জয়ী হয়।

অরুণেন্দু ঘাড় ফিরাইয়া সহাস্যমুখে বলে—সর্ব্বনাশ! আপনারাও এ পথে আসেন ?

—আসিনি কোনোদিন—লজ্জিত স্মিতহাস্যে মীনা উত্তর করে—এতদিন রইলাম—একবার জগন্নাথ দর্শন না করে ফিরলে শেষে নরকে যাবো! তাই—

—জগন্নাথের অসীম ভাগ্য। কিন্তু ফিরছেন না কি ? কবে ?

—অবশ্যি ঠিক নেই এখনো। তবে ফিরতে তো হবে—স্কুল খুলে এলো।

—ওঃ আপনারা যে আবার স্কুলের ছাত্রী।···আচ্ছা নমস্কার! আমি আজই ফিরছি।···

ছত্রিশকোটি দেব-দেবীর পাল্লা এড়াইয়া ততক্ষণে হেমলতা কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন।··· এইমাত্র জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই যে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা হারাইয়াছেন এমন তো নয়!···এবং সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছেন বলিয়া যে 'বান্ধবীর' সঙ্গে রসালাপ সহ্য করিবেন এতটা আশা করাও ঠিক নয়।

এই একটা জায়গায় মাকে ভয় করা ছাড়া উপায় নাই।

গাড়ীতে উঠিয়া কথাটা একবার পাড়েন হেমলতা—মেয়েটা আমাদের সুরেশবাবুর সেই মাষ্টারণী ভাড়াটে বলে মনে হ'ল না?

—কার কথা বলছো?···ও হ্যাঁ সেই বটে।

অরুণেন্দু যেন এইমাত্র অবহিত হয়।

—ও আবার কবে এলো?

—কি করে জানবো? এই তো দেখলাম।

গতদিনের কথাটা যে কেন চাপিয়া গেল নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারেনা অরুণেন্দু।

আরো দুই একটা প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও চুপ হইয়া যান হেমলতা।···খরচ খরচার দায়টা যে সমস্তই অরুণেন্দুর ঘাড়ে। বেশী খোঁচানো ঠিক হইবে কি?

উনিশ

হিসাব মিলানোটা মীনার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

অথচ সাগরের কথায়, ব্যবহারে, স্বভাবনম্র দৃষ্টির অসতর্ক াহনিতে কিসের যেন আভাস। স্বাভাবিক ভদ্রতা বা সৌজন্য ছাড়াও আর কিছু। কিন্তু সাগর তাহার প্রেমে াড়িবে—একি একটা বিশ্বাস করিবার মতো কথা?…কিসে ার কিসে!

ঘুঁটেকুড়ুনী আর রাজপুত্রের গল্পটা রূপকথায় হয়তো ানায় ভালো, কিন্তু বাস্তবজীবনে তো সম্ভবপর নয়।…নাঃ ালানো দরকার। যদি সত্যিই হয়—এতবড় অভাবনীয় সৌভাগ্য সহ্য করিবার ক্ষমতা মীনার নাই।…একটা অজানা আশঙ্কায় অহেতুক ভয়ে সারাক্ষণ যেন গা ছমছম করিতে থাকে তা'র।

প্রাপ্যের অতিরিক্ত পাওনার দায় বড় সোজা নয়।

মুস্কিল এই—অরুণেন্দুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হইতে তটিনী যেন কেমন একটু গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।…তার পরিহাসের ধরণটা উগ্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু পরিহাসের সহজ পথে যে বস্তুটা হাল্কা হইতে পারিত সেটাই যেন ভার হইয়া বুকে চাপিয়া বসিতেছে।

অগত্যা নিজেই সে একদিন যাইবার কথা পাড়ে।

তটিনীর কাছেও নয়, সাগরের কাছেও নয়, স্মৃতিদেবীর কাছে।

এটা ওটা নানাকথার মাঝখানে বলে—আপনার কাছে কিছুদিন কাটিয়ে মাতৃস্নেহের আস্বাদটা পেয়ে গেলাম মা। গিয়ে খুব মন খারাপ লাগবে। কিন্তু এবার তো যেতে হয়—

দুর্ব্বল একখানি হাত বাড়াইয়া মীনার হাতের উপর রাখিয়া স্মৃতিদেবী ক্লান্তস্বরে বলেন—তোমাদের তো আবার স্কুল খুলে এলো না ?…মেয়েটা তবু দু'দিন কাছে ছিল—ছুটি কি একেবারে ফুরিয়ে গেছে ?

—না—এখনো দিন দশেক আছে। তন্নু অবশ্য থাকতে পারে এ ক'টা দিন, আমি তো ঠিক করছিলাম কাল পশু'ই রওনা হই।…একটা টিউশনি ছিল—স্কুল খুলবার আগে একবার দেখাশোনা করবো মেয়েটাকে—

সত্যকথা বলিতে কি, টিউশনির কথাটা খুব খাঁটি নয়। একটা জোগাড় করিয়াছে বটে—গ্রীষ্মের বন্ধের পরে আরম্ভ করার কথা।

স্মৃতিদেবী মিনিট দুই নীরব থাকিয়া হঠাৎ বলেন—স্কুলের কাজটা তুমি ছেড়েই দাওনা—

—ছেড়ে দেব ?

মীনা অবাক হইয়া তাকায়।…স্মৃতিদেবীর হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্য আছে সেটা জানা, কিন্তু মস্তিষ্ক যন্ত্রের বৈকল্যের কথা তো জানা ছিল না।

স্মৃতিদেবী ওর বিপন্ন ভাব দেখিয়া মৃদু হাসেন, সস্নেহে বলেন—দিলেই বা ছেড়ে—আমার কাছেই থাকোনা তুমি? নিজের মেয়েতো আমার অবাধ্য, দেখছো তো কাছে থাকতে চায়না, তুমি তো ইচ্ছে করলেই আমার কাছে থাকতে পারো মীনা।

—আপনার কাছে? মানে—বরাবর?

বিমূঢ় মীনা আর কোনো কথা খুঁজিয়া পায় না।

স্মৃতিদেবী এবার বেশ সহজভাবেই হাসিয়া ওঠেন—বরাবরই তো। আমার ছোট বৌমা হয়ে।

মুহূর্ত্তের জন্য আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া ওঠে মীনার।

আক্রমণটা যে এত দুর্ভেদ্য দুর্গ হইতে আসিয়া পড়িবে এটা তো কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই।···কিন্তু একি সত্য? না সম্ভব? শেষে কি এইটাই বিশ্বাস করিতে হইবে মীনাকে, ছাব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত নিতান্ত অবহেলিত, নেহাৎ সাধারণের দলে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে সহসা এতবেশী মূল্যবান হইয়া পড়িয়াছে সে?···তটিনীর পরিহাসের মাথা-মুণ্ড না থাকিতে পারে, সাগরের বিশেষ ব্যবহারের অর্থটা কল্পিত, অমূলক, মীনার মনের ভ্রম মাত্র হইতে পারে, কিন্তু স্মৃতিদেবীর স্পষ্ট প্রস্তাবের মধ্যে আর যাই থাক, ভুল বোঝার অবকাশ নাই।

কিন্তু কি উত্তর দিবে সে?

অকিঞ্চিতকর সম্বল লইয়া যেমন মূল্যবান বস্তুর দিকে ঘেঁসিতে ভয় করে, তেমনি ভয় করিতে থাকে মীনার স্মৃতি-দেবীর প্রস্তাবে।...উত্তর দিতে পারে না।

স্মৃতিদেবী বোধহয় আশা করিয়াছিলেন অন্য রকম। এত দ্বিধাকুণ্ঠিত মুখ দেখিতে হইবে মীনার, সেটা অন্ততঃ ধারণা ছিলনা।...তবে কি তটিনী ভুল বুঝিয়াছে? না কেবলমাত্র তাঁহার সেন্টিমেণ্টাল ছেলেটাই?...একথা সত্য, তাঁহার বড় মেজ দুই বধূ রূপ এবং সম্পদ যতটা আনিয়াছে তার এককড়াও যদি গুণ আনিত তো সংসারের চেহারা আলাদা হইত!...

তারই প্রতিক্রিয়ায়—তাঁর এই চাপাস্বভাব ছোট ছেলেটার যে রূপসী এবং ধনীদুহিতার প্রতি একটা সহজাত বিতৃষ্ণা আছে—সে সংবাদ স্মৃতিদেবীর অজানা নয়।...কিন্তু একপক্ষে বিরাগ আছে বলিয়াই যে—অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মের মতো—অপর পক্ষে অনুরাগের সঞ্চার হইবে—এটা নেহাৎ কবি-কল্পনা নয় কি?...

রূপের ঘাটতি আর অর্থস্বাচ্ছল্যের অভাবটা হয়তো—বধূ নির্ব্বাচন হিসাবে গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত স্মৃতি-দেবীর বর্ত্তমান মনের অবস্থায়, কিন্তু তাঁর ছেলের পক্ষে প্রেমে পড়িবার জন্য সেইটাই কিছু আর প্রধান আকর্ষণ হওয়া সম্ভব নয়!...

কিন্তু অসম্ভব ঘটনাও বিরল নয়, এই হিসাবেই তিনি তাঁর লাজুক ছেলেটার ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু মীনার মুখে

নবপ্রণয়ের ছাপ কই ? কোথায় সেই মধুর ব্রীড়া ?··· মীনার ভীত সন্ত্রস্ত ভাব স্মৃতিদেবীকে পীড়া দিল।

তবু তিনি আর একবার কোমলভাবেই বলেন—আমার কাছে লজ্জার কিছু নেই মা, তোমার অনিচ্ছের ওপর জোর করতে চাইনে আমি—

অনিচ্ছা! মীনার ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন ওঠাও সম্ভব না কি ?

তুইহাতে মুখ ঢাকিয়া মীনা প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলে—আমার ভয় করে মা, আমি কি আপনাদের যোগ্য ?

—অযোগ্য হ'লে বলবো কেন ?···স্মৃতিদেবী প্রসন্ন হাসি হাসেন···তোমায় ধরে রাখায় যে ষোলোআনা স্বার্থ আমার গো, ছেলে মেয়ে তু'টোর পায়েই ছেকল পরাবো।···এরপর তোমার বন্ধু ঘর ছেড়ে পালায় কেমন দেখবো।

কুড়ি

—তনু আমায় মাপ কর।

মীনার আবেদন শেষ না হইতেই তটিনী ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক তাকায়—স্কেলটা কোথায় গেল? আঃ সময়ে যদি কিছু পাওয়া যাবে।

—স্কেল?

হতবুদ্ধি মীনার প্রশ্নের উত্তরে তটিনী সহজ ভাবে বলে—হ্যাঁ স্কেল, নইলে মাপ করবো কি দিয়ে? তবে আমার তো আন্দাজ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি—উঁহু আড়াই ইঞ্চির বেশী হবিনা।

—বাবা এত ও জানিস। উঃ।

—ধাতস্থ করে রাখো বুঝলে? ননদিনী রায়বাঘিনী—জানো তো?

—জানি বলেই তো ভয়। আচ্ছা কি মেয়ে তুই বল্‌তো—বড় দাদাদের উপর প্রতিহিংসার প্রতিশোধ নিতে ছোড়দার উপর এই শাস্তি চাপাতে বসেছিস? তোর অমন সোনার চাঁদ ভাইয়ের জন্যে শেষে এই একটা বুড়ি আইবুড়ি মাষ্টারণী পছন্দ করতে মায়া হচ্ছে না?

—'বুড়ি আইবুড়ি মাষ্টারণী' তা'হলে খারাপ? আমারও তবে ভালো বর জোটার কোনো আশা নেই? নেহাৎই যদি জোটে তো একটা লোহার চাঁদ?

—তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বাবা! রূপটাও তো দেখতে হবে? তুই আমার মতো কালো না শুঁট্‌কি?

সত্যই তটিনীর সঙ্গে কথায় জেতা অসম্ভব।

মীনার কথার উত্তর আর দেয় না সে—গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া ওঠে—"রূপের কথা বোলো না সই কালো রূপে মজে আছি, যেমন তেমন নয় সে কালো—শাওন মেঘের কাছাকাছি।"

প্রতিরোধের শক্তি মীনার নাই।

কিন্তু ভাঙাঘরে রাজঐশ্বর্য্য বরণ করিয়া লইতেও তো শক্তির প্রয়োজন? মীনার মত এত সাধারণ মেয়ের তা' থাকে না। তাই আশা আনন্দ উল্লাস সব ছাপাইয়া আতঙ্ক জয়ী হইতে বসিয়াছে।···দীর্ঘ কুমারীজীবনে পূর্ব্বরাগের কোন ছবিই কি কখনো আঁকে নাই মীনা? কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে?···হয়তো আঁকিয়াছে···হয়তো কল্পনার ছবি বর্ত্তমান বাস্তবের চাইতে কম মনোরম নয়, কিন্তু ইচ্ছামত ছবি আঁকিয়া শ্লেট মুছিয়া ফেলা এক, আর বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া আর।

অস্বস্তি গোপনের চেষ্টায় একাকী বাহির হইয়াছিল মীনা।

সুযোগও একটু মিলিয়াছিল, কটক হইতে তটিনীর এক মাসী আসিয়াছেন স্মৃতিদেবীর সঙ্গে দেখা করিতে। তটিনী ব্যস্ত, মীনা অপরিচিতা—তাই মীনা কাটিয়া পড়িয়াছে।

ওদের আবেষ্টনী হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া যেন বেশ লাগিতেছে।···আচ্ছা এই সুযোগে পলাইলে কেমন হয়? নিজের সেই ছোট ঘরখানি, স্বল্প গৃহসজ্জা, জীবনযাত্রার সামান্য উপকরণ, সবকিছুর জন্য কেমন যেন মন কেমন করিতেছে।··· তটিনীদের কলিকাতার বাড়ীতে একদিন মাত্র বেড়াইতে গিয়াছিল মীনা, অসংখ্য বাহুল্য আড়ম্বরের মাঝখানে দুই ভ্রাতৃবধূকে দেখিয়াছে তাহার, মনে মনে তাঁদের পাশে পাশে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া 'চরিয়া খাইবার' হুকুম দিয়া হাসিয়া ফেলে মীনা।···অসম্ভব, অসম্ভব!···কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেই এ পাগলামী সারিয়া যাইবে তটিনীর। তটিনীর দাদারও।··· কিন্তু সম্পূর্ণ সারিয়া যাওয়াটাও কি নিতান্তই কাম্য?···কে জানে? মীনা আর ভাবিতে পারেনা।

ভাবিতে না পারিলেও হয়তো ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া একটা কিছু স্থির করিত, কিন্তু—সস্তা সাপ্তাহিকের রদ্দি গল্পের 'ঘটনাচক্রের' মতো বারবার যে সমুদ্রতীরের বালুবেলায় অরুণেন্দুর সঙ্গে দেখা হইতে থাকিবে, এটা মোটেই ভাবিতে পারে নাই আগে।···এক মিনিট আগেও না।

তা' দেখা যখন হইলই কথা না কহিয়া উপায় কি? না কহিবার কারণও কিছু নাই। নিজেই আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করে।

—আপনি এখনো যাননি না কি?

—গিয়েছিলাম বৈ কি, আবার এসেছি কাল।

—ওঃ! মাকে নিয়ে যেতে এসেছেন বুঝি?

—মাকে? না তো। মাকে এখনো জানাইওনি। এসেছি এমনি—ধরুণ এই দৈবঘটনাটীর জন্যে।

—কোন্ ঘটনা?

বিস্মিত প্রশ্ন করে মীনা।

—এই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া।

—ধেৎ, কি যে বলেন আপনি। যাক কলকাতার খবর বলুন।

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বালির উপর পাতিয়া কাছাকাছি বসিয়া পড়ে অরুণেন্দু।···ওঃ এখনো তা'হলে কলকাতার খবরের জন্যে সদ্যআগতের শরণাগত হচ্ছেন? কিন্তু স্কুল তো খুলে গেছে আপনাদের।

—জানি।

অন্যমনাভাবে উত্তর করে মীনা।

—জানেন নিশ্চয়ই, নির্দ্দিষ্ট তারিখ যখন আছে একটা। কিন্তু ব্যাপার কি? জমিদারী টমিদারী পেয়ে গেছেন না কি এখানে?

হঠাৎ মীনা কি ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বলে—ব্যাপার কি জানেন—সঙ্গী পাচ্ছিনা। আজকালকার দিনে—নেহাৎ একলা ট্রেন জার্নি—ঠিক মন সরছেনা, অথচ এঁরাও যেতে দেরী করছেন, ভারী মুস্কিলে পড়ে গেছি।

অরুণেন্দুর গভীর দৃষ্টি অমন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে কেন?

কিসের প্রত্যাশায়?

কিন্তু কথার সুরে তার বিশেষ আগ্রহ ধরা পড়েনা। সহজ-ভাবেই বলে—

—অবিশ্যি কেবলমাত্র সঙ্গীর অভাবটাই একমাত্র কারণ হলে—আমাকেও সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন দয়া করে।

—আপনি কবে যাবেন ?

মীনার কণ্ঠে চাঞ্চল্য।

—যদি বলেন আজই—এখনই।

—কী আশ্চর্য্য! আপনার নিজের কাজ না সেরেই—কি জন্যে এসেছেন ?

—বিশ্বাস করেন তো বলতে পারি আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যেই এসেছি।

—বা-রে! ও রকম অনাসৃষ্টি কথা বিশ্বাস করতে যাবো কি দুঃখে ?

মীনা হাসিয়া ওঠে।

অরুণেন্দু কিন্তু গম্ভীরভাবেই উত্তর করে—বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু পরে দোষ নেবেন না! অন্ততঃ মিথ্যেবাদী বলে গাল দেবেন না।...জগতে অনাসৃষ্টি ব্যাপার তো অহরহই ঘটছে—অবিশ্বাসের কি আছে ?

—তাই বলে আপনি কাজ কামাই করে—

—কোনটা কাজ আর কোনটা কাজ নয় সে হিসেব সকলের এক না হ'তে পারে, মোটকথা—নিয়ে যেতে আমি আজই পারি।

পলাইবার জন্য সমস্ত মন উদগ্র হইয়া ওঠে মীনার।

কি ক্ষতি ?···হয়তো তটিনী আর মুখ দেখিবে না, স্মৃতিদেবী অবাক হইবেন, সাগর হাসিয়া ভাবিবে—ভ্যাগিস! খুব বাঁচিয়া গিয়াছি বাবা!

কিন্তু সে কি না বলিয়া পলাইবে ? এত স্নেহমমতার প্রতিদানে ? অথচ বলিবেই বা কি ? আচ্ছা এমনিই বলা যাক্—কলিকাতায় কিছু কাজ আছে।···মিথ্যাও তো নয়, স্কুলের কাজ ছাড়িতে চাহিলেও তা'র হিসাব নিকাশ আছে। টিউশনীর ব্যবস্থাটা করিয়া আসিয়াছে, সেখানেও জবাব দেওয়া প্রয়োজন।···তা'ছাড়া এদের বাড়ী থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একদিন 'কনে' সাজিয়া বসাটাই বা কোন্ যুক্তির কথা ?··· নিজের ঘরে ফিরিয়া একলা নির্জনে নিজের মনটা যাচাই করিয়া লওয়া দরকার।

··· ··· ···

নিজের মনের দ্বিধা দূর করিতেই হয়তো কথার উপর জোর পড়ে বেশী।

—বেশ চলুন আজই যাওয়া যাক···আপনি যখন কাজের ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী হচ্ছেন। অনর্থক স্কুল কামাই বাড়াই কেন ?···গাড়ী তো সেই রাত্রে ? তৈরী হয়ে নিতে পারবো। বাড়ীটা আপনাকে চিনিয়ে রাখা দরকার···এই ডানহাতি খানিকটা এগিয়ে গেলে—

—থাক। “স্মৃতিসৌধ” আমি চিনি, কিন্তু—আপনার সাময়িক অভিভাবকবর্গ আমায় চেনেন না এই যা মুস্কিল। তার চেয়ে বরং—

আলাপ আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চলিতে থাকে।···না অরুণেন্দু ওদের বাড়ী পর্য্যন্ত হানা দিবে না, মীনাই বরং প্রস্তুত হইয়া ষ্টেসনে হাজির হইবে। বান্ধবী না হয় ‘সি অফ্’ করিতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিক্। মীনার মতো ‘খাটিয়া খাওয়া’ মেয়ের অবশ্য পথেঘাটে একলা যাইতে ভয় পাওয়া হাস্যকর, কিন্তু মীনা যে বড় ভীতু।···কলিকাতার রাস্তাতেই সন্ধ্যার পর একলা বাহির হইবার নামে হৃৎকম্প হয় তা'র, এতো বিদেশ।···

কি বলিয়া এমন অকস্মাৎ যাওয়ার কথাটা পাড়িবে সারা পথ তাহার রিহার্শাল দিতে থাকে মীনা···কিন্তু গড়িয়া ভাঙিয়া অনেক সাজাইয়া যেটুকু স্থির করে—বাড়ী ঢোকার অব্যবহিত পরেই ধূলিসাৎ হইয়া যায়···দালান পার হইয়া নিজের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তটিনীর মাসীমার নির্ভেজাল স্পষ্ট কণ্ঠ কাণে আসে।

—হাঁরে তন্নু, ওই তোদের সেই মাষ্টারণী? সাগরের পছন্দ করা বৌ? তা' জগতে কি আর মেয়ে জুটলোনা তোর দাদার?···ওই বৌ তোরা লোক সমাজে বার করতে পারবি? ···বড় বৌমা মেজ বৌমার বাঁ পায়ের কড়েআঙুলের যুগ্যিও

নয় যে।…কিসে বশ করলো তোদের?…কেন চুপ করবো কি জন্যে? আমার বাপু হক্ কথা। সাগরের পাশে ওই বৌ! দিদির নয় বয়েস না হ'তেই ভীমরতি হয়েছে—তোদের কি হ'ল?…

বোঝা গেল কথা কয়টা উদ্‌গীরণ করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া ছিলেন তিনি। কারণ আসিবামাত্রই তিনি মীনাকে দেখিয়াছেন, হঠাৎ এইমাত্র দেখিয়া ফেলিয়া অসতর্ক মন্তব্য করিয়া বসেন নাই।

… … …

না বলিয়া পালানো ভিন্ন আর কোনো পন্থা মাথায় আসে না মীনার।…বিদায় লইবার প্রয়োজন কি তার—একেবারেই বিদায় লইবে যে?…একটীমাত্র মাসীর একটীমাত্র মন্তব্যের মধ্যেই সমস্ত ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মীনার।… শানানো ক্ষুরের ফলার উপর জীবনটাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না সে।…রাণীগিরি মাথায় থাক।…

অরুণেন্দুর হোটেলের ঠিকানা সে লইয়াছে…খুঁজিয়া বার করা শক্ত নয়।…তটিনীর নামে এক লাইন চিঠি লিখিয়া যাওয়ার একটা উপাদান পাওয়া গেল…মন্দ কি?…"ভেবে দেখলাম—রাণীগিরি সকলের সয় না…"।

ভাবা গিয়াছিল—হেমলতার এই আশ্রমবাস—সংসারের উপর এই মৌন অভিযোগের নিঃশব্দ শাসন—মিত্তির বাড়ীর মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিবে, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল মিত্তির বাড়ীর কাঠামো অত বে-মজবুত নয়।…ভিতরে ভিতরে যদি কোন পরিবর্ত্তন আসিয়া থাকে সে সামান্যই, বাহিরের ঠাট অবিকল আছে

সংসারসুদ্ধ লোকের সদা সন্ত্রস্ত ভাবটা হয়তো একটু কমিয়াছে—হয় তো কিছুই কমে নাই।…সেজকাকা একাই দুই-জনের মোহড়া লইতেছেন।…বরং 'খোঁটা' নামক উপাদেয় বস্তুটি প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত একটা কারণ ঘটিয়া সুবিধাই হইয়াছে তাঁর।

চার হাত মেলিয়া খাইবার জন্য যাহারা বাড়ীর কর্ত্রীকে বাড়ীছাড়া করিয়া বাঁচিয়াছে, সুবিধা পাইলেই তা'দের "একহাত' দেখিয়া লইবার বাসনা বিসর্জ্জন দেওয়ার মতো অত উদার মতাবলম্বী নন সেজকাকা।

বাড়ীতে বিশৃঙ্খলার অভাব কোনো দিনই ছিল না, এতবড় একটা বেখাপ্‌পা সংসারে থাকা সম্ভবও নয়, তবু—আজকাল প্রতি পদে পদে শৃঙ্খলার অভাবে যেন মর্ম্মাহত হইতে থাকেন সেজকাকা।…

অবশ্য শুধু মর্ম্মাহত হইয়াই নীরব থাকেন মনে করা ভুল। প্রত্যেকের যোগ্যতার অভাব স্মরণ করাইয়া দিবার মতো হুঁস অন্ততঃ আছে।...

—"হ্যাঁঃ কার যে কতো ক্ষমতা বুঝতে আর বাকী নেই... ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো হবে, তা'হলেই হয়েছে...এ সংসারের আবার লক্ষ্মী শ্রী! আসল লক্ষ্মীই যখন চলে গেলো...ছিঃ ছিঃ ভদ্রস্থতা আর রইল না—সেই যে বলেনা—"সেই ধান সেই চাল, গিন্নী বিনে আলথাল"। এ হয়েছে তাই।...দূর দূর এ সংসারে আবার থাকতে আছে! মারো ঝাড়ু মারো ঝাড়ু।"

কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার সম্মানরক্ষার্থেই কি উঠিতে বসিতে ইহাদের অক্ষমতা প্রতিপন্ন করিবার এই প্রাণপণ চেষ্টা? হয়তো—তা নয়। হয়তো—বয়সের ভারটা মনের উপর বড় বেশী চাপিয়া বসিয়া আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাই বয়সের অমর্য্যাদা যে কতবড় গর্হিত কাজ সেটা অহরহ স্মরণ করাইয়া দিতে থাকেন।

চিরদিনের জায়গায় নিজস্ব আসনে টিঁকিয়া থাকিবার জন্য যে এত অঙ্ক কসিতে হয় একথা কে কবে আগে ভাবিয়াছ?

জ্ঞানদাও আগের চাইতে একটু হায়ার গ্রেডে উঠিয়াছেন।

আগে সেজদা'র সুখ সুবিধার তত্ত্বাবধান, 'বৌ ঝি'র বেচাল দেখিলে 'খুড়িয়া' দেওয়া এবং হেমলতার ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ও

কৃপণতার উদাহরণ দেখাইয়া নেপথ্যে নিন্দা করা ছাড়া বড় বেশী কাজ ছিল না জ্ঞানদার।...অম্বলের অসুখের ছুতায় আগুনতাতকে চিরদিনই এড়াইয়া আসিয়াছেন, ভাঁড়ার-ঘর তো ন'গিন্নীর এলাকা।...কিন্তু সম্প্রতি একটী বৃহৎ দায়ীত্ব তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়াছে।

হেমলতার মতো সারা সংসারের সমস্ত খরচ পত্রের হিসাব নিকাশের ভার না হোক—মোটামুটি 'সংসার খরচ' বলিতে যা বোঝায় সেটা আসিয়াছে জ্ঞানদার হাতে। অথচ মজা এই —ব্যবস্থার ভার লইয়া কৃপণতায় তিনি হেমলতার তিনগুণ উপরে উঠিতে সুরু করিয়াছেন।

তলায় তলায় অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হইতেছে—কিন্তু জ্ঞানদার তাহাতে দৃকপাত মাত্র নাই, কারণ উৎসাহটা নবীন।...ছোট ছেলেদের দুধে জলের মাত্রার আধিক্য, বৌ ঝির পাতে মাছ তরকারির দৈন্য এবং বামুন ঠাকুরের হেঁসেলে তেল ঘী মসলা মিষ্টির টানাটানির নেশাটা তাঁহাকে এমন পাইয়া বসিয়াছে যে 'দশবার জপ-আহ্নিক' করিবারও সময় পাননা বেচারা।

হেমলতার শাসনে ছিল নিঃশব্দ দৃঢ়তা, হয়তো কিছুটা আভিজাত্য। ন্যায্যর অতিরিক্ত যেন না যায়। বাড়ীর বেশী উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিগুলি যে তাঁহারই পুত্র সেটাও তো মনে রাখিতে হইবে। এক আধ পয়সা লইয়া মারামারি করিলে মানাইবে কেন?...মোটা চাল মোটা ব্যবস্থার বেশী কিছু আশা করিও না, ব্যস্!

জ্ঞানদার সে বালাই নাই।

অবশ্য-প্রয়োজনীয় ষোলোআনাটা যদি তিনি বারো আনায় নামাইতে পারেন সেটা কি সোজা বাহাদুরী? সেই বাহাদুরীটুকুর লোভ সামলানো সহজ নয়।

ইন্দুপ্রভা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন।...বঁটি এবং তরকারির ঝুড়ি লইয়া সকালবেলাই বাধিয়া গিয়াছে এক চোট।

—কুটনো কোটার ভার কাল থেকে যেন ঠাকুরঝি নিজে নেয়—বলিয়া আনাজপাতির ঝুড়িটা হাত দুই ঠেলিয়া দিয়া ঝাঁঝিয়া ওঠেন ইন্দুপ্রভা—এই তো ক'টা আলু পটল—এই রাবণের গুষ্ঠির 'হাঁ' কি দিয়ে বোজাবো আমি তাই শুনি? তাই কি মাছফাছ দুটো বেশী আনাবে? পারবোনা আমি ব্যবস্থা করতে। কেন রে বাবা, আমি কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি? বাজারের পয়সা কমালেই গিন্নীত্ব হয়না, এতগুলো লোক কি দিয়ে গিলবে দেখুক এসে? খোদ গিন্নী তো রাগ ফলিয়ে শ্রীক্ষেত্তরে গিয়ে বসে থাকলেন, আমারই বা কিসের দায়? নিজের বলতে তো ওই একটা অখন্তে অবন্তে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, খেতে দিতে না পারিস দিস দূর করে।...এই তো—একটা মেয়ে আজ পাঁচ বছর শ্বশুরবাড়ী পড়ে আছে, আনবার নাম করে কেউ? নিজের মুরোদ নেই তাই নাম মুখে আনিনা।...তার কাছে গিয়ে পড়ে থাকলেও রাজার হালে চলে যায় আমার, যতক্ষণ গতর থাকবে

সবাই মাথায় করে নেবে।···তাই বা কেন, জামাইবাড়ী থাকবার বা দরকারটা কি? বলি কাশী তো পালায়নি, দে আমায় কাশী পাঠিয়ে দে তোরা। মাসোহারা না দিতে পারিস, ছত্তরে খাবো।···

আচমকা শুনিলে—ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় বৈরাগ্যের বহরটা ইন্দুপ্রভার ষোলো আনা ছাপাইয়া আঠারো আনায় উঠিয়াছে—কিন্তু প্রত্যহ শুনিতে শুনিতে কাণ যাহাদের ভোঁতা হইয়া গিয়াছে তাহারা গ্রাহ্যও করে না। আসরে নামিলেই ইন্দুপ্রভা চীৎকার সুরু করিবেন এইটাই প্রচলিত প্রথা। তবে এটা সত্য কথা, নিজের বাদে আর কারও খাওয়া দাওয়ার কষ্ট দেখিতে পারেন না তিনি। এক মুঠা ভাত কেউ কম খাইয়া উঠিলে সারাদিন মন খচ্‌খচ করিতে থাকে ইন্দুপ্রভার। বহির্প্রকৃতিটা যত রুক্ষ অন্তর্প্রকৃতিটা হয়তো ততো নয়।···'ছাড়িব' বলিয়াও ছাড়িতে পারেন না। খাওয়া দাওয়ার তদ্বির করা ছাড়া জগতে আর কি কাজ থাকিতে পারে, সে কথা জানা নাই ইন্দুপ্রভার।

আজ ক্রোধের মাত্রাটা মাত্রা ছাড়াইয়াছে।

কিন্তু ইন্দুপ্রভার এই বিদ্রোহ ঘোষণার তীক্ষ্ণস্বর জ্ঞানদার কাণে ঢুকিবার অবকাশ পায় নাই। তিনি তখন ওদিকে সিঁড়ির তলার ছোট দরজা খুলিয়া শিশি-বোতল-ওয়ালা ডাকিয়াছেন।···শুধু ডাকিয়াছেন বলিলেই অবশ্য উপসংহার করা চলেনা—ডাকিয়াছেন—কাগজ ওজন

করাইয়াছেন—অতঃপর বিপুল বিক্রমে বাদবিতণ্ডা সুরু করিয়াছেন।

পুরনো কাগজের সেরদর যে, বারো আনার নীচে নয় এ তথ্য জ্ঞানদার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু সদ্যডাকাত লোকটা বলে কিনা—এগারো আনার বেশী চাহিলে নাকি গলা কাটা হয় তাহার। এরপর কলহ বাধা ছাড়া উপায় কি?…গলা তো তোরাই কাটিস বাপু, সেদিন সেই "এ্যালুমিনিয়াম টুটা-ভাঙা বিক্রী"টা কি কম ঠকানটা ঠকাইয়া গেল? নানা কথার প্যাঁচে ফেলিয়া জ্ঞানদাকে যেন হতভম্ব করিয়া দিল।

আর ঠকিতে রাজী নন তিনি।

আগে কখনো এসব কেনাবেচার ব্যাপারে জ্ঞানদার উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অবহেলিত বাসি কাগজ-গুলা ছোটছেলেরা নৌকা বানাইয়া ছিঁড়িয়া কুচাইয়া এবং ততোধিক ছোটছেলেরা অন্যকাজে সদ্ব্যয় করিয়া আসিয়াছে এত দিন, কিন্তু আজকাল জ্ঞানদার শ্যেনদৃষ্টি হইতে কোন অপচয় হইবার উপায় নাই, সকলের পড়া সাঙ্গ হইবার আগেই লুকাইয়া গৃহজাত করিয়া ফেলেন।

অনেক বাক্‌যুদ্ধের পর, সবে যখন সাড়ে এগারো আনায় রফা হইয়াছে—বামুন ঠাকুর আসিয়া যেন কামান দাগিল।

—পিসিমা! এমত বাড়ীতে মু কাম-অ করিতে ন পারিব-অ।

পিসিমা বিরক্তভাবে হাতের ইসারায় চুপ করিতে বলেন—কারণ ডাকাত ফেরিওয়ালাটা আবার কিছু কারসাজি করিয়া না বসে।

ঠাকুর ইসারার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাভাব দেখায় না। একমুঠা কাঁকর মুখে ভরিয়া কথা কহার মত দাঁতভাঙা স্বরঝঙ্কার এবং অনাবশ্যক অ-কারান্ত ভার প্রপীড়িত শব্দ ব্যঞ্জনায় একনাগাড়ে যাহা বলিয়া যায়—তাহার তাৎপর্য্য এই—এরকম শৃঙ্খলাবিবর্জ্জিত এবং বদরাগী গৃহিণী-সম্বলিত বাড়ীতে কাজ করা শুধু কঠিন নয়—অসম্ভব। অতএব এইদণ্ডে বেতন চুকাইয়া দেওয়া হোক, হাত পা চোখ কাণ থাকিতে চাকরীর অভাব হইবে না.'ত্রিলোকনাথের'।

জ্ঞানদা কাগজের দাম একটাকা চৌদ্দআনার পয়সা সাবধানে গণিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলেন—কেন তোমার আবার সক্কালবেলা কি হ'ল ঠাকুর? এই তো দেখে এলাম দিব্যি রান্না চড়িয়েছো।

ঠাকুর বাঙলা বুঝিতে পারে, বলিতেও না পারে এমন নয়, কিন্তু জাতীয় ভাষা ত্যাগ করিতে নারাজ। পিসিমার কথার উত্তরে রোষক্ষুব্ধস্বরে বলে—দিব্য-অ! মু কুটনা পাইব না, অনাজ তরকারি পাইব না, দিব্য রাঁধিব! এমত শকতি মোর ন অছি।...অট্টা বাজি গলা—অফিস-অ টাইম-অ হোই গলা, মু কিমতি ভাত-অ দিব?

—কেন ন'গিন্নী গেলেন কোথা?

জ্ঞানদা বিরক্তস্বরে প্রশ্ন করেন।

—মু ন জানি।

ঠাকুরও সমান তালে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তৈলচিক্কণ গামছাখানির সাহায্যে গায়ের ঘাম মুছিতে থাকে।...অর্থাৎ সে আর কিছু বলিতে রাজী নয়, জ্ঞানদা অকুস্থলে গিয়া তদন্ত করিতে পারেন করুন।

—ন'বৌ যেন চব্বিশ ঘণ্টাই মিলিটারী! সংসারের ছুটো কুটনো বাটনা করে বাড়ীসুদ্ধ লোকের মাথা কিনে রেখেছে একেবারে! দেখি—আবার কি আগুন জ্বললো সকাল বেলা।

কাগজওয়ালার সঙ্গে বকাবকির পর গুরুপরিশ্রমে অম্বলের রোগী জ্ঞানদার 'হাঁপধরা' স্বাভাবিক, হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাই সামনেই যাহাকে দেখেন প্রশ্ন করেন—কে ওখানে? শান্তি? তোদের ন'ঠাকুমার কি হ'ল আবার?

শান্তির বয়সটা যদিচ কবি-বর্ণিত ভাষায়—"কৈশোর যৌবন হুঁহু মিলি গেল" গোছের, কিন্তু মুখভঙ্গীটা যা করিল সেটা কিশোরী যুবতী উভয়ের পক্ষেই বেমানান। প্রায় ন'ঠাকুমার মুখভঙ্গীর নকল করিয়াই ঝঙ্কার দিয়া ওঠে—হয়েই তো আছে, নতুন করে আবার কি হবে?

অর্থাৎ বোঝা গেল শান্তি মূলতথ্য অবগত নয়। ইন্দুপ্রভা সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে হইলে অগ্রাহ্যভাব দেখানোই অভ্যাস তাই। তাছাড়া—সে বেচারা অভিভাবকমণ্ডলীকে লুকাইয়া চাকর বসন্তকে "তেলেভাজা" খাবারের ফরমাস করিয়া

সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া আছে—তাড়াতাড়ি বামাল পাচার করিতে, এখন আবার এসব কি উৎপাত ?···

—বাবা! মেয়ে নয় তো যেন আগুনের খাপ্‌রা! এ সব মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে করবে কি!···জ্ঞানদা অস্ফুটস্বরে নানা মন্তব্য করিতে করিতে অগ্রসর হ'ন।

কিন্তু ইন্দুপ্রভা মাথা খুঁড়িয়া মরিতে পারেন—মেজাজ দেখাইয়া বসিয়া থাকিবার অবকাশ কোথায় ?···ঠাকুরের ষ্টকে মাত্র ডালভাত ও একটা মোটা চচ্চড়ি গোছের সম্বল, অথচ অমু অপু স্নান করিতে গেল।

না—শাসনও নয় জুলুমও নয়, নিজের স্বভাবের কাছেই মাথা হেঁট করিতে হয় ইন্দুপ্রভাকে। চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিবার শক্তি তাঁহার নিজেরই নাই, ভিতরের তাগিদেই তাড়াতাড়ি গোটা কতক আলু-পটলভাজা কুটিয়া দিয়া একতাল পোস্ত লইয়া বাটিতে বসিয়াছেন।···অমূল্য ভালবাসে পোস্তর বড়া।

অবশ্য হাতের সঙ্গে রসনাও সমানতালে খাটিতেছে।

ছেলেদের পাকড়াও করা শক্ত।···

স্নানাহার করিতেই তো ন'টা বাজিয়া যায় ওদের। অবশ্য অপূর্ব্বর কথা আলাদা, তার অনেক কাজ। রাজ্যের ভাঙা জিনিস মেরামত করিবার দুর্ব্বহ ভার যার মাথায় তা'র আর

অবসর কোথায় ?…অথচ খবরের কাগজখানা কেবল মাত্র একলা মনে মনে পড়িয়া চুপ করিয়া থাকা কী দুরূহ ! বিশেষ তো এই সময় ! ভারত যখন জীবন মরণের সন্ধিস্থলে !

তাই কাগজখানা নাড়িতে নাড়িতে দৈবাৎ যেন আসিয়া পড়িয়াছেন—এইভাবে খাবার ঘরেই আসিয়া চাপিয়া বসেন সেজকাকা, অমূল্য অপূর্ব্বর আসনের সামনে।…

—কাগজ দেখেছ না কি আজকের ?

না দেখাটা যেন অপরাধ হইয়াছে এমনি কাঁচুমাচু মুখে অপূর্ব্ব বলে—না—ইয়ে—দেখা হয়নি—ষ্টোভটা এমন দিক্‌দারীতে ফেলেছিল—কোনোখানে খুঁৎ দেখতে পাচ্ছিনা অথচ—

সেজকাকা ভ্রূকুঞ্চিত করেন—এই সেদিন না সারলে ষ্টোভটা ?

—সেটা তো বাড়ীর—ভারী যেন ব্যস্ত এই ভাবে তাড়াতাড়ি খাইতে থাকে অপূর্ব্ব—এটা কার সেকথা আর বলে না। বাড়ীর লোকে যে তার এই সব কাজকর্ম্ম সুচক্ষে দেখে না—নিতান্ত 'উদোমাদা' হইলেও সেটুকু বুঝিবার মতো বুদ্ধি আছে অপূর্ব্বর।

অন্যসময় হইলে সেজকাকা এই ঘরের খাইয়া পরের মোষ তাড়ানোর মতো আহাম্মকীর বিরুদ্ধে একচোট উপদেশ বর্ষণ করিতেন, কিন্তু এখন মাথার উপর দুশ্চিন্তার পাহাড় তাই কাণ করেন না, সোৎসাহে বলেন—আমাদের জিন্না সাহেবের আবদারটা দেখলে একবার ? সেই যে বলে না—

ভুডও খাবো টামাকও খাবো—ঠিক তাই। লাট বাহাদুরের কালকের চিঠিটা পড়েছ তো?

বলা বাহুল্য কালও অপূর্ব্বর সময় ছিল না।

মুখ দেখিয়া বুঝিতে আটকায়না সেজকাকার, ক্ষুব্ধস্বরে বলেন—কাগজ পড়োনা তোমরা? থাকো কি করে? আশ্চর্য্য!

অমূল্য কোনোদিনই পড়েনা—সে কথা ব্যক্ত করিতেও দ্বিধা করে না।

—পড়েই বা কী কাঁচকলা হবে? কর্ত্তাদের ওই আলাপ প্রলাপ আর বিলাপের বর্ণনা তো? অফিসে তো শুনতে শুনতে কাণ পচে গেল, নিস্তার আছে?

এততেও যদি সেজকাকা উত্তেজিত না হ'ন তো আশ্চর্য্য।

—কাণ পচে গেল? অবাক করলে যে হে? বলি এতবড় একটা সাম্রাজ্য—ওরা বিনা বাক্যব্যয়ে ছেড়ে দেবে? কথাটী কইবে না?

—ছেড়ে দেবে কে বললে?

—দেবে না? ওদের ঘাড় দেবে—পরম পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন সেজকাকা—বাপ্ বাপ্ বলে দিতে হবে বাছাধনদের, মহাত্মাজী তো কাঁচাছেলে নয়—এমন প্যাঁচ্ কসেছেন—

—পঞ্চাশ বছর ধরে তো কসছেন প্যাঁচ, হলো কি? প্যাঁচের ওপর প্যাঁচ আছে বুঝলে সেজকাকা, শেষ অবধি—ভাত কাপড়টা পর্য্যন্ত মুঠোর মধ্যে পুরেছে। বলে কি না

দেশ স্বাধীনতার পথে এগোচ্ছে', একমুঠো ভাত বেশী খাবার স্বাধীনতা নেই লোকের—হুঁঃ।

খাইবার স্বাধীনতা না থাকিলেও ফেলিবার স্বাধীনতাটা এখনো অব্যাহত আছে প্রমাণ করিতেই বোধকরি অমূল্য অর্দ্ধেক ভাত পাতে ফেলিয়া জলের গ্লাসে হাত ডুবাইয়া উঠিয়া পড়ে।

খাওয়ার সময়টা জ্ঞানদারই কাছে বসিবার কথা। নিয়মিত কোনো দায়ীত্বের কাজ ঘাড়ে লইতে রাজী নয় বলিয়া তদারকীর কাজটাই তিনি করেন বেশীর ভাগ, কিন্তু ইদানীং—যেদিন আহার্য্য বস্তুর বাহুল্যটা কম দেখেন, সহজে খাবার ঘরের দিক মাড়ান না। কিন্তু সেজকাকার নজর এড়ানোও শক্ত, তিনি নেহরু-জিন্না সমস্যা ভুলিয়া হাঁ হাঁ করিয়া ওঠেন—উঠে পড়লে মানে? খাওয়া হয়ে গেল? অর্দ্ধেকও খেলে না যে!

—কি ছাই দিয়ে খাবো?...অমূল্য স্বভাবসিদ্ধ কটুস্বরে মন্তব্য করে—বাড়ীতে আজকাল যা খাওয়া দাওয়া হচ্ছে—এ রকম চললে—হোটেলে গিয়ে খেতে হবে—

সেজকাকাও কিঞ্চিত খবর রাখেন না তা' নয়। বাজার করিবার সময় মনই ওঠে না তাঁর, কিন্তু জ্ঞানদা যে দৈনিক চারটা টাকার বেশী হাতছাড়া করিতে রাজী নয়। তবু অনেক সময় নিজস্ব পয়সাও ঘুস দিতে হয় বৈ কি।...ভালো জিনিসটা —বাজারের সেরা জিনিসটা কিনিবারও যে একটা নেশা আছে।

সেজকাকা সমস্ত বিরক্তিটা মুখের ভাবে প্রকাশ করিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে ডাকেন—জ্ঞানো! বলি আজকাল সব হচ্ছে কি? আছিস না মরেছিস?…হবে না? বাড়ীর লক্ষ্মী যেদিন থেকে বাড়ীছাড়া সেদিন থেকেই সংসারের এই হাল! ছিঃ! ছিঃ! খাওয়াই হ'লনা ছেলেটার—

অপূর্ব্ব শেষ ভাতটী শেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে বলে—আসল কথা অফিসের বেলা হয়ে গেছে—দিল খাওয়া দাওয়ার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে। আবার বেশী কি হবে রান্না? খিদে থাকলে…কই রে মিনু, আমার পান?

এইবার জ্ঞানদা আসরে উঁকি মারেন—ভয় যা কিছু অমূল্যকে। চাপা গলায় বলেন—ন' বৌয়েরও দোষ আছে। কেন, ওদের পাতে দিতে একটু ভালো তরকারি জোটেনা? এই তো দিনে চার পাঁচ টাকার বাজার হচ্ছেও—আসলে ও সব নষ্টামী।

—কি যে বাজে বাজে বকো পিসিমা।

প্রায় ধমক দেওয়ার মত শুনিতে লাগে অপূর্ব্বর কথাটা।

পিসিমা খুব বেশী দমেন না, সেজদার আরো একটু নিকটবর্ত্তী হইয়া বলেন—আর তা'ও বলি—এই আক্রা-গণ্ডার দিনে সবাই মিলে চাকরী বাকরী করুক, তা' নয়—জোয়ান ছেলেরা কেউ কবিতা লিখছেন, কেউ ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন—

অপূর্ব্ব হাসিয়া ফেলে।—তারা আবার কারা গো পিসিমা?

—কেন, অন্নু, সুধো? রোজগার করার বয়স হয়নি ওদের? বিদ্যে শিখেও যা, মুখ্যু থেকেও তাই।

সুধো ন'গিন্নীর অযত্নে অর্যত্নে ছেলে। ঘুড়ি ওড়ানো, পায়রা পোষাই তার পেশা!…অনিরুদ্ধর স্বাস্থ্যটা চিরদিনই কম জোরালো এবং কবিতা না লিখুক উপন্যাস সে লেখে—তা' ছাড়া এত উর্দ্ধলোকের স্বপ্ন দেখে যে অর্থোপার্জ্জনের মতো ছোট কথাটা বোধ করি কোনদিন ভাবিয়া দেখে নাই।… কিম্বা হয়তো ভাবিয়া দেখিয়াছে, তা'র ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত কোন পথ পায় নাই, ফল একই।

কিন্তু কথাটা তুলিতেই অপূর্ব্ব দরাজ গলায় হাসিয়া ওঠে।—তা'হলেই হয়েছে, অন্নু করবে চাকরী! ওর যে মনিব হতে পারবে সে এখন তপস্যা করছে। তুমি এক পাগল পিসিমা।

—আচ্ছা এরপর বুঝো ঠ্যালা। কেন সুধোর যুগ্যি চাকরীও কি জুটিয়ে দিতে পারিস না একটা? জোয়ান মদ্দ ছেলে—লেখাপড়ার পাট নেই—

—ভাতের কি সত্যিই এত অভাব হয়েছে পিসিমা—অপূর্ব্ব ম্লান মুখে বলে—ছেলেবেলার সেই টাইফয়েডের পর থেকে মাথাটা ওর কেমন হয়ে গেছে তুমি কি জাননা? প্রায়ই শুনি সুধোর নিন্দে, কারণটাই দেখ ছাই। স্বাভাবিক বুদ্ধি হ'লে—অতবড়ো ছেলে ঘুড়ি ওড়াতেই বা যাবে কেন? লেখাপড়াই বা পারবে না কেন?

অপূর্ব্ব আর দাঁড়ায় না, অফিসের বেলা হইতেছে।

জ্ঞানদা আপনমনে গজগজ করেন—না কারুর কোনো দোষ নেই, সবাই গুণের অবতার। যার দোষটী ধরিয়ে দিতে যাবো—তা'র হয়েই ওকালতী! মান্ধাতার আমলে টাইফয়েড হয়েছিল—এখনো তার জের চালাতে হবে? অবাক কথা! কেন, মাথা খাটাবার কাজ না পারে—অতবড় ছেলে লোহা পেটানও ভালো, যা আসে ঘরে।...আজকালের বাজারে ছুটো মানুষকে ভাত কাপড় দিয়ে পোষা সোজা কিনা! এর ওপর আবার মেয়ে আনা হয় না বলে ন'গিন্নীর রাগ কতো!

পুষিতে জ্ঞানদাকেও হয়, কিন্তু সেটা বোধকরি হিসাবের খাতায় তুলিতে মনে পড়েনা।

বাইশ

এই ভাবেই দিনরাত্রির চক্র আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

এ সংসারের ভাত খাইয়া যদি কেউ গণমুক্তির স্বপ্ন দেখে, বিশ্বশান্তির ছবি আঁকে, পাগল ছাড়া সে তবে কি?··· হয় তো অনিরুদ্ধ নিজেও জানে মানসিক এই স্বাতন্ত্র্যই তার পাগলামী।···হয়তো এতদিনে মার্চ্চেণ্ট অফিসের একটা চাকুরী আর রূপসী স্ত্রী জুটাইয়া সুখেই থাকিতে পারিত সে।··· দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের খাতিরে উপরওয়ালাদের নিকট হইতে প্রাপ্য 'আহা-উহু'টা বরদাস্ত করিতে পারার অভাবে যে রূঢ়তা প্রকাশ করিয়া বসে—সেটা না করিলে ওই দুর্ব্বলতার অজুহাতেই ষোলোআনা সুবিধা লইতে পারিত সংসার হইতে, কিন্তু কিছুই পারেনা সে।···শুধু তিক্ত বিষাক্ত মুহূর্ত্তগুলি পরিপাক করিতে করিতে আরো দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়।···বিনিদ্র রাত্রি পায়চারি করিয়া কাটে।

বিনিদ্ররাত্রি···তবু এরও একটা মাদকতা আছে, সমস্ত পারিপার্শ্বিক হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলাদা করিয়া দেখার মাদকতা।···তাই—অরুণেন্দুর দেওয়া ঘুমের ঔষধের পুরিয়া ড্রয়ারে জমা হইতে থাকে অনিরুদ্ধর···রাত্রি যখন গভীর হইতে থাকে, এই বৃহৎ পুরীর খোপে খোপে খাপ্

খাইয়া যাওয়া মানুষগুলা নেহাৎ বেচারীর মতো ঘুমাইয়া পড়ে···তখন যেন ভারী অবাক লাগে।···অন্ধকারের রাজধানী ···শুধু অরুণেন্দুর খিলবন্ধ কপাটের গায়ে সরু একটু আলোর রেখা···দীর্ঘদিনের রোদ বৃষ্টি সহা পুরনো কাঠে ফাট্ ধরিয়াছে হয়তো, তাই এই ধরা পড়িয়া যাওয়া অরুণেন্দুর।···হেমলতা থাকিতে—স্বাস্থ্যহানির অজুহাত দেখাইয়া ছেলের এই রাত-জাগার বিপক্ষে বিরক্তি প্রকাশে কসুর করিতেন না। "সারা দিনে যে ছেলের দু'মিনিট বিশ্রাম নাই, রাত্রিতে দুইদণ্ড নিশ্চিন্তে না ঘুমাইলে শরীর তার টিকিবে ক'দিন?···এত কিসের গল্প যে সারাদিনে ফুরায় না?"...মা, তাই এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিতেন....বিদ্রূপ করিবার সম্পর্ক যাহাদের, তাহারা আরো অনেক কিছু বলিতে ছাড়েনা···শুনিতে শুনিতে সৃষ্টিছাড়া অলকা পরিহাস রসাস্বাদনের পরিবর্ত্তে গুম্ হইয়া যায়· মুখ রাঙা করিয়া 'ফিট্' হইয়া পড়ে।···

কিন্তু অনিরুদ্ধ জানে অরুণেন্দুর এই রাত্রি জাগরণ দাম্পত্য লীলার সাক্ষ্য নয়....ঘণ্টা দেড়েক আগেও অলকার চাপাকান্নার ফোঁসফোঁসানি শোনা গিয়াছে।···চাপাকান্নার ফোঁস্ফোঁস্ আর অপমানের জ্বালা মিশানো ক্ষুব্ধ অভিমানের মৃদু গর্জ্জন।...

অরুণেন্দু রিসার্চ্চ করিতেছে—মনোবিজ্ঞানের।···সুস্থ সক্ষম যুবতী নারীকে নারীত্ব আর মাতৃত্বের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলে কি কি প্রতিক্রিয়া হয় তাই লইয়া

াবেষণা।…বৈধব্যের নিরুপায় সংযম নয়, স্বাস্থ্যবান স্বামীর নিকটসান্নিধ্যের মাঝখানে তপ্তশয্যার একাংশে পড়িয়া অর্থহীন উপবাস।…অরুণেন্দু অবশ্য বুঝ্‌ দিয়াছে—হিতোপদেষ্টার ছদ্মবেশে।….বলিয়াছে—'মাতৃত্বের আস্বাদ পাইতে গিয়া মিথ্যা কতকগুলা দায়ীত্ব বাড়াইয়া লাভ কি—দাম্পত্য সুখের মাঝখানে—কণ্টক সৃষ্টি করিতে?…এই তো বাড়ী, এই তো ছেলেদের ভবিষ্যৎ, আগাছার চারা বাড়ানো ছাড়া আর কিছু নয়!'…কথার জালে বিভ্রান্ত অলকা কি বড় রকমের একটা প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিয়াছিল?….হয় তো তাই।…সেই বোকামির খেসারত জোগাইতেছে আধখানা রাত অবধি বাজে আবদারের ছুতায় কাঁদিয়া কাটিয়া তর্জ্জন করিয়া।

কপালে হাত বুলাইয়া আর মাথায় বাতাস দিয়া অনেক কষ্টে তা'কে ঘুম পাড়াইতে হয় অরুণেন্দুর।…তারপর আলো জ্বালাইয়া লিখিতে বসে।…লেখে সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা। মানুষের মনের তলায় অন্ধকার গুহা আর নিবিড় অরণ্যের গভীরতায় যে সব অসঙ্গত ইচ্ছা আর কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জিত বাসনা লুকানো থাকে সেইগুলাকে টানিয়া বাহির করে। আর অবলীলাক্রমে লিখিয়া যায় পাতার পর পাতা। …মানুষের স্বাভাবিক স্বভাবের যে আবার এমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক সব মানে থাকে—তুচ্ছতম আচার আচরণ হাবভাব, অভ্যাস আর মুদ্রাদোষের পর্দ্দায় ধরা পড়িয়া যায়

মনের ফটোগ্রাফ, একথা কি আগে জানিত অরুণেন্দু? মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা করার আগে?

তা' শুধু জানিয়াই ক্ষান্ত নয়—দেশসুদ্ধ লোককে ডাকিয়া জানানোর সখ তা'র। তাই গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়া পাতার পর পাতা লিখিয়া চলে। অনেক যুক্তি আর অনেক উদাহরণের সাহায্যে জেরবার করিয়া ছাড়ে মানুষের বেচারা মনকে। সভ্যতা সম্ভ্রম, আবরণ আর আব্রুর লেশমাত্র সম্মান রাখেনা।

অনিরুদ্ধ এই বই লেখার খবর রাখে।

লুকাইয়া গোয়েন্দাগিরি করিয়া নয়, অরুণেন্দুর ইচ্ছাকৃত অবহেলার সুযোগে। নিজেই একদিন সে ছোটভাইকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—অনু, তুই তো বাঙলা সাহিত্যে ওস্তাদ আছিস দেখ্ তো ভাষাটা বেশ জুৎসই হচ্ছে কি না। আমার আবার বাঙলায় ভাব প্রকাশটা সব সময় ঠিক আসে না। না হয় দু'একটা কলমের আঁচড় টাঁচড় দিয়ে দিস—

কলমের আঁচড় না দিক্, কিছুটা দেখিয়াছিল অনিরুদ্ধ।

হয়তো বা এতদিনে সেজদার স্ফূর্ত্তির উৎস আবিষ্কার করিয়াছে সে। স্ফূর্ত্তির উৎস—অরুণেন্দুর মতো লোকের—নিজের মধ্যেই সঞ্চিত থাকে। স্ফূর্ত্তির জন্যেই স্ফূর্ত্তি—মানসিক প্রফুল্লতা বজায় রাখিতে অপরের দরজায় হাত পাতিতে হয় না।

মনস্তত্ত্বের জটিল তথ্যগুলা জানিয়া ফেলিয়া পৃথিবীটা যে এদের কাছে হাল্কা আর বাজে হইয়া গিয়াছে।—ম্যাজিকে

মূল কৌশলটা জানিয়া ফেলিলে যাদুকরের লোমহর্ষক খেলাটাও যেমন হাস্কা আর বাজে ল্যাগে।

খড়, মাটি, রং আর রাঙতা, আলাদা করিয়া বিশ্লেষণ করিতে বসিলে যেমন দেবীপ্রতিমা সম্বন্ধে জ্ঞানটা স্পষ্ট হইলেও শ্রদ্ধাটা অস্পষ্টই হইয়া আসে—গোটা মানুষটাকে বিশ্লেষণ করিয়া করিয়াই বোধ করি শ্রদ্ধাটা ইহারা নিঃশেষ করিয়াছে।···হৃদয় বৃত্তির কোনো বৃত্তিটাই এদের কাছে সিরিয়াস নয়। প্রেম ভালবাসা স্নেহ মমতা তো দূরের কথা—উন্মত্ত শোকের ভিতর হইতেও হয়তো বারোআনা ভেজাল বাহির করিয়া ছাড়িবে।···

তাই হয়তো বা বড়রকমের একটা নিষ্ঠুরতা করিতেও এদের বিবেকে বাধেনা—গর্হিত একটা কিছু করিয়া বসিলেও অপরাধ বোধের ভারে পীড়িত হয় না।···গর্হিত কাজ করা—আর গর্হিত ইচ্ছাকে অনেক কষ্টে চোখ রাঙাইয়া দাবাইয়া রাখা—দুইয়ের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য হয়তো খুঁজিয়া পায় না।

·

অথচ মজা এই—অরুণেন্দুর উপর তেমন রাগ আসে না, যতটা আসে আচারআচরণনিষ্ঠ অমূল্যর উপর। মেজদাকে দেখিলে যেন হাড়পিত্ত জ্বলিয়া যায়। কিন্তু আর যাই হো'ক চরিত্র হিসাবে অমূল্য লোকটা যে খাঁটি সে কথা তো অস্বীকার করা চলেনা!

কিম্বা এক হিসাবে অরুণেন্দুও অর্থাটি নয়।

মীনার ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িলেও হয়তো লজ্জা পাইবে না, বিচলিত হইবে না, গোপন করিবার জন্য খুব বেশী তোড়জোড় করিবে না। সপ্রতিভ স্বীকারোক্তিতে হাসিয়া উড়াইয়া ঘটনার গুরুত্বটা লঘু করিয়া দিবে মাত্র। যেন বিশেষ একটা থিয়োরি প্রমাণ করিতে—পরীক্ষা বস্তু হিসাবে একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে অনায়াসেই ব্যবহার করা চলে।··· ছলে বলে অথবা কৌশলে কাছাকাছি আটকাইয়া রাখিতে পারিলেই হৃদয় জয় করা যায় কি না—স্ত্রীচরিত্রের এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করাটাই যেন মস্ত একটা দরকারি কাজ।

অপরাধ বোধ না থাকিলে গোপনতারই বা কি আছে?

এই তো সেদিন—স্বাভাবিক ভাবেই মীনার নূতন ফ্ল্যাটের নম্বরটা অনিরুদ্ধকে জানাইয়া রাখিয়াছিল। ডাক্তার মানুষ—আচমকা দরকার পড়া অসম্ভব নয়। পড়িলে—সন্ধান যদি আর কোথাও না মেলে ওখানে নিশ্চিত মিলিবার সম্ভাবনা।

নিজের নামে আলাদা একটা টেলিফোনই তো রাখিয়াছে—সেই প্রকাণ্ড ম্যান্‌সনটার আটাশ নম্বর ফ্ল্যাটে।

রাত্রির প্রহরী সচেতন করিতেছে···গম্ভীর বিলম্বিত ছন্দে।

এক, দুই, তিন।···প্রকৃতির আইন অমান্য করার বিরুদ্ধে আদেশবাণী। জাগিয়া থাকার সময় নয়···জাগিয়া থাকা

মাইন নয়।...ঘুমন্ত প্রকৃতিকে চোখ মেলিয়া দেখা সভ্যতা সঙ্গত নয়।

কিন্তু ঘুমাইতে যাওয়ার সাহস হয়না যে।

সামনের দোতলা বাড়ীটা সারারাত্রি অমন নিঝুম মারিয়া আছে কেন? লম্বা লম্বা জানলাগুলা যেন নিঃশব্দ প্রেতমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে।...হয়তো যে মুহূর্ত্তে অনিরুদ্ধ ঘুমের সাধনা করিতে বিছানায় আশ্রয় লইতে যাইবে—তখনি—সেই মুহূর্ত্তে প্রেতমূর্ত্তির স্তব্ধতা ভাঙিয়া যাইবে।...খোলা জানলার পথ পাইয়া সত্মজ্বালা বিদ্যুতালোকের লম্বা একটা রেখা হঠাৎ ছাড়া পাওয়া শিশুর মতো ঝাঁপাইয়া পড়িবে রাজপথের উপর।...

আর খোলা জানলার মাঝখানে—আলোর পর্দ্দার গায়ে 'সিলুয়েট্' ছবির মতো ফুটিয়া উঠিবে একটী কৃশছায়া।...কিন্তু না, দুই চোখ জ্বালা করিতেছে, সমস্ত শরীরে অদ্ভুত একটা ক্লান্তি।...অরুণেন্দুর দেওয়া ঘুমের ওষুধটা খাইলে বাকী রাতটুকুর মতো সুরাহা হওয়া অসম্ভব নয়।

কতক্ষণই বা!

বিছানায় আশ্রয় লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশের ঘর হইতে নীলিমার কোলের ছেলেটা পরিত্রাহী চেঁচানো সুরু করে। বহুসন্তানবতী বেচারী নীলিমা সারাদিন এতগুলা ছেলেমেয়ের পরিচর্য্যা আর সংসারের গাধাখাটুনী খাটিয়া এত কাহিল হইয়া ঘুমায় যে মরামানুষের মতো দেখিতে লাগে।

কোলের ছেলের চাহিদা মিটানোর অবস্থা থাকে না।

কিন্তু প্রাপ্য পাওনা সে ছাড়িবে কেন? ঠেলাঠেলি আর ডাকাডাকিতে যখন কুলায় না তখন দুই হাতে মায়ের চুল টানিয়া ছিঁড়িতে থাকে আর প্রাণপণ বিটকেলে চেঁচায়।

মিনিট দুই পরেই অমূল্যর বাজখাঁই গলার প্রচণ্ড ধমক শোনা যায়। না ছেলেকে নয়—ছেলের মাকে। মেয়েমানুষের এমন সর্ব্বনাশা ঘুম দেখিলে না কি ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া যায় তার। সমস্তদিন যারা 'গা গড়াইয়া' কাটায় তাদের আবার এতো আলস্য কিসের? সারাদিন অফিসের খাটুনি খাটিয়া আসিয়া রাত্রে যে দুইদণ্ড নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পায়না, তা'র আবার কী সুখে বাড়ী আসা। এমন বিরক্তিকর অবস্থার চেয়ে ফুটপাথে পড়িয়া থাকাও শ্রেয়।

ত্রস্ত নীলিমা ঢুলিতে ঢুলিতে ছেলের বায়না মিটাইবার চেষ্টা করে···মিথ্যা প্রলোভনের প্রতিশ্রুতি দিয়া উপস্থিত বিপদের হাত এড়াইতে চায়, কিন্তু কেবলমাত্র নীলিমারই নয়—অমূল্যরও ছেলে সে! বাগ মানানো সোজা নয়। চীৎকার উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে।

শেষ পর্য্যন্ত যখন নীলিমাও প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিয়াছে অথচ ছেলের কান্না থামার লক্ষণ নাই, ক্রন্দনরত ছেলের "গলাটা টিপিয়া শেষ করিয়া দিবার" সাধু সংকল্প ব্যক্ত করিয়া বালিশ বগলে লইয়া বীরদর্পে নীচে নামিয়া যায় অমূল্য, বৈঠকখানা ঘরে শুইতে—ফুটপাথের প্রায় কাছাকাছি যেটা।···

খোকার কান্না বন্ধ হওয়ার পরই সুরু হয় সেজকাকার কাসি।···

অসম্ভব অবাক লাগে।···প্রত্যেকটা মানুষ একেবারে আলাদা আলাদা রকমের, অথচ পরস্পরের গায়ে আঁটিয়া বসিয়া এত কাছাকাছি আছে কেমন করিয়া? অনিরুদ্ধর মতো বেমানান খাপছাড়া তো কেউ নয়!···তিন পুরুষের আগের গাঁথা এই ভাঙা ইটের খাঁচায় প্রত্যেককে আঁটে, বেমালুম কুলাইয়া যায়।

অহরহ সংঘর্ষের মধ্যেও কোথাও যেন একটা মিল আছে।

অহরহ ভাবিয়া ভাবিয়া যতই পরিপক্ক হোক অনিরুদ্ধ, তবু এখনো ছেলেমানুষ আছে। সবটা তলাইয়া বুঝিতে বাকী। মিলটা কোথায় ধরা পড়েনা ওর চোখে।

মিল আছে—ক্ষুদ্রতায়, সংকীর্ণতায়, আদর্শহীন উদ্দেশ্যহীন জীবন যাত্রায়—নিছক জৈব প্রেরণায় টিঁকিয়া থাকার অন্ধ চেষ্টায়।

তেইশ

—ছুঁড়ির চিঠিপত্তর কিছু আসেনি ?—হ্যাঁরে মাধি !

মেয়েকে ডাকিয়া এই সভ্য প্রশ্নটী করেন প্রতিমা।

মাধবী কিছুদিন যাবৎ ক্রমান্বয়ে এই প্রশ্নটীর উত্তর দিয়া আসিতেছে। বলাবাহুল্য—নেতিব্যঞ্জক। আজও উত্তরের পরিবর্ত্তন হয়না। প্রতিমার অজ্ঞাতসারে চিঠিপত্র তো দূরের কথা, বাড়ীতে একটা মশামাছি ঢুকিতে সাহস করে কিনা সন্দেহ, তবু এ প্রশ্ন করাই চাই প্রতিমার।

পুরী যাওয়ার নাম করিয়া সেই যে গেছে মীনা, আজ অবধি পাত্তা নাই। না মানুষ না চিঠি। এতেও যদি প্রতিমা অধৈর্য্য না হ'ন তো হইবেন কিসে ? রক্তমাংসের মানুষ বৈ সত্যি কিছু আর পাথরের প্রতিমা ন'ন তিনি।

অবশ্য আসল কথা এখন আর বুঝিতে বাকী নাই প্রতিমার।...পুরী যাওয়াটাওয়া সব ছল। আসলে সেই সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা যে মাষ্টারণী ছুঁড়িকে লইয়া ভাগিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের আর কিছু নাই।...সন্দেহ অবশ্য আগেই ছিল কিন্তু 'দিদিমণি' যে মেয়েদুটির ইষ্টদেবীর বাড়া কিনা, তাই স্পষ্ট বলিতে সাহস পান নাই। নাও এখন বোঝো !

চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া প্রতিদিন আরো বেশীরকম নিঃসন্দেহ হইতে থাকেন প্রতিমা, আর অবহিত হইতে দেন মেয়েদের।...যাক্ তা'তে ক্ষতি নাই, ভালই যে—প্রত্যক্ষ কোনো ক্ষতি না করিয়া মানে মানে আপদ বিদায় হইয়াছে, কিন্তু দরজায় চাবি লাগাইয়া ঘর আটক রাখিয়া গেল কোন হিসাবে? এ সব বদমাইসী নয়?...ইচ্ছা করিলেই তো ঘরখানায় আরো বেশী ভাড়ার ভাড়াটে জোটানো যাইত। একখানা ঘর যে এখন ভগবানের চাইতেও দুর্লভ সে কথা তো কারো অজানা নয়।

প্রতিমা অবশ্য বলিয়াছিলেন—কি ছাই পাঁশ আছে বের করে নিয়ে মেয়েদের ঘরের একপাশে জড়ো করে রাখি, কোনোকালে যদি আসে নেবে—

সুরেশবাবু রাজী হন নাই।

যতই হোক কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান তাঁর আছে, হেস্তনেস্ত না দেখিয়া কিছু করা ঠিক নয় তা' বোঝেন।

মাধবী কিন্তু বিশ্বাস করেনা।

দিদিমণি যে অকারণে অকস্মাৎ এমন কলঙ্কের বোঝা বহিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেন এ চিন্তা অসহ্য।...রূঢ় সংসারের রুক্ষ আবহাওয়ার মাঝখানে দিদিমণি যেন তাদের পক্ষে একটু স্নিগ্ধছায়া, সেটুকুও সরিয়া যাইবে এই বা কোন ন্যায়সঙ্গত বিধান? সত্যই কি মীনা অতি সাধারণ অর্থে আরো অনেকের

মতো পলাইয়াছে ? আর কোনো অর্থ করা যায় না যায় ?···কিন্তু এতই বা অবিশ্বাসের কি আছে ?···প্রতিমার দৃষ্টিভঙ্গীতে যে ব্যবহার ঘৃণ্য অরুচিকর আপত্তিজনক, অপরদৃষ্টির আলোক-পাতে সেইটাই কি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারেনা ?

প্রেমাস্পদের জন্য ঘর ছাড়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আবহমানের ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে, কিন্তু ইতিহাস তো তাহাদের গায়ে কালি ছিটায় নাই। প্রেমকে জীবনে স্বীকার করিয়া লইবার মতো সাহস যদি কারো থাকে সেটা কি এতই খারাপ ?···নিশ্চেষ্ট প্রেম, এবং রাত্রির ঘুম আর দিনের প্রশান্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার মতো নিরুপায় কামনায় বিকৃত অসুস্থ মনই কি ভালো ?

স্পষ্ট করিয়া সবটা ভাবিতে না পারুক মাধবী, এমনি অনেক কথাই ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে আজকাল।

ওদিকে মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবিতেছেন প্রতিমা নিদারুণ ভাবে।

সুরেশবাবুর অবসরমুহূর্তগুলি ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিমার অনুযোগ আর অনুরোধের ভারে। সাধারণতঃ খাওয়ার সময়টাই পাকড়াও করা যায় বেশী—রাত্রের খাওয়ার সময়। দিনের বেলা—কাজের অজুহাতে বাড়ীছাড়া হওয়া চলে, কিন্তু এ সময়টা নেহাৎ বেপোট সময়। অনেক বিষয়ে স্বামীকে ভয় করিয়া চলিলেও—এ বিষয়ে প্রতিমার সাহসের অভাব দেখা যায়না।

উত্যক্ত সুরেশবাবু গোটা কয়েক 'পাত্র'র সন্ধান আনিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে নিতান্তই অপাত্র। আজও ওই গোছের একটা কথায় প্রতিমা বিরক্ত হইয়া বলেন—যত রাজ্যের অখদ্যে সম্বন্ধ তোমায় কে দেয় জানি না, ও সব চলবে না। মানুষের মতো একটা পাত্তর জোগাড় করতেই হবে বলে দিচ্ছি, এই শ্রাবণ আমি পার হ'তে দেব না, দেবই বিয়ে।

—দেবই বিয়ে!...সুরেশবাবু প্রায় খিঁচাইয়া ওঠেন—পাত্তর যেন গাছের ফল। পাবো কোথায়? তুমি এমন করছো যেন বিয়ের বয়েস পেরিয়ে গেছে ওর। ষোলসতের বছরের মেয়ের বিয়ের কথা আজকালকার দিনে ভাবেই না কেউ।

প্রতিমাও বিরক্তকুঞ্চিত মুখে বলেন—এদিকে মেয়ে নিজেই যে ভাবতে আরম্ভ করেছে। শেষে ওই মাষ্টারণীর মতো কেলেঙ্কারী করবে সেই ভালো?

মা হইয়া বলিতে পারা অসম্ভব না হইলেও বাপের পক্ষে এরকম ইঙ্গিত সহ্য করা শক্ত। সুরেশবাবু চাপা ক্রুদ্ধস্বরে বলেন—তার মানে? তুমি যে যা মুখে আসে তাই বলছো? ছেলেমানুষ বেচারা—খাটিয়ে খাটিয়ে শেষ করছো ওকে, বিয়ে দিচ্ছিনা সে তো তোমারই সুবিধে।

প্রতিমার মুখে যে বিশেষ একটী শ্লেষের হাসি খেলিয়া যায়, সে কেবল বাঙালীর মেয়ের মুখেই সম্ভব। কণ্ঠেও তাহারই আভাস আনিয়া বলেন—ও! তা'হলে আমার

ওপর দরদ করেই মেয়ের বিয়ের দেরী? 'ছেলেমানুষ বেচারা'! বলি—মেয়ের হাবভাব দেখেছো কোনো দিন? কোথায় মন, কোথায় মাথা, যা বলি তাই ভুলে যাচ্ছে, আমি বলি কেন! চব্বিশঘণ্টা তোমার মেয়ের ওই মিত্তিরবাড়ীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার কি দরকার আমায় বলো। মাঝরাত্তিরে ওদের ওই বই লিখিয়ে ছোঁড়াটা কোন্ রাজকার্য্যে বারাণ্ডায় ঘুরে বেড়ায়? তোমার মেয়েরও অর্দ্ধেক রাতে উঠে জানলায় দাঁড়িয়ে কি ইষ্ট-সিদ্ধি হয় শুনি? আমি রোজ রাত্তিরে—বিষ্টি হ'লে ছাট্ আসবে বলে জানলা বন্ধ করে দিয়ে আসি—রোজ খোলা চাই কেন?

সুরেশবাবু স্তম্ভিত বিস্ময়ে ক্ষীণভাবে বলেন—এই গরমে জানলা না খুলে শোবে কি করে? তাই—

—ও তুমি যতোই বোকা সাজো, খোকা তো নও? বোঝনা কিছু? উপরোউপরি প্রতিদিন লক্ষ্য করছি আমি।

সুরেশবাবু আর কিছু বলেন না।

বলিবার অবস্থা থাকেনা বলিয়াই হয়তো বলেন না।··· ব্যবসার বাজারে তীক্ষ্ণদৃষ্টির গুণে লাভ লোকসানের হিসাবে আধ পয়সার এদিক ওদিক হইতে দেন না, কিন্তু ঘরের ভিতর তাঁরই চোখের সামনে এমন বেহিসাবি ব্যাপার ঘটিতেছে চোখে পড়ে না? আশ্চর্য্য!

কিন্তু প্রতিমাকেও অবিশ্বাস করা চলে না। অন্য বিষয়ে —এখনো এবয়সেও—ভিতরে ভিতরে অবিশ্বাস করা হয়তো

অসম্ভব নয় কিন্তু প্রতিমার বিষয়বুদ্ধির উপর অনাস্থা করিবার উপায় নাই।

দুধের বাটী হাতে মাধবী দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া পাথরে পরিণত হইয়াছে।...হয়তো অনুভূতির সামান্যতম অংশও বজায় থাকিলে সেই আর একদিনের মতো অজ্ঞান হইয়া যাইত, লজ্জায় অপমানে লাঞ্ছনার ভয়ে।...কিন্তু অজ্ঞান হইয়া যাওয়ার মতো জ্ঞানও আর নাই তাহার।...শুধু দুধের বাটীটা যে দেওয়া দরকার এইটুকুই প্রস্তরীভূত মনের ভিতরেও জাগিয়া থাকে।...থাকিয়া লাভ কি? পা না চলিলে?

পরের দিনই সুরেশবাবু আবার এক সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করেন—তার সঙ্গে হাজির করেন আরো একটী খোসখবর।... বৃষ্টিতে ভেজা ছাতাটা জল ঝরিতে দিয়া গায়ের জামা খুলিতে খুলিতে প্রতিমাকে ইসারায় ডাকিয়া চুপি চুপি বলেন—কাণ্ড শুনেছ?

—কি কাণ্ড?

প্রতিমা উৎসুক উত্তেজনায় কাছে সরিয়া আসেন।

—এদের দিদিমণি—মানে এই মীনা না কি—এর ব্যাপার জানলাম আজ।

—ব্যাপার আর কি, সেই ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছে কোথাও—

—আরে না না, সে হলে তো তবু ভালো ছিল। এই মিত্তির বাড়ীর সেজ ছেলে—ওই যে গো যেটা ডাক্তার—ওকে নিয়ে গিয়ে বড়বাজারের ওদিকে ফ্ল্যাট ভাড়া করে রেখেছে। আমাদের শশাঙ্ক বললে—

প্রতিমা প্রায় জ্ঞান হারাইয়া বসিয়া পড়িয়া বলেন—হ্যাঁগো সে কি কথা? বলো কি?

—আর বল কি! ছ'বেলা যাওয়াআসা খাওয়াদাওয়া সেখানেই চলছে বেশ। ডুপ্লিকেট্ একটা সংসার আর কি!

—কি সব্বনেশে কথা! হ্যাঁগো ঘরে যে রাণীর মতো বৌ! ওই বৌ থাকতে ওই কাল পেঁচি?...হুঁঃ, এইবার বুঝেছি, সেই মাধীর অসুখের দিনই ভাবভঙ্গীটা কেমন কেমন লেগেছিল আমার।...দেখেছো তো, সাধে কাল বলছিলাম—মিত্তির বাড়ীর ছেলেগুলো তা'হলে সব বয়াটে। যার বিয়ে থা' হয়েছে সেই যদি এমন কুকাণ্ড করে, তবে আর ওই আইবুড়ো বাউণ্ডুলেকে বিশ্বাস কি? এইবেলা সাবধান না হলে—

মিনিটখানেক গুম্ হইয়া থাকার পর—বোধকরি সাবধানতার আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়ার অভাবে সুরেশবাবু বলেন—আজ থেকে তুমি ওদের ঘরেই শুয়ো না হয়।

—ওদের ঘরে?...এটা যে প্রতিমা ভাবিয়া দেখেন নাই এমন নয়—কিন্তু স্বেচ্ছায় এতবড় কৃচ্ছ্রসাধন স্বীকার করিয়া লওয়া?...আমতা আমতা করিয়া বলেন—সে আমি শুলাম

না হয়—কিন্তু খোকার বিছানাপত্তর সব এঘরে—তাছাড়া ও ঘরটা ঠাণ্ডা, খোকাটার সর্দ্দিফর্দ্দি না হ'লেই বাঁচি।···সে যা হোক—পাত্তরের কি হ'ল বলো।

অনেক কথা অনেক আলোচনাই হয়। শেষ পর্য্যন্ত একটা সিদ্ধান্তও হয়।···তবে সকল কথার মাঝখানে প্রতিমার মনের ভিতর ডাক্তার-ঘটিত ব্যাপারটা যেন ঠ্যালা দিতে থাকে।··· এতদিন আছেন এপাড়ায় কিন্তু মিত্তির বাড়ীর সঙ্গে মেলামেশা বিশেষ কিছুই নাই। সহরের স্বধর্ম্ম। অথচ ওদের মেয়েদের কাণে কথাটা তুলিয়া আসিতে না পারা পর্য্যন্ত স্বস্তিই বা কোথায়?···আচ্ছা মেয়েটাকে তো এত খারাপ লাগিত না, বরং সভ্যভব্য গেরস্থর মেয়ের মতই মনে হইত, দেখিলে তো 'দিদিমণি' বলিয়া বিশ্বাসই হইত না—দেখিতেও ছোটখাটো, বয়েস বোঝা শক্ত ছিল। ভিতরে ভিতরে এতবড় শয়তান!

মানুষ চিনিবার জো নাই।

আসল কথা—মীনার সম্বন্ধে জোর গলায় যতই অপপ্রচার করুন প্রতিমা, তবু মনের ভিতর একেবারে নিঃসংশয় ছিলেন না, তাই এত স্পষ্ট আর নির্লজ্জ প্রমাণ পাইয়া রীতিমত শক্ পাইয়াছেন।

চব্বিশ

ভাবিতে বসিলে মীনা নিজেই কি দস্তুরমতো শক্ পাইত না?

নিজের যথার্থ অবস্থাটা পৃথকভাবে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে কি হইত বলা কঠিন, কিন্তু উপলব্ধি করিবার অবস্থাই যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে সে। তটিনীদের কাছ হইতে বিদায়টুকু পর্য্যন্ত না লইয়া চোরের মতো পলাইয়া আসাটাই তো তার স্নায়ুর পক্ষে যথেষ্ট, সাগরের কথা সাহস করিয়া ভাবিতেই পারে নাই। কিন্তু ট্রেনে সারাক্ষণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যবহারের পর হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া অরুণেন্দু যখন একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক ব্যবহার করিয়া বসিল তখন যেন একেবারে 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' গোছের হইয়া পড়িল বেচারা।

অরুণেন্দু বাড়ী যাইবে—মীনার গন্তব্যস্থলও একই জায়গায়, কাজেই একই ট্যাক্সীতে ওঠার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি করার কথা ওঠেনা, বিশেষ তো মোটঘাটের বালাই যখন নাই।...কিন্তু অরুণেন্দু যে তাহাকে এখানে এভাবে আনিয়া ফেলিতে পারে সে কথা কি সে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল?... ভাবা সম্ভব ছিল?

তার ভাগ্যে অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হইতে পারিল কেন? সত্যই কি অরুণেন্দুর এত প্রয়োজন পড়িয়াছিল মীনাকে? কে এই প্রশ্নের উত্তর দেয় মীনাকে? অরুণেন্দুর ব্যবহারে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বোঝা যায় না।...তা'ছাড়া-আর কি হইতে পারে? কি হওয়া সম্ভব? নানা প্রশ্নে অহরহ ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে কিন্তু উত্তর খুঁজিয়া পায় না।

অবশ্য কেউ আটকাইয়া রাখিলেই আটক থাকিতে হইবে এমন কথা শাস্ত্রে নাই। নেহাৎ কিছু অসূর্য্যম্পশ্যাও সে নয়।...অরুণেন্দু তো তাহাকে হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই, যাইবার সময় তালাও লাগাইয়া যায়না...তবে? ইচ্ছা করিলেই তো চলিয়া যাওয়া যায়।

যায় তো নিশ্চয়ই, ইচ্ছাও হয়, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্য্যকরী হয়না কেন?

কেন মীনা এখানে পড়িয়া আছে? এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পল্লীতে, ততোধিক অপরিচিত অসংখ্য প্রতিবেশীর বিরাট ফাঁদের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া কিসের আশায় দিন গণিতেছে?

অরুণেন্দুর প্রয়োজনের সত্যতা যাচাই করিতে?

কি লাভ? কিসের প্রত্যাশা?...একজন বিবাহিত ভদ্রলোকের প্রয়োজনের তাগিদে—সে তাগিদ যতই তীব্র হোক—নিজেকে মাটি করিয়া বসিবে কোন বুদ্ধির হিসাবে?... আচ্ছা, ইচ্ছা করিলে কি এখনো ফিরিয়া যাওয়া যায় না?

সাগরের চাওয়াটা কি এত শীঘ্র অবাস্তব হইয়া যাইবে? পাগল! এখন ফিরিয়া গেলে—সাগর যদি তাহার গায়ে মুঠা মুঠা ধূলা না দেয় তো সেই ঢের।···

স্কুলের মেয়েরা কি শুনিয়াছে? কেন শুনিবে না? তটিনী কি সুবাদে তার কুকীর্ত্তি গোপন করিবে? তটিনীর ভালোবাসার যথেষ্ট প্রতিদান তো সে দিয়াছে!···কিন্তু এতই বা হতাশ হইবার কি আছে? সত্যই তো আর খারাপ হইয়া যায় নাই মীনা! অরুণেন্দু আসিলেই একবার ভালোরকম বোঝাপড়া করিয়া আজ সে চলিয়া যাইবে।

এত দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া স্থির থাকে কিন্তু অরুণেন্দু আসিলেই কি যে গোলমাল হইয়া যায়! সে আসে যেন বন্যার জলের মতো—না রাখে প্রশ্নের অবকাশ, না রাখে দ্বিধার।···খুসির প্রাচুর্য্যে টগবগ করিতে করিতে আসে, লাফাইয়া লাফাইয়া সিঁড়ি ওঠে, ঘরে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই দরাজ গলায় হুকুম দেয়—কোথায় কি আছে শিগগির বার কর মীনারাণী! সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে, উঃ পাকস্থলী সুদ্ধু হজম হয়ে গেল!

এ কথার উত্তরে হাসিয়া ফেলিয়া—পাকস্থলী হজম করা ডাক্তারী শাস্ত্রের নীতি কিনা জিজ্ঞাসার পরিবর্ত্তে মীনা কি ক্রুদ্ধমুখে বলিবে—আমাকে এই দণ্ডে মুক্তি দাও, তোমার মতলব বুঝিতে আর বাকী নাই আমার?

বলা হয় না।

পুরুষ মানুষ—যদি অতিবড় শত্রুও হয়—ক্ষুধার আবেদন জানাইলে মেয়েমানুষ স্থির থাকিতে পারেনা। আর এ তো—কি যে সেইটাই অবশ্য ঠিক নির্ণয় করিতে পারেনা মীনা। সত্যই কি অরুণেন্দুর প্রেমে পড়িল সে ? যতটা রাগ হওয়া উচিৎ ততটা হয়না কেন ? কেন দিনের সমস্ত সময় সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হইয়া থাকে সেই একটী উদ্দাম পদধ্বনির আশায় ? সময়ের তো স্থিরতা নাই, যখন ইচ্ছা যতবার ইচ্ছা আসে অরুণেন্দু। যখনি আসে নানা প্রয়োজনীয় জিনিস বহিয়া। দেখিতে দেখিতে রীতিমত একটী সংসার গড়িয়া উঠিল প্রায়।···পাঁচজনে খাইয়া শেষ করা যায় না এতো জিনিস আনিয়া হাজির করে, আর নূতন নূতন খাদ্যবস্তুর ফরমাস করিয়া যায়।

কোন্ মেয়েমানুষ সেই জিনিসের সুব্যবস্থা না করিয়া পারে ?

এই তো আজ কাট্‌লেট খাইবে হুকুম দিয়া একরাশ চিংড়িমাছ কিনিয়া দিয়া গেছে।···ছোট্টমতন একটা বাচ্চা চাকর মীনার সারাদিনের সহচর। ফরমাস খাটিতে ওস্তাদ, খুঁটিনাটি সকল কাজে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এবং রান্নাঘরে নূতন নূতন খাদ্যতালিকার আমদানী দেখিলে উৎসাহের আর শেষ থাকেনা তা'র।···আকারে যতটা ছোট আহারে ঠিক ততটা নয়, জিনিসের বাড়াবাড়িতে খুসী বৈ আঁপত্তির ভাব দেখা যায় না।···

সময়ের স্থিরতা নাই বলিয়াই হয়তো যখন তখন পরিচিত গাড়ীর হর্ণটা কাণে আসে, কাজের তৎপরতা বাড়িয়া যায়, কিন্তু সব সময় যে ঠিক হয় এমন নয়।··· বার দুই অমনি ভুল করিয়া নীলমণিকে তাড়া লাগাইয়াছে মীনা। আবার বলিতেই নীলমণি হাসিয়া উঠিয়া বলে—মার খালি এক ভাবনা 'ওই বাবু আসছে', 'ওই বাবু আসছে', 'নীলমণি হাত চালা'—নীলমণি কি কুড়ে না কি? হক কথা বলো তুমি? ওই ও রাস্তায় বামুনদের বাড়ী থাকতে গিন্নীমা বলতো—'নীলু যেন নাট্টু ঘোরে—খুব ভালোবাসতো গিন্নীমা।

—তবে সে বামুন বাড়ী ছাড়লি কেন রে নীলু?

মীনা সহাস্য প্রশ্ন করে।

—ওঃ—নীলমণি অবজ্ঞাভরে ঠোঁট উল্টায়—শুধু ডাল আর ভাত দেয়, খেতেই দেয় না কিছু।

—তা'হলে তো খুবই ভালবাসে রে? কি বলিস্ নীলু?

নীলু অপ্রতিভ ভাব গোপন করিতে গম্ভীর হয়—তেমনি সংসারের লোকের কথাও ভাবো মা, সে কি একটা আধটা লোক তোমার মতোন? মেলাই লোক, যত জিনিস আসবে সব ফুরিয়ে ফেলবে। কোথায় পাবে বলো?

মীনা সকৌতুক হাস্যে বলে—খুব তো পণ্ডিতের মতো কথা, তবে ছাড়লি কেন? নাই বা খেতে দিল? সত্যিই তো, সব ফুরিয়ে গেলে কোথায় পাবে?

নীলুর আর যাই হোক কথার ষ্টক সংক্ষিপ্ত নয়, মীনার কথার উত্তরে তাড়াতাড়ি বলে—সে'নয় আমি বুঝলুম, আমার ঠাকুমা বুড়ি বুঝবে ? বুড়োমানুষ বুদ্ধিসুদ্ধি তো আর নেই বেশী !···সেবারে যখন দেশে গেলুম—বুড়ি বললে—'নীলু তোর হাড় পাঁজরা বেরিয়ে গেছে, তুই আর কলকেতায় যাসনি।' অনেক ভুলিয়ে মুলিয়ে তো এসেছি—এবারে য্যাখন যাবো মোটা হয়ে না গেলে ? ঠাকুমাই বলে দেছল—'যে বাড়ীতে নোক কম সেই বাড়ী কাজ করবি নীলু, নইলে খেটে মরে যাবি।'

ছেলেটার পাকা ধরণের কথা শুনিতে শুনিতে হাসি চাপা দায়।

—আমিও তো তোকে খাটিয়ে মারি নীলু !

মীনা হাসিতে থাকে।

নীলু তাড়াতাড়ি জিভ কাটে—ও কথা বলোনা মা, পাপে ডুববো। তোমার কি মায়া দয়ার সীমে আছে ?

—নেই বুঝি ?···আচ্ছা হ্যাঁরে নীলু, বাবু খুব খারাপ লোক না ?

—ধেৎ, মা যে কি বলে !···বাবু সম্বন্ধে মন্তব্যটা যে পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয় সেটুকু বুঝিবার মতো বুদ্ধির অভাব নাই নীলুর।···

হাতের কাজ চালাইতে চালাইতে 'বাবু' সম্বন্ধে কি ভাবিতে থাকে কে জানে, তবে কিছুক্ষণ পরে সজল চক্ষে অনেক

অশ্রুসিক্ত কোটা পিঁয়াজগুলি আনিয়া মীনার রান্নার জায়গায় ঢালিয়া দিতে দিতে বলে—আচ্ছা মা, বাবু এখেনে থাকে না কেন ?

এতটুকু ছেলের মনে এ প্রশ্ন উঠিবে এটা বোধকরি ভাবিয়া দেখে নাই মীনা। এক সেকেণ্ড চুপ থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলে—এখানে থাকতে যাবে কি জন্যে রে ? তুই তো আচ্ছা বোকা ! এটা কি বাবুর বাড়ী ? আলাদা বাড়ী আছে।

নীলমণি নিজস্ব বিজ্ঞভঙ্গীতে বলে—আচ্ছা বুঝলুম যেন আলাদা বাড়ী আছে, তা' তুমি কেন এখেনে একলা থাকো ? এতবড় মেয়ে—শ্বশুরঘর না করলে নিন্দে হয় না তোমাদের ? আমাদের ওখানে—বুঝলে মা—একটা কৈবত্তদের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছেলো বলে—এমন পিটুনী দিলে তাকে, উঃ মাগো ! মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে গেল শেষটা, তখন রেহাই দেয়।

মীনা শঙ্কিত ভাবে বলে—কে মারলে রে ?

—কেন ওই মেয়েটার বর। সে কি মার যদি তুমি দেখতে মা, মেরে একেবারে তূলোধুনে দিলে।

—এই বুঝি তোদের দেশের ব্যবস্থা রে নীলু ? তা'হলে আমাকেও তো মেরে তূলো ধুনতে হয় ?

নীলু হাসিয়া ফেলে—য্যাঃ ! ভদ্দরঘরে কখনো মারে ? ছোটলোকের কথা বাদ দাও মা, মার খেয়ে খেয়ে ওদের হাড়

শক্ত।...আর তাও বলি—বাবুর মতোন মানুষ হয়? এই যে তুমি—শ্বাশুড়ী ননদের সঙ্গে বনে না বলেই তো ভেন্ন হয়ে এসেছ? কই একটা কথা বলে বাবু? বরং ভাত কাপড় দে' পুষছে। আমাদের গাঁয়ে হলে—হুঁঃ।

গাঁয়ের উপর কেবল মাত্র একটী 'হুঁঃ'র সাহায্যে যতটা তাচ্ছীল্য প্রকাশ সম্ভব তা' করিয়া নীলু পূর্ণোদ্যমে আদা বাটিতে বসে।

বোঝা গেল—মীনার এই একা থাকা সম্বন্ধে নীলু ইতিপূর্ব্বে অনেক কিছু ভাবিয়াছে এবং যাই হোক একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

কিন্তু নীলুর মতো অবোধ কিছু আর সকলে নয়।

এই প্রকাণ্ড বাড়ীর অধিবাসিবর্গ—তা' তা'দের মধ্যে মাদ্রাজী, মারাঠি, সিন্ধি আর গুজরাটী যে জাতিই থাক, মীনার সম্বন্ধে যা ধারণা পোষণ করে, সেটা আর যাই হোক নীলুর সিদ্ধান্তের অনুরূপ নিশ্চয়ই নয়।

এভাবে থাকার নূতন আর কি অর্থ হয়?

ভাত কাপড় দিয়া পুষিবার আর কোন কারণ থাকিতে পারে?

সাগরের মাসি-পিসি দলের 'কথা' শুনিবার মতো অপমানের ভয়ে এই সম্মানের জীবনই কি বরণ করিয় লইল মীনা?

... ...

—এই নাও তোমার ষ্টোভ। অসময়ে এসে চা চাইলে কিন্তু রাগ করতে পাবে না আর।

পিছন হইতে অরুণেন্দুর উৎফুল্ল স্বর বাজিয়া ওঠে।

হাসিবে না—সাড়া দিবে না—গম্ভীর হইয়া থাকিবে—সে সব সংকল্প কোথায় গেল মীনার? সাড়া না দিয়া পারে কই?

তবু অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবেই বলে—রাগ কোনোদিন করেছি?

—আহা দেখিয়ে না হোক, মনে মনে?…এই ষ্টোভ… এই সসপ্যান…এই নাও তোমার কাপড় শুকোতে দেবার ক্লিপ্, আর চুড়িতে আটকে রাখার জন্যে সেফটিপিন।…

—চুড়িতে?

মীনা অবাক না হইয়া পারে না।…চুড়িতে আটকাবার স্পেশাল কোনো পিন্ আছে না কি?

—ওই তো লো। চুড়ির মধ্যে ডজন খানেক সেফ্‌টিপিন্ আট্‌কে ঘুরে বেড়াতে দেখি যে মেয়েদের।

—মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার জ্ঞানটা বড্ড বেশী।

—বেশী আর কই?…অরুণেন্দু বেতের মোড়াটা টানিয়া বসিয়া পড়ে, একমিনিট চুপ থাকিয়া বলে—জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টা করছি।

—কেন? কি দরকার আপনার?

—কি দরকার? সত্যি তাও ভাবি মাঝে মাঝে।...
রুণেন্দু ঈষৎ অন্যমনস্কের মতো বলে—নতুন কোনো তথ্য
ক দিতে পারবো? কি জানি।

—আপনার কথা সব সময় বোঝা শক্ত।

—বোঝা শক্ত, না? লোকটাও ভয়ানক শক্ত বুঝলে,
ক্রমশঃ টের পাবে।...বাপ নীলমণি! সিগারেট আনো—যাও
ছুটে যাও।

নীলমণি টাকা হাতে ছুটিয়া যায়। এ কাজটী রোজই
করিতে হয় তাহাকে।

সিগারেট আনার মধ্যে উৎসাহ তো সোজা নয়! বাকী
পয়সা ফেরৎ নেওয়ার পরিবর্তে সবটা বখশিস্ করিয়া দেওয়ার
মতো এমন দিলদরিয়া বাবু আর কবে দেখিয়াছে নীলমণি?

ষ্টোভ জ্বালার প্রয়োজন হয় না, উনন জ্বলন্ত মুখে অপেক্ষা
করিতেছিল...চায়ের জল চড়াইয়া আসিয়া মীনা আঁচলে
ভিজা হাত মুছিতে মুছিতে বলে—আচ্ছা—সিগারেট কি
আপনার সত্যিই রোজ ফুরিয়ে যায়?

—যায় না? তা'হলে আনতে দিই কেন?

—দেন কেন আপনিই জানেন, কিন্তু ফুরোয় না আমি
জানি। আজও ফুরোয়নি।

—এতটাই যদি জানো, তবে নীলমণিকে বিদায় করি
কেন তা'ও অবশ্য বুঝবার মতো বুদ্ধি আছে তোমার, কি
? কিন্তু দুঃখের বিষয় লাভ হয়না কিছু, বখশিসের লোভে

এত তাড়াতাড়ি এসে হাজির হয় ছোকরা, সন্দেহ হয় আগে থেকে কিনে রাখে কিনা!...

—অতটা সন্দেহ না করলেও চলবে। কিন্তু কি লাভের আশা করেন, আমায় বোঝাতে পারেন?

—তা'হলে একটা শ্লেট পেন্সিল আনতে হয়।...তুমি যে ভাবে কোমর বেঁধে লাভ লোকসানের হিসেব বুঝতে এসেছো—তা'তে অঙ্ক কসে বুঝিয়ে দেওয়াই ভালো।

—আচ্ছা সব সময় সব কথাই যদি এভাবে হেসে উড়িয়ে দেন, আমার কি উপায় হয় বলুন তো? এইভাবেই থাকবো আমি?

—পাগল হয়েছো! ওইভাবে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মানুষ? এসো ভালোভাবে বোসো—বলিয়া অদূরবর্ত্তী আর একটা বেতের মোড়াকে হাত বাড়াইয়া টানিয়া আনিয়া নিজের নিতান্ত কাছে রাখে অরুণেন্দু—বোসো সুস্থির হয়ে লক্ষ্মীমেয়েটী!

মীনা হতাশভাবে হাসিয়া ফেলে।

—আপনার স্বভাবটী ঠিক আমার বন্ধু তটিনীর মতো। সেও কোনো কথা সিরিয়াস ভাবে নেবে না, আপনার মতো হেসে উড়িয়ে দেবে। আপনাদের দু'জনের বিয়ে হলে চমৎকার মিল হতো।

মিনিটখানেক ধূমকুণ্ডলীর পানে চাহিয়া থাকিয়া অরুণেন্দু হঠাৎ যেন সচকিত হইয়া বলে—তুমি এখনো নেহাৎ ছেলেমানুষ

আছো মীনা, মনস্তত্বের কিচ্ছুটী বোঝনা। এক স্বভাবের দু'জন লোকের চমৎকার মিল হয়—এই তোমার ধারণা? সম্পূর্ণ ভুল। বিপরীত স্বভাব বলেই না স্ত্রী পুরুষে প্রেম সম্ভব? তা' নইলে পুরুষে পুরুষে আর মেয়েতে মেয়েতে ভালবাসা হ'ত!

মীনা হাসি চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টায় মুখ ফিরায়।

—হাসছো? তা' হাসো, কিন্তু ভেবে দেখো সত্যি বলেছি কি না। যা আমার আছে তাই যদি তোমার কাছে পেতে হয়—আমার স্বভাবেরই পুনরাবৃত্তি যদি তোমার মধ্যে দেখি—তবে আর আকর্ষণের কি থাকলো?···এই দেখ আমি চঞ্চল অস্থির ছটফটে, তাই না তোমার মতো শান্ত শিষ্ট মেয়েটীকে ভালো লাগে।

'ভালো লাগে'! শুধু ভালো লাগা—যেমন মীনার ভালো লাগে ভালো লেখকের লেখা একখানি ভালো বই। তার বেশী কিছু নয়।···হঠাৎ সমস্ত মনটা বিরক্ত বিকৃত হইয়া ওঠে কেন? কি আশা করিতেছিল মীনা? ভালোবাসার কথা তুলিবে অরুণেন্দু? ··এ বিরক্তি কি আশাভঙ্গের ক্ষোভ? কিন্তু কেন? কেন কুমারী মীনা একজন বিবাহিত পুরুষের ভালোবাসা প্রত্যাশা করিবে? সাগরকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়া শেষে কি ডোবার জলে ডুবিয়া মরিবার সখ হইল তা'র?···কখনই নয়—শুধু মীনার চক্ষুলজ্জার ফল। অভদ্রতা করিতে পারে না বলিয়াই ভদ্রতা করিতে গিয়া এতদূর আসিয়া

পড়িতে হইয়াছে।…এমনি নানা কথা মনে উদয় হওয়ার ফলেই বোধহয় কণ্ঠস্বর রুক্ষ কঠিন শোনায়।

—কিন্তু আপনার এই ভালোলাগা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।…দয়া করে এর থেকে মুক্তি দিন আমায়। কেলেঙ্কারীর একটা সীমা থাকা উচিত।

অরুণেন্দু যেন আছাড় খায়।

এমন রূঢ় অভিযোগ কি মীনার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিয়াছিল সে? অভিভূত হরিণী কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ফাঁদে পা দেয় সেইটাই না লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল তা'র?… সত্য বলিতে কি, ভালোবাসা তো দূরের কথা ভালোলাগা নিবেদন করিবার মতো সৌখিন ইচ্ছাও তার নিজের দিক হইতে ছিলনা। মীনা তো তার হিসাবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মাত্র।… রূপগুণের আকর্ষণ থাক না থাক, অপরপক্ষের ভালোবাসার আকর্ষণ না থাক্, কেবলমাত্র সাহচর্য্য—অনাত্মীয় পুরুষের সাধারণ সাহচর্য্য—সে সাহচর্য্য যদি অন্যায় বা অনিয়মের মধ্যেও আসে—কুমারী হৃদয়ের ভালোবাসা উন্মেষের পক্ষে যথেষ্ঠ কি না এই না তা'র প্রশ্ন! উত্তরও তো একরকম মিলিতে শুরু করিয়াছিল, হঠাৎ আবার গোলমাল হইতে চায় কেন?

পুরু চশমার ভিতর হইতে গভীর দৃষ্টির সন্ধানি আলোক মীনার মুখের উপর স্থির হইয়া পড়ে।…না, বড় বেশী

উত্তেজিত দেখাইতেছে মীনাকে, কিন্তু কেন? ভিতরে ভিতরে এতো অধৈর্য্য হইয়া উঠিল করে? এতদিন অধ্যয়নের পর আগাগোড়া বইখানার ভুল অর্থ করিয়া আসিতেছে অরুণেন্দু?

মনস্তত্ত্বের চর্চ্চা করিলেই যে সব সময় সব তত্ত্ব মনে পড়ে এমন নয়—দুর্ব্বল স্বভাবের লোক যদি চেষ্টা করিয়া কঠোর হইতে যায়, খাপছাড়া ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠে সে, এটা বোধকরি অরুণেন্দুর মনে পড়ে না।

—অবস্থাটা তা'হলে তোমার খুবই কষ্টকর লাগছে?

—কেন নয়?…মীনা প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলে—কেন তুমি আমাকে এভাবে এনে রেখেছ? কেন পুরী থেকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে এখানে ফেললে? কেন স্পষ্ট করে বল না, কি তোমার মতলব?

—মতলব? আসলে সত্যিই কি কোনো মতলব আছে আমার? ঠিক বুঝতে পারছি না, আচ্ছা ভালো করে ভেবে দেখি—

হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়ায় অরুণেন্দু। আর কোনো কথা বলে না।

আলনা হইতে হ্যাট্‌টা টানিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায়।

… … …

সত্যই চলিয়া গেল!

মীনা যেন অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে।

অরুণেন্দুকে দেখিলে কি শয়তান বলিয়া মনে হয়?···খুসিতে উপ্‌চানো মুখটা কেমন অদ্ভুত তাড়াতাড়ি ম্লান হইয়া গেল!

—বাবু কোথা গেল মা?

চমক ভাঙিল নীলমণির ঠেলায়। সিগারেট হাতে হাঁপাইতেছে।···

—আবার কি আনতে গেল শুনি?

—বাবু চলে গেছেন নীলু।

—চলে গেছে? ইস্ চলে গেলেই হ'ল আর কি! বলোনা মা, কোথা গেল।

—কেন জ্বালাচ্ছিস নীলু, বলছি চলে গেছেন।

—'কেন জ্বালাচ্ছিস নীলু?' বলি—চলে যে গেল, অতগুলো কাটলেট ভাজা তবে খাবে কে শুনি?

কাটলেট!

মনে পড়িতেই সমস্ত শরীরে যেন শক্ লাগে।···পড়িয়া রহিল!—সমস্ত দুপুরের অবসর সময়টা বসিয়া বসিয়া অনেক যত্নে অনেক মমতায় নিপুণভাবে যেগুলি গড়িয়া রাখিয়াছে অরুণেন্দুর নিতান্ত প্রিয়বস্তু জানিয়া।···কেটলিতে চায়ের জল ফুটিতেছে না?···

মীনা অসময়ে অমন বেখাপ্‌পা কথাগুলা বলিয়া না বসিলে—এতক্ষণ এখানে আনন্দের মেলা বসিতে পারিত!

অরুণেন্দু একাই মজলিস জমাইতে পারে···কিছু না, শুধু নীলুকে উপলক্ষ্য করিয়া হাসির বান ডাকাইয়া দেয়।··· রন্ধন এবং সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনকারিণীর তারিফ করিয়া স্বর্গে তুলিয়া দিতে ওস্তাদ।··· যত্ন করিয়া খাওয়ানোর মধ্যে যে এতো তৃপ্তি আছে একথা কি আগে জানিত মীনা ?

কিন্তু নীলু এসব সৌখিন চিত্তবিলাসের ধার ধারে না, ক্রুদ্ধমুখে বলে—ধন্যি মেয়ে যা হো'ক, মুখে তালাচাবি দিয়ে বসে আছো—মানা করতে পারোনি ?

—মানা করলে শুনবে কেন রে ?

—না শুনবে না ? চালাকি ! মানা করে দেখেছিলে একবার ? ভুলে মেরে দিয়েছো তাই বলো ?···আমি টের পেলে ঊই সিগারেটের দোকান থেকে ছুট দিয়ে গাড়ীর পেছন পেছন দৌড়তাম···হায় হরি ! তোমাকে এই বলে রাখছি মা ও কাট্‌লেট ভাজা তুমি একলা খেয়ো—আমাকে দিওনা খবরদার। মনিষ্যির মুখের 'সামিগ্রী' খাবো ? পেটে তো আমার রাক্ষস ঢোকেনি।···

নীলুর ক্রুদ্ধ ভাষণের মধ্যে আর যাই হোক আন্তরিকতার অভাব যে নাই, মুখ দেখিয়াই মালুম হয়।

পঁচিশ

হেমলতার 'বাণপ্রস্থ গ্রহণের' পর হইতে সুরেখাকে আর দেখি নাই।

মনে করা স্বাভাবিক যে নিঃশব্দে সমস্ত অপরাধের গ্লানি মুখে মাখিয়া সংসারের কাজের অন্তরালে আপনাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া চোরের মতো কাল কাটাইতেছে—কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপারটা ঘটিয়াছে অন্য।

ঘটনাচক্রের আবর্ত্তন···তা নয় তো হেমলতার চৌকাঠ ডিঙানোর সঙ্গে সঙ্গেই সুরেখার মার মৃত্যুসংবাদ বহিয়া 'তার' আসিবে কেন?···অসুখ নয় বিসুখ নয়, সহজমানুষটা ধড়ফড় করিয়া মারা গেল!···অকস্মাৎ ফেল্ করিয়া বসিবার মতো বিশ্বাসঘাতক হার্ট লইয়া সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলে তিনি, এ খবর তো জানা ছিলনা সুরেখার। এ রকম হঠাৎ খবরে দুরন্ত শোকের সাধারণ প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া একেবারে যেন পাথরের মতো স্তম্ভিত হইয়া গেল বেচারা।

এ বাড়ীর কেউই অবশ্য তখন বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলনা তা'র উপর, তবু এহেন শোকের ব্যাপারে অতি কঠোর মনও কিছুটা গলে। কিন্তু ভিতরের ধারণা চাপিয়া রাখার চেষ্টা কেউই করেনা।

সুরেখার 'তেজ অহঙ্কারের ফল যে হাতে হাতে ফলিয়াছে'—এ কথা আর কে না বলিয়া ছাড়িবে?...তবে 'বাসন্তী কোম্পানী'র কাছে শুনিয়া আসা তিক্ত মন্তব্য যে মনোজও উদ্গীরণ করিয়া বসিবে—এটা বোধকরি সুরেখার কল্পনার বাহিরে ছিল।

আজই যাত্রার দিন। যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে একটা ছোট সুটকেসে গোটাকয়েক শাড়ী ব্লাউজ ভরিয়া লইতেছিল সুরেখা, শোকাচ্ছন্ন ম্লানমুখ, চোখের কোণে কালি।...সমস্ত ভঙ্গীতে ক্লান্তির আভাস।

মনোজ আসিয়া ঘরে ঢোকে।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঢুকিতে প্রথমটা একবার ইতস্ততঃ করে। শোকসংবাদের পর এই প্রথম দেখা।...ভয়ানক একটা কান্নাকাটির ভয়ে—টেলিগ্রামখানা অমূল্যর হাতে ফেলিয়া দিয়া সেই যে উধাও হইয়াছিল এই দেড়দিনের মধ্যে আর উঁকি মারে নাই। কয়েকখানা বাড়ীর পরেই মনোজের এক দূর সম্পর্কের মাসীর বাসা। এই বাসাটাই মুখচোরা মনোজের গোপনদুর্গ। বাড়ীতে কোনো আত্মীয় কুটুম্বের আবির্ভাব ঘটিলেও মনোজ পলাইয়া আত্মরক্ষা করে।

দূত মারফৎ কান্নার অভাব এবং যাত্রার আয়োজন বার্তা শুনিয়া সাহসে ভর করিয়া আসিয়াছে।...ইতস্ততঃ করার আরও একটা কারণ বাড়ীর সাম্প্রতিক আবহাওয়া। হেমলতার যাওয়া এবং তস্য কারণটা মনোজের বুকে যেন পাহাড়

চাপাইয়া রাখিয়াছে, সরস যৌবনের উচ্ছলতা কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে ইদানীং।

তাই সহজ ব্যবহারে প্রাণখোলা ভাবটাও তেমন নাই।

সুরেখার নিতান্ত কাছে যাইতে সাহস হয়না কেন ?

ওকে অমন দূরের মানুষ লাগিতেছে কেন ?···কি আছে ওর মুখে ?···মনে হয় যেন মনোজ কোনোদিন ওর নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবে না।···তবু তু'একটা কথা না বলিলেই বা কেমন হয় ?···বার তুই সারা ঘরটা পায়চারি করিয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া হঠাৎ—বোধকরি সান্ত্বনার উপযুক্ত কোনো কথা খুঁজিয়া পাওয়ার অভাবেই বলিয়া বসে—পাপের ফল আছেই, বাড়ীর গিন্নীর নিঃশ্বাস পড়া—একি সোজা কথা ?

সুরেখা যেন বিদ্যুতাহতের মতো মুখ তোলে।

মুহূর্তের জন্য মনোজের কুণ্ঠিত দৃষ্টির সামনে গভীর কালো চোখ তুটি তুলিয়া ধরে···মুহূর্ত্ত মাত্রই···তার পরই হাতের কাজে মন দেয়।

বলিয়া ফেলিয়াই মনোজ একটু কুণ্ঠিত বোধ করে।··· কথাটা যে ঠিক সান্ত্বনার মতো শুনিতে হইল না, একথা বলিবামাত্রই ধরা পড়ে। কিন্তু এইমাত্র নাকি নানাবিধ শাস্ত্রীয় যুক্তি আর প্রবাদ বচনের দোহাই-পাড়া মন্তব্যের জোরে সুরেখার মাতৃবিয়োগের কারণ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া আসিয়াছে—তাই ওছাড়া আর কথা জোগায় না।···

একটু উসখুসের পর কথা পাল্টায় মনোজ—তুমি কার সঙ্গে যাচ্ছো ?

সুরেখা অবশ্য প্রথমে আশা করিয়াছিল মনোজই লইয়া যাইবে, কিন্তু মনোজের অনুপস্থিতির ঘটা দেখিয়া আর কোন আস্থা রাখে নাই।

সকালেই কথাটা উঠিয়াছে—বাবুদের খাওয়ার সময়।…

জ্ঞানদা নূতন-পাওয়া গৃহিণীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গম্ভীরচালে বল্লেন—এমন খবর শুনে চুপ করে থাকা তো ঠিক নয়, বৌটাকে তো পাঠিয়ে দেওয়া উচিৎ?…কিন্তু নিয়ে যায় কে?…

অপূর্ব্ব আহার ভুলিয়া অবাক হইয়া বলে—কে নিয়ে যাবে মানে? মনো যাবেনা?

—মনু? তা'হলেই হয়েছে!

পিসিমা বিনাযুক্তির সাহায্যে কেবলমাত্র অধরোষ্ঠের ভঙ্গীতে প্রস্তাবটা বাতিল করিয়া দেন।

—তা'হলেই হয়েছে মানে? ওর কি একটা কর্ত্তব্য নেই? শ্বশুরেরও শুনছি অসুখ—

—অসুখ বিশেষ কিছু নয়—আচম্‌কা শোকটা পেয়ে—মনু গিয়ে আর করবেই বা কি? মরণকালে মাগী মেয়ে-জামাইকে দেখতেও পেলোনা —আহা! এক সন্তান,—একেই বলে কপাল! এখন আর যাওয়া না যাওয়া সমান।

—তা'হলে বৌমাও যাবেন না?

—নাতবৌ অবিশ্যি যাবে একবার, বাপকে না দেখে থাকতে পারবে না—আর পাঁচটা ছেলেপুলে যখন নেই, তবে নিয়ে যাওয়ারই সমস্যা।

—মনোকেই যেতে হবে।

বলিয়া অপূর্ব্ব আহারে মনোনিবেশ করে।

কিন্তু 'রায়' দিলেই তো হয়না, অমূল্য তবে আছে কেন? পাশে বসিয়া এতক্ষণ নীরবে একটী বড় মাছের কাঁটাকে জব্দ করিতেছিল—এইবার অপূর্ব্ব থামিতেই চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বলে—যেতে হবে বললেই হ'ল? যাওয়া সম্ভব কিনা দেখ? কলেজ কামাই করে—

—ভারী তো কলেজ, মাসের মধ্যে বাইশ দিন তো দেখি বন্ধ। স্ট্রাইক আর হরতাল, সাধারণ ছুটি আর বিশেষ ছুটি, এই নিয়েই তো মাসকাবার।

—সে আলাদা কথা! তাই বলে—পড়ার ক্ষতি করে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সপেক্ষ মত দিতে পারিনা আমি।

—মত দিতে পারোনা? বাঃ! তা'হলে কি হবে? কামাইটাই বড় হ'ল?

অমূল্য শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলে—না হবে কেন? কই এতই যদি কর্ত্তব্যজ্ঞান, নিজেই যাওনা—রেখে এসো অফিস কামাই করে? সে তো—পৃথিবী উল্টে গেলেও হ'বার জো নেই।

অপূর্ব্ব আর কিছু বলে নাই, শুধু যাইবার সময় জ্ঞানদাকে

বলিয়া গিয়াছে—পিসিমা, বৌমাকে তৈরি হয়ে থাকতে বোলো, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব খড়গ্‌পুরে।

'ছেলেপুলের মা নয়—সোমত্ত বৌ নিছক একলা খুড়শ্বশুরের সঙ্গে বিদেশ যাইবে'—এটা জ্ঞানদার হিসাবে রীতিমত অস্বস্তিকর। কিন্তু নেহাৎ অপূর্ব্ব বলিয়াই বোধকরি ব্যাপারটা তুলিয়া ঘোঁট পাকাইতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছেন।...

মনোজ অবশ্য জানে সবই, তবু কথা বলার জন্যই প্রশ্নটা করা।

সুরেখা সংক্ষেপে বলে—বড়কাকা রেখে আসবেন।

যাক বাঁচা গেল, সুরেখা তবে মনোজের যাওয়ার জন্য দাবীর ভাব মনে পোষণ করে না। হাঁপ ছাড়িয়া বলে—গিয়েই চিঠি দিও। একলাইন অন্ততঃ পৌঁছন খবর—

সুটকেস বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল সুরেখা। খাটের একটু কাছে সরিয়া আসিয়া প্রায় হাসির মতো সুরে বলে—কি দরকার? বড়কাকাই তো ফিরে আসবেন খবর নিয়ে।

সহজভাবে কথা কহিতে দেখিয়া মনোজের সাহস বাড়ে। সেও অল্প হাসিয়া বলে—তা' হোক তবু চিঠি তো দেবেই?

—তা'রই কি দরকার আছে কিছু?

—দরকার নেই? বাঃ!...মনোজ আর যুক্তি খুঁজিয়া পায় না।

—ভেবে দেখেছি দরকার সত্যিই নেই, ও ঝঞ্ঝাট থাক।

—চিঠি লেখাটা তোমার কাছে ঝঞ্ঝাট তা'হলে? বেশ 'দিও না, আসবে কবে?' না কি তারও দরকার নেই?

—আছে কি না সেইটাই হিসাব করে দেখবো।...হয়তো ভালোই হ'ল—মিত্তিরবাড়ীর গণ্ডীর বাইরে গিয়ে হিসেব করা সহজ হবে।...

সুরেখা ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, মনোজ চুপচাপ বিছানায় পড়িয়া থাকে।...সুরেখা হঠাৎ এমন বদলাইয়া গেল কেন?...মনোরম সেই দিন রাত্রিগুলি কি আর মনে পড়েনা ওর? হাসি আনন্দ আর স্বপ্নের মধ্যে কাটাইয়া দেওয়া হালকা হাওয়ার মতো দিনগুলি?...কি দরকার জীবনের মাঝখানে জটিল কতকগুলা সমস্যার সৃষ্টি করিয়া জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবার?...সুরেখা এত অবুঝ কেন? মেয়েমানুষের এতো বড়ো বড়ো চিন্তা কেন?...আর কিছুই নয়, বাহাদুরী দেখানো।

নির্ঝঞ্ঝাটে থাকিতে পাওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছা করিয়া ঝঞ্ঝাট বাড়ানোকে বাহাদুরী দেখানো ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারেনা মনোজ।

ছাব্বিশ

হেমলতা নাই, সুরেখা নাই, মনে হওয়া অসম্ভব নয় অনেকটা জায়গাই বুঝি খালি হইয়া গেছে। কিন্তু কিছুই চোখে পড়েনা, একত্রিশ জনের ভিতর হইতে দুইজন সরিয়া যাওয়ায় কি আসে যায়? কতটুকু তফাৎ?...শুধু ঠাকুরঘরের দরজাটা ন'গিন্নীর ভোরবেলার দায়সারা জপ-আহ্নিকের পর হইতে সন্ধ্যার প্রদীপ দেখানো পর্য্যন্ত শিকল বন্ধ পড়িয়া থাকে, কেউ খোলেনা।...শুধু তিনতলায় পূবের বারান্দায় ভালো-ভালো রঙিন শাড়ী ব্লাউজ আর চওড়াপাড় তোয়ালে শুকাইতে দেখা যায় না।...বিশেষ সেই স্থানটীতে কার যেন একটা ছেঁড়া গেঞ্জি দীর্ঘকাল ঝুলিয়া মরিতেছে—তুলিবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেনা।

সংসারচক্র নিজের স্পীডে ছুটিতে থাকে...মুহূর্ত্তের জন্যও থামে না। থামিয়া গিয়া দুইদণ্ড ভাবিতে বসে না।...থামিবে কেন? থামিবার সুযোগ পাইল কখন? জ্ঞানদা আর বাসন্তীর মতো বাড়তি টায়ার তো সর্ব্বদাই মজুৎ থাকে, থাকে ইন্দুপ্রভার মতো পেট্রলট্যাঙ্ক।...

থামেনা...বিশ্রী একটা কর্কশ আওয়াজ উঠিতে থাকে।

কলকব্জার ফাঁকে ফাঁকে স্ক্রু নাট আর বোল্টুর খাঁজে খাঁজে ধূলো ময়লা আর তেলকালি জমিয়া বসিলে যেমন রুক্ষ ঘ্যানঘেনে শব্দ উঠে পুরনো যন্ত্রে।···

তিনবছরের কোলের মেয়েটাকে ট্যাঁকে করিয়া বাসন্তী সর্ব্বত্র ফোঁপোরদালালী করিয়া বেড়ায়। উঠিতে বসিতে ভালোমানুষ নীলিমাকে ঠোকোর মারে, আর অলকার পায়ে পায়ে ঘুরিয়া মন জোগাইতে চেষ্টা করে।···হেমলতা থাকিতে যখন বড়গাছে নৌকা বাঁধা ছিল—বাসন্তীর প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র ছিল অলকা, কিন্তু গাছ ভাঙ্গিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখিয়া খুঁটি হিসাবে চাপিয়া ধরিয়াছে অলকাকেই। ···অলকা যতই তেজী অহঙ্কারী গতরকুড়ে আর মুখরা হোক, সে যে বড়মানুষের মেয়ে—আর তা'র বরেরই যে রোজগার বেশী এটা তো মিথ্যা নয়।

মনজোগানোর চেষ্টাও যে সব সময় সফল হয় এমন নয়, খামখেয়ালী অলকার মন বোঝাই দায়।···কখনো—বাড়ীর অপর মেম্বারদের নিন্দা করিতে বসিলে মহোৎসাহে শোনে, রসালো টিকাটিপ্পনি করিতে ছাড়েনা, অন্তরঙ্গের মতো ব্যবহার করে বাসন্তীর সঙ্গে, কখনো—কারও বিষয় এতটুকু বেফাঁস মন্তব্য শুনিলেই বিরক্ত হইয়া বলে—'সর্ব্বদা পরনিন্দে আর পরচর্চ্চা, ভালোও বা লাগে! নিজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখ দিকি, চালুনি এসেছেন ছুঁচের ব্যাখ্যানায়।'···

তবু চেষ্টা ছাড়েনা!

মন ভালো থাকিলে—অলকা যে অক্লেশে বাসন্তীর হাতে ছ' পাঁচ টাকা হাতখরচা দিতে পারে, বাসন্তীর ছেলেমেয়েদের গায়ের ছেঁড়াজামা হঠাৎ নজরে পড়িলে—দরজী ডাকাইবার আলী-হুকুম দিয়া বসে, বাসন্তীর বর আসিলে—চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়া জামাইজনোচিত মর্য্যাদা রাখে, এসবও তো ভুলিবার নয় ?

অরুণেন্দু যে আজকাল 'বখিয়া' যাইতে বসিয়াছে—কাণাঘুসায় এমনি একটি খবর শুনিয়া অবশ্য খারাপ লাগে নাই তার, ভালই লাগিয়াছে বরং, 'বৌ অন্তপ্রাণ' বেটাছেলে দেখিলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালাকরে বাসন্তীর, তবু টাকাকড়ির বিষয়ে অলকার প্রাধান্য থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।

... ...

ইন্দুপ্রভা আর জ্ঞানদার অহরহ কলহ কিচিকিচিতে বাড়ীতে কাক চিল বসিতে পায় না। হেমলতার আওতারে থাকিতে—বড়সাহেবের নিন্দাবাদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যে একতাটুকু ছিল সেটুকুও ঘুচিয়া শুধু 'রণংদেহি'টাই কায়েম হইয়াছে।...নিজের জেদ কেউ একতিল ছাড়িতে রাজী নয়।...তুচ্ছ আহার আয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়।...

সেজকাকা প্রতিনিয়ত নিজেকে আরো বেশী পরাজিত আর আরো বেশী অপমানিত মনে করিয়া নিরুপায় গর্জ্জনে অতিষ্ঠ করিয়া তোলেন সকলকে, অকারণ অভিমানে ক্ষুধা-

হীনতার অজুহাতে উপবাস করিয়া মরেন, কাল্পনিক অবহেলার অজুহাতে ভাতের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাজারে গিয়া লুকাইয়া মুড়িমুড়কি চিবান, আর দৈবাৎ মন হালকা থাকিলে খবরের কাগজখানা হাতে করিয়া ছেলেদের কাছে আসিয়া বড়বড় চোখে প্রশ্ন করেন—কাগজ দেখেছো আজকের? ব্যাপারটা কি হচ্ছে বলো দেখি? ভারত তো স্বাধীন হয়ে গেল এঁ্যা? লীগ যদি যোগ না দেয় সম্পূর্ণ কংগ্রেসী গভর্মেণ্ট হয়ে গেলো তা'হলে কি বল? জিন্নার গায়ের জ্বালাটা দেখলে একবার?…পড়োনি? কি আশ্চর্য্য! ইমপর্টেণ্টগুলোই বাদ দাও—তো পড়ো কি?…আর একটী বচ্ছর—ব্যস, ভারতের চেহারা বদলে যাবে একেবারে…বিশ্বাস কোরছনা?… কিছুই হবে না?…কাগজ তা'হলে পড়ো কি করতে বলোতো?….পনেরআনা তো হয়েই গেছে, বাকী আর একটী আনা।…আঃ লীগ যদি এরকম বেয়াড়ামী না কোরতো—

হাত মুখের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় নীলিমার বেয়াড়া আবদেরে ছোটছেলেটাকে বাগে পাইলেই যেমন সায়েস্তা করিয়া ছাড়েন, পাইলে—রাজনৈতিক এই বেয়াড়া দলটাকে একেবারে সায়েস্তা করিয়া ভারতের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া ছাড়িতেন তিনি।…

মন খারাপ থাকিলেই সুর বদলাইয়া যায়, তীব্র মন্তব্য করিয়া বলেন—এদেশ আবার স্বাধীন হবে! মারো ঝাড়ু।…

অমূল্য ভারতের দুর্গতি অগ্রগতি লইয়া মাথা ঘামায় না···নিজের এলাকায় যাকে পায় ঝাড়ু মারিয়া বেড়ায়।

অপূর্ব্ব ঘড়ি রেডিও আর ষ্টোভ সারায়···অনিরুদ্ধ নিজেকে সংসারের মধ্য হইতে যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত রাখিয়া মোটাসোটা উপন্যাস লেখে, পাত্রপাত্রীর মুখে লম্বা চৌড়া কথা বসায়, আজগুবি আর অনাসৃষ্টি মতবাদ খাড়া করিয়া নিজের বিতৃষ্ণাকে রূপ দিবার চেষ্টা করে।···

বামুনঠাকুর জ্ঞানদার তীক্ষ্ণ সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়া নিয়মিত প্রথাতেই ঘী তেল চালডাল সরায়···সুখদা ঝি সুযোগ পাইলেই চাকর বসন্তর ঘরে গিয়া পান খায়।··· অলকার ফিট্ হয়···সাতমাসের মেয়ে কোলে নীলিমা নিয়মিত প্রথায় অরুচিতে শয্যা নেয়···বাড়ীর সকলে নিয়মিত প্রথাতেই ব্যাখানা করে···ছোটছেলেরা আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্যে ইন্দুপ্রভাকে 'বক দেখায়' আর হ্যাংলামী করে···ছোট ছোট মেয়েরা ঘরে খিল লাগাইয়া 'বৌ বৌ' খেলা করে আর গিন্নীদের অনুকরণে পাকা পাকা কথা শেখে।···

কোনো নিয়মেরই রদবদল নাই।

শুধু বেশীর মধ্যে—পাশের বাড়ীর যে ছেলেটার সঙ্গে শান্তি জানালায় দাঁড়াইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে কেবলমাত্র হাসির সাহায্যে ভাব করিয়া ফেলিয়াছিল—হেমলতার অনুপস্থিতির সাহসে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে।···জয়ন্তী, দিদির উপর বিগলিত সহানুভূতিতে লুকোচাপা শিখিয়া রীতিমত পাকিয়া উঠিয়াছে।···

উমাশশীর কথা অবশ্য ধর্ত্তব্য নয়—তবু সে-ই একদিন এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিল যেটাকে লোমহর্ষক বলিলেও সম্পূর্ণ বলা হয়না।... হেমলতার সঙ্গে পুরী যাইবার সমস্ত ঠিক সত্ত্বেও—হঠাৎ যাত্রার দিনই আচমকা এক অদ্ভুত শূলবেদনার কবলে পরিয়া উমাশশীর যাওয়া নাকচ হইয়া গিয়াছিল।

হেমলতা কি ভাবিয়া গেলেন কে জানে তবে বাড়ীর সকলে খুসী বই অখুসী হইল না। উমাশশীর মাথা পরিষ্কার নয় বটে, কাজের ব্যবস্থা নাই—তা' ঠিক, তবু গাধার মতো খাটিতে যে পারে সেটা তো ভুল নয়।...এই যে—নীলিমা বছরে বছরে আঁতুড়ে ঢোকে—একগঙ্গা টাকা খরচ করিয়া আঁতুড়ের ঝি রাখিতে হয়না—সে উমাশশী আছে বলিয়াই না। ....অথচ একবেলা খাওয়া আর একখানা ধুতি দিলেই পোষা যায় তা'কে। 'ভাত কাপড় দিয়া পুষিবার' খোঁটাটা থাকে ফাউ।

সংসারের এই ভাঙাকুলাটীকে হেমলতার টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়ার সপক্ষে বিশেষ সায় কাহারও ছিলনা।

সে যাই হোক—শূলবেদনার সত্যতা সম্বন্ধে যতই সন্দেহ থাকুক, গো-বেচারা ভালোমানুষ উমাশশীর দ্বারা যে আজকার ঘটনার মত ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিতে পারে এটা সকলেরই ধারণার বাহিরের ব্যাপার।

অথচ উমাশশীর হিসাবে—

যাক তার হিসাবে তো আর সংসার চলিবে না।

ব্যাপারটা এই—শেষ রাত্রে বাপের জন্য চায়ের জল বসাইবার সময় কেটলীতে দুই পেয়ালার জায়গায় ভুলিয়া তিন পেয়ালা জল দিয়া—নেহাৎ ফেলা যাইবার ভয়েই বাকীটুকু তাড়াতাড়ি কাঁসার গেলাসে ঢালিয়া খাইতে বসিয়াছিল উমাশশী।...রাত পোহাইলে যে একাদশী একথা অবশ্য তার অজানা নয়, কিন্তু রাত পোহাইতে যদি দু'চার মিনিট বাকী থাকে? একাদশী কি লাগিয়া যায় নাকি?...তা'ছাড়া জ্ঞানদা যে ঠিক সেই দিনই অত ভোরে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া আসিবেন এই বা কেমন করিয়া জানিবে বেচারা?

সুরেখা থাকিতে নিজের ভাবনা তো ভাবিতে হইত না উমাশশীকে।

ভাত আর জল অক্লেশে বাদ দিলেও এক গেলাস চায়ের অভাবে যে উমাশশীকে এত কাবু করিয়া ফেলে, মাথার যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তোলে, এটা সুরেখার কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াতেই না বাঁচিয়া গিয়াছিল।

তিনতলায় নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া সবচেয়ে বড়ো গেলাসটা ভরিয়া তার হাতে দিয়া বলিত সুরেখা—'চোখ-কাণ বুজে টুপকরে খেয়ে ফেলো দিকি লক্ষ্মী মেয়ের মতো। তোমার একাদশী হত্যার পাপটা বাপু আমার ভাগে থাকলো, নির্ভয়ে খাও তুমি।'

সুরেখা নাই, কিন্তু মাথার যন্ত্রণাটা তো আছে !'

পর পর দুইটা একাদশী দেখার পর বাধ্য হইয়াই না আজ রাত থাকিতে উঠিয়াছিল উমাশশী।

কাঁসার গেলাস এতো গরম হয় তাড়াতাড়ি খাওয়া শক্ত। আঁচলের খুঁটে বাগাইয়া ধরিয়া সবে মুখে তুলিয়াছে মাত্র, আর পিছন হইতে জ্ঞানদার আর্ত্তনাদ যেন উমাশশীর গায়ে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে।···শব্দেরও ধাক্কা আছে বৈ কি—ধাক্কা না লাগিলে ফুটন্ত চা-টা চলকাইয়া পড়িবে কেন পায়ের উপর ?

ঘুমে ম্যাজমেজে চোখ মুহূর্ত্তে বিস্ফারিত করিয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন জ্ঞানদা—ও কী হচ্ছে! ও কী হচ্ছে! ও সব্বনাশী আবাগী, ও কী হচ্ছে কী ?

বিস্ময়ের ধাক্কায় বোধকরি নূতন ভাষা জোগায় না তাঁর, একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন।···

ভোরবেলাতেই এমন একটা সমারোহের ব্যাপারে ছেলে-বুড়ার খুসীর আর অন্ত থাকে না। আটটার আগে যারা বিছানা ছাড়িয়া ওঠেনা তা'রাও উঠিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।···সেজকর্ত্তা সবেমাত্র দেয়ালের হুক হইতে বাজারের থলিটা নামাইতেছিলেন, জ্ঞানদার আর্ত্তনাদে ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসেন। জলের মতো সোজা ব্যাপার—বুঝিতে তিন সেকেণ্ডের মামলা। তবু মিনিট দুই চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া যেন সমস্তটা উপলব্ধি করিয়াছেন এই ভাবে—'এখন কতো অনাচার ঢুকবে সংসারে'—বলিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া যান।···

অমূল্য বাঘের মতো লাফাইতে থাকে···এবং এরকম মেয়েমানুষের দ্বারা যে সবই সম্ভব, সুযোগ পাইলে খারাপ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়, একথা জোর গলায় ব্যক্ত করিতে থাকে।··· অলকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া সরিয়া যায়, আর নীলিমা কেন কে জানে চোখ মুছিতে বসে—উমাশশীর কান্না দেখিয়া হয়তো।···

চায়ের গেলাস নামাইয়া রাখিয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া সেই যে কান্না সুরু করিয়াছে উমাশশী—না তুলিয়াছে মুখ, না দিয়াছে কথার উত্তর।···পায়ের ফোস্কার জ্বালাটাও হয়তো জোগান দিয়াছে চোখের জলের।···ছোট মেয়েছেলেগুলা এমন হাসাহাসি ঠেলাঠেলি সুরু করিয়াছিল যে তাদের একবার ধমক দিয়া থামাইতে হইয়াছে।···শুধু ন'গিন্নী বোধকরি জ্ঞানদার সহিত একমত না হওয়ার সিদ্ধান্তেই প্রতিবাদ করিয়া বলেন—তুমি অত লাফালাফি করছো ঠাকুরঝি, একাদশীতে চা আজকাল অনেক বিধবাই খাচ্ছে, বলে আরো কতো কি খাচ্ছে তা এতো শুধু এক ফোঁটা চা। তা'ও সত্যি বলতে তখনো দশমীর রাত পোয়ায়নি।

জ্ঞানদার বাক্যানল কিছুটা প্রশমিত হইয়া আসিতেছিল, ভ্রাতৃবধূর প্রতিবাদে দ্বিগুন জ্বলিয়া ওঠে।···অমন মেয়েকে যে পাঁশ পাড়িয়া কাটা উচিৎ, অথবা কুলার বাতাস দিয়া বার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে 'কিন্তু' করেন না।···

অপূর্ব্ব বাড়ী নাই, সুরেখার মাতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গত সন্ধ্যায় খড়গ্‌পুর গিয়াছে। আজ রবিবার সুবিধা আছে, মুখচোরা মনোজটাকে ঘাড় ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্যই আরো যাওয়া তার।

অরুণেন্দু উঠিয়া আসিয়াছিল, প্রকৃত ঘটনা না বুঝিয়াই—ইন্দুপ্রভা আর জ্ঞানদার চিরাচরিত কলহ ভাবিয়াই বিরক্ত ভাবে বলে—তোমরা কি আরম্ভ করলে বলোতো পিসিমা, মানুষকে একটু শান্তিতে ঘুমোতে দেবে না ?···বলিয়া আবার গিয়া গুছাইয়া শুইয়াছে।

শুধু আসে নাই অনিরুদ্ধ।

বোধকরি নির্লিপ্ত থাকিবার সাধনাতে নিজেকে কতটা পোক্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহারই পরীক্ষা করিতে।···কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর পাশ করিতে পারেনা।···জ্ঞানদা যখন ঘণ্টা-খানেকেরও উপর—নিজে ষোল বছর বয়সে বিধবা হইয়া কি কি কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া আসিয়াছেন—তাহার হিসাব দিতে দিতে তুলনামূলক সমালোচনা করিতে থাকেন এখনকার অনাচারী 'আহ্লাদে বিধবা'দের সঙ্গে, তখন হঠাৎ নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে অনিরুদ্ধ।

বাসন্তীর দুর্ভাগ্য, তার সেই হাড়বজ্জাত ছেলেটা ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ছোটবোনকে নীতি উপদেশ দিতে বসিয়াছে—পাপ করলে পা ফোলে বুঝলি ? দেখনা ছোট মাসীর পা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, পাপ করেছে কি না, বেশ হয়েছে আচ্ছা হয়েছে।

সমস্ত সাধনা বিসর্জ্জন দিয়া অনিরুদ্ধ ছেলেটার গালে ঠাঁই ঠাঁই করিয়া গোটা কতক চড় কসাইয়া তীব্র শ্লেষের ভঙ্গীতে বলিয়া ওঠে—বাঃ পিসিমা চমৎকার! তা বোতোল দুই কেরোসিন এনে ঢেলে একেবারে জ্বালিয়ে দিলেই পারতে? পাপের জড় মরে যেতো!

জ্ঞানদা এই ছেলেটাকে দেখিতে না পারিলেও মুখোমুখি বেশী কিছু বলিতে সাহস পাননা, তাই গলার স্বর কিছুটা নামাইয়া বলেন—তা' আমি কি ইচ্ছে করে পুড়িয়ে দিয়েছি?

—দাওনি কেন তাই তো জানতে চাইছি। উচিৎ ছিল দেওয়া।...এই উমি, উঠে আয় শিগগির। মাটির পুতুলের মতো বসে আছে দেখ, পুড়িয়ে মারাই তোদের উচিৎ শাস্তি। ওঠ্, ওঠ্ শিগগির।

ঘাড় গুঁজিয়া থাকিতে থাকিতে উমাশশী প্রায় 'তক্তা বনিয়া' যাইতেছিল, পায়ের জ্বালার চাইতে শিরদাঁড়ার যন্ত্রণা বেশী, অথচ হঠাৎ মুখ তুলিয়া মুখ দেখাইবার সাহস খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অনিরুদ্ধর ডাকে যেন মুক্তি পায়—স্পষ্ট করিয়া মুখ দেখায় না...উঠিয়া দাঁড়াইয়া আঁচলে চোখ মুছিতে থাকে।

—সক্কালবেলা যা মহাপাপ করেছিস—হয়েছে তো তার প্রায়শ্চিত্ত? চল্ এখন পদসেবা করতে।...দেখি সেজদার ভাঁড়ারে লোশন টোশন কি আছে।...

অনিরুদ্ধর পিছন পিছন সত্যিই উমাশশী চলিয়া যায়।... অবশ্য পলায় বলিলেই ঠিক হয়।

১৫

পরক্ষণেই বাসন্তী যেন ফাটিয়া পড়ে—'দেখলে পিসি, দেখলে তোমরা আমার ছেলেগুলো যেন সকলের চক্ষুশূল। এতো ছেলে হাসাহাসি করছে, আর বিক্রম ফলাতে—আমার ওই রোগা ছেলেটা! উর্মির ওপর আদর উথলে পড়ছে, বলি কেন শুনি? জগতের কোনোদিকে তো তাকিয়ে দেখেন না—আর যখনি উর্মির কথা ওঠে—হুঁস্ হয় বাবুর।...বললে ভালো শোনায় না, কিন্তু সহোদর বোন তো নয়, বিধবা মানুষের ওপর বেটাছেলের অতো দরদ কিসের বলোতো আমায়?

হেমলতা না থাকার এই এক সুবিধা, ইচ্ছামত মন্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতাটা জন্মিয়াছে সকলের।

জ্ঞানদা অবশ্য এতটা বরদাস্ত করিতে পারেন না, ঈষৎ ক্লান্তভাবে বলেন—তুই থাম্ বাসি!

—বাসি চিরদিনই থেমে আছে। বাসি যখন তোমাদের গলগ্রহ তখন মুখে তালাচাবি এঁটে থাকাই দরকার।...তবে এও বলি পাড়ার লোককে তো চুপ করিয়ে রাখতে পারবে না? সামনের সুরেশবাবুর পরিবার সেদিন বেড়াবার ছলে এসে বেশ কিছু তো শুনিয়ে গেলেন—কই তালা আঁটতে পারলে মুখে?

এই ভাবেই দিনের আরম্ভ হয়, আবার এই ভাবেই এক সময় শেষ হয়।

তবু এও একটা বৈচিত্র্য, একটা উত্তেজনা।...দুই চারদিনের আলোচনার খোরাক। মাঝে মাঝে এমন একটা কিছু না ঘটিলেই

বা চলিবে কেন? বড্ড বেশী যে ঝিমাইয়া পড়িবে সংসার।... জ্ঞানদা আর ইন্দুপ্রভার নিত্য কলহ, চার পয়সার কাঁচালঙ্কা কিনিতে দুই পয়সা সরানোর সন্দেহে বসন্তর সঙ্গে খচাখচি, সেজকর্ত্তার মান অভিমান—বড় বেশী একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে যে!

মীনার পলায়নের দিন তুই পরে মাসীও কটকে ফিরিলেন। স্মৃতিদেবীরও যেন আর পুরী থাকিবার চাড় রহিল না। নিজেই মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন—আমাদের তো এবার গেলেই হয় তনু ?

তটিনী রাগ করিয়া উত্তর দিল—কেন এখুনি যাবে কেন খুব পালোয়ান হয়ে উঠেছ ? শরীরের কতটুকু উন্নতি হয়েছে শুনি ?

—এ শরীর আর কতই ভালো হবে ?

স্মৃতিদেবী মৃতু হাসেন।

—না ভালো হবেনা ! তবে ফিরে যাওয়ার দরকার কি ? চলো সমুদ্রের ঢেউয়ে ছুঁড়ে দিয়ে আসি, শ্রীশ্রীজগন্নাথ লাভ হয়ে যাক্।

ছোড়দার একটী শান্তশিষ্ট বৌ করিয়া দিয়া রুগ্না মাকে বড় বৌদের আওতা হইতে দূরে রাখিবার ইচ্ছাটা মীনার ব্যবহারে ব্যর্থ হওয়ার দরুণ মীনার উপর নিদারুণ চটিয়া গিয়াছিল তটিনী।···প্রথমটা তো যা' মুখে আসে গালাগাল দিয়া রাগের ধাক্কাটা সহনীয় করিতে চেষ্টা করিয়াছে। স্মৃতিদেবী যখন বলিলেন—এঁ হয়তো ভালই হ'ল রে, আমরা বোধহয়

ভুল করতেই বসেছিলাম, ভগবান সামলে দিলেন। অপাত্রে দানও তো একটা অপরাধ। আমার সাগরের যোগ্য হবার জন্যেও তো যোগ্যতা থাকা চাই?···তখন রাগিয়া ঝাঁজিয়া উত্তর করিয়াছিল তটিনী—তুমি আর মহাত্মা গান্ধীর মতো অহিংসার বাণী আউড়োনা মা। রাগে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। উঃ! রাক্ষুসীকে সামনে পাই তো মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলি।···

মা গম্ভীর কিন্তু মা ভয়াবহ নয়, মার সামনে ওদের ভাই-বোনের কোনো কথা আটকায় না। সাগর মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল—শুধু এই আর কিছুই না? কেটে কেটে নুন দিতে ইচ্ছে করছে না? পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না? তবে তোমার প্রতিহিংসা আন্তরিক নয় বাপু!

রাগের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিয়াছে তটিনী।···কিন্তু আড়ালে গিয়া আবার সেই কথাই তুলিয়াছে—আচ্ছা সত্যি বল্ ছোড়দা, খুব দুঃখু হচ্ছে তোর?

—'খুব' বললে বড্ড অতিরঞ্জিত হয় তবে কিছুই হচ্ছেনা কি করে বলি?

—কি করে বলি?···তটিনী ভেঙাইয়া ওঠে—লজ্জাও করেনা দুঃখিত হ'তে! মোষ্ট অর্ডিনারি একটা মেয়ে—কি পেলে তার মধ্যে তা'ও জানিনা।

নিজেও যে খুসী হইয়াছিল সেটা আর স্মরণ করে না।

সাগর হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল—কিছু পাইনি বলেই তো। তোর মতো বৌদিদের মতো ছোটমাসীর মতো 'কিছু' যুক্ত আস্ত একটা মেয়ে মনে করলেই আমার প্রাণ উড়ে যায়।···কেউ বুলডগ পুষতে ভালোবাসে—কেউ গিনিপিগ্, এই আর কি।

—কলকাতায় গিয়ে আবার তা'হলে ওকে খুঁজবে তুমি?

—অসম্ভব নয়।

—খবরদার বলছি ছোড়দা, খুনোখুনি হয়ে যাবে।··· গিনিপিগ্ কেন—কোলাব্যাঙের মতো মেয়ে ধরে এনে তোমার হিল্লে করে ছাড়বো আমি।

—কোলাব্যাঙ্? ও বাবা বড্ড লাফায়—

বলিয়া এমন আতঙ্কের ভান করে সাগর, যেন সামনেই ব্যাঙ্ লাফাইতে দেখিল এইমাত্র।

—ব্যাঙ্ সামলাবারও মুরোদ নেই? তবে কি চাই? আরশোলা?

—সে তো আরও ফড়ফড়ে।

—বুঝেছি তোমার আইডিয়াল মেয়ে হচ্ছে কেঁচো।· আচ্ছা খুঁজলে তা'ও পাবো।···

থাকিবার ইচ্ছা সাগরেরও আর ছিলনা, তবু মায়েছেলে যুক্তি করিয়া যাইবার কথা আর মুখে আনেনা, এবং দিন দুই পরেই তটিনী হঠাৎ একসময় চীৎকার করিয়া বলে—এই ছোড়দা, চিরকাল এই উড়ের দেশে পড়ে থাকবি না কি?

যাবার যে নাম, কর্‌ছিস্‌ না বড়ো ? মনে হচ্ছে নির্ঘাৎ কোনো উড়েনীর প্রেমে পড়েছিস। ওসব• চলবেনা—যা শিগগির গাড়ী রিজার্ভ করে আয়, হরদম এই সমুদ্দুরের ঘ্যানঘ্যানানি আর ভালো লাগেনা বাবা—বলিয়া কথার সঙ্গে মানসিক ইচ্ছার মিল দেখাইতে—ট্রাঙ্ক সুটকেস বিছানা আলনা টানিয়া ছত্রখান করিয়া বাঁধিতে বসে।···

আঠাশ

পুরী সহরেরই অন্য একপ্রান্তে—সমুদ্রের ঘ্যানঘ্যানানিতে না হোক—আলাদা কারণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন আর একজন। তিনি হেমলতা। গোবিন্দ যে তাঁহার সহিত এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসিবেন এ ধারণা বোধহয় ছিল না তাঁর। অগাধ লবণাম্বুরাশির লবণকণা বহিয়া আনিয়া আনিয়া পবনদেব যে চুপিসাড়ে হেমলতার এতদিনের স্বাস্থ্য-সুগঠিত দেহে ইনজেকশন করিতেছিলেন সে খবর ধরা পড়িল একেবারে প্রবল বাতজ্বরের বেশে।

প্রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন ভদ্রমহিলা।

জ্বরের কয়েকটা দিন তো বেহুঁসে গেল—জ্বর ছাড়িলেও পায়ের ব্যাথায় আর নড়িতে পারেন না।···সামনে থাকিলে অনড় মানুষটার কন্না না করিয়া উপায় নাই, আশ্রমের দিদিরা বাধ্য হইয়াই করিতেছেন। কুণ্ঠায় আর মুখ তুলিতে পারেন না হেমলতা।

আজও সকালে মুখধোয়ার জল, মাজন, গামছা প্রভৃতি হাতে মানদা দিদিকে আসিতে দেখিয়া হেমলতা সলজ্জ কুণ্ঠায় বলেন—কতো কষ্টই যে দিচ্ছি দিদি!

মানদাদিদি ভদ্রতার দায়েও অস্বীকার করেন না—কালিপানা মুখে বলেন—কষ্ট তো এখন গলায় গেঁথে নিতেই হবে—পঙ্গু হয়ে পড়েছ যখন। তবে এও বলি ভাই, তোমার যেকালে এমন রোগের শরীর সেকালে এ ধাষ্টমো করতে আসা উচিৎ হয়নি।

হেমলতা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলেন—রোগের শরীর তো ছিল না ভাই—

—ছিল না অমনি এখানে এসেই হ'ল? কি জানি ভাই, বাত তো শুনি জন্মকেলে রোগ। এই যে এতকাল আশ্রমে আছি, কই বলুক দিকিন কেউ মানদা একদিন সেবা খেয়েছে কারুর?

—আমার ভাগ্য।...বলিয়া নীরব হইয়া যান হেমলতা।

—ভাগ্য আমাদেরও—নইলে এই ঝুলন আসছে—গোবিন্দের ঘরে কত কাজ, তা'নয় আজ সাতদিন দু'দণ্ড জপ করবারও ফুরসৎ হয়নি।...এই জল, এই বাতাস, বাবা কী আকালকেঁড়ে জ্বর।...

সময়ের অভাবেই বোধকরি ইঁহার সমস্ত কথাগুলি নিঃশেষ হইবার আগেই চলিয়া যাইতে হয় মানদাকে।...নিজে তিনি নিতান্তই আশ্রমের পোষ্য, তিনকূলে রাখিয়া আসেন নাই কাহাকেও।...হেমলতার ছেলেরা যে মাসে মাসে মোটা টাকা পাঠায়, হেমলতা ইচ্ছামতন দানধ্যান ভোগরাগ করেন, সেটা মানদার পক্ষে বিরক্তিকর না হইবেই বা কেন?

কিছুক্ষণ পরেই সুরবালা দিদি আসেন।

অবশ্য সেবা করিতেই। কোশা-কুশি, পূজার আসন, জপের মালা, গীতা ইত্যাদি পূজোপকরণগুলি আনিয়া গুছাইতে গুছাইতে বলেন—জ্বর ছেড়েও তো দিদির উন্নতি দেখছিনে কিছু, বেটা বৌকে তো এবার খবর দিতে হয় দিদি ?

—খবর !···হেমলতা ক্লান্তভাবে বলেন—ভাবছি আর দু'একদিনে যদি সারে কেন মিছে বিব্রত করা তা'দের ?

বয়সে সুরবালা হেমলতার চাইতে বেশ কিছু ছোট, তাই সম্ভ্রমটা কিছু রাখেন। হেমলতার কথার উত্তরে আক্ষেপোক্তি করিয়া বলেন—দু'একদিনে আর সেরেছে ! বাতরোগ ! আগে ছিলনা বলছেন—নতুন কামড় এবার কি অল্পে ছাড়বে ? বারে বারে ফেলবে। তা'র ওপর এই বর্ষাকাল। আমি বলি দিদি, ও কোনো কাজের কথা নয়, খবর আপনি দিন। বাবা মহারাজ তো প্রথমদিনেই পোষ্টকার্ট লিখে দেবার জন্যে ব্যস্ত, তা' আপনার বড্ড নিষেধ শুনে আর দিলেন না। অ'বিশ্যি দিলে যেতো কিনা সন্দেহ। ডাকঘরের ধর্ম্মঘট না কি হয়ে তো সবদিক বন্ধ। এই ক'দিন বুঝি সবে গোলমাল মিটেছে—তা'ও ঠিকমতন চিঠি যাবার ভরসা নেই।

—বাবার আশ্রয়ে এসেছি ভাই, আর তা'দের জ্বালাতন করতে ইচ্ছে করে না। তাই বলছিলাম কি—আলাদা একটা ঝি যদি যোগাড় করে দিতে পারো আমায়, আর

এই ঘরটুকুন ছেড়ে দাও তো থাকা হয়। তার খোরাকী মাইনে দেব আমি।…

—সে তো দেবেন বুঝলাম…সুরবালা একটু বেশী কাছ ঘেঁসিয়া বলেন—মানদাদিদি তিষ্ঠোতে দিলে তো? হিংসুটের জাগাজ! কেউ যে বাবা মহারাজের একটু সুচক্ষে পড়ে এ ওর ইচ্ছে নয়। আপনাকে একটু ইয়ে করেন বলে রেগে অস্থির।…আলাদা ঝি রেখে থাকবেন? তবেই হয়েছে হিংসেয় ফেটে মরবে না?…আমার যাই কোনো চুলোয় কেউ নেই তাই থাকা—আপনার যখন বৌ বেটা নাতিপুতি অমন জাজ্ব্যলিমান সংসার, কি তুঃখে এখানে পড়ে থাকবেন?… অবিশ্যি হ্যাঁ—বুড়ো হ'লে সংসারে হতমান্যি হয়ে থাকতে হয়, তা' কি করবেন দিদি—যত অপগেরাহ্যি করুক তবু তারা পেটের সন্তান, তু'বেলা ঝাঁটা মেরেও যদি ভাত দেয় তা'ও মান্যের।…তবু আপনার ছেলেরা তো ভালোই বলতে হবে, মাস মাস মাসোহারা দিচ্ছে। পেটের সন্তানের বাড়া জিনিস আছে? এই যে রোগ হয়েছে—নিজের ঘরে পড়ে থেকে যদি ছ'মাস ভোগেন, বিদেয় করে তো দিতে পারবে না তারা?…

অনেক ঘাটের জল আর অনেক 'পোয়ানে'র পোড় খাইয়া সুরবালা আজ আশ্রমবাসিনী, অভিজ্ঞতাটা তাই হাড়ের ভিতরের। শিক্ষাদীক্ষা কম, ভাষাটা হয়তো মার্জ্জিত নয়, কিন্তু প্রাঞ্জল যে সে বিষয়ে কি সন্দেহ করিবার কিছু আছে?

হেমলতার অনেক কিছুই বলিবার ছিল—সংসারে হতমান্য হইয়া থাকিবার দুর্ভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই, ছেলেরা তাঁহার সোনারচাঁদ, এসব কথা না বলিতে পারার অস্বস্তি কম নয়, তবু—হয়তো বা শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্যই চুপ করিয়া থাকেন।...কেবলমাত্র বিষয় বৈরাগ্যের তীব্রদহনে চলিয়া আসিয়াছেন এতবড়ো মিথ্যা কথাটাও যেমন বলিতে বাধে, তেমনি সত্য ঘটনার নিরতিশয় ক্ষুদ্রতাটাও মুখ বন্ধ করিয়া রাখে।

—যাই দিদি, দু'দণ্ড তো থাকবার জো নেই, গেলেই এক্ষুনি গিন্নী জেরা করতে বসবেন—কি ফুস্‌ফুস্ গুজ্‌গুজ্ হচ্ছিল ?...

সুরবালা চলিয়া যান।

হেমলতা আচমন করিয়া হয়তো বা পূজা করিতেই বসেন।...

চূড়াবাঁশী সম্বলিত গোবিন্দমূর্ত্তির বদলে—ভাঙা কার্ণিশ আর ফাটাচটা মেজে সম্বলিত সমস্ত মিত্তিরবাড়ীটা বারবার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে থাকে।...

মিত্তিরবাড়ীর পরিবেশের বাহিরে হেমলতার মূল্য কি ?

ধ্যান হয় না।

জপও হয় না—খোলে চাঁটি পড়িয়াছে।...বড়দালানে শিষ্যদের লইয়া বাবা মহারাজ যে প্রাভাতিক কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করেন তাহারই ঝঙ্কার ভাসিয়া আসে। বাবা নিজেই পদ বাঁধেন, আখর দেন ...নূতন পদ গাওয়া

হইতেছে…"মন্দাকিনীর মৃত্তিকা ছানি' গড়েছে শ্যামের দেহ—"

মূল গায়েনের মাজাঘসা ভরাট গলার বিলম্বিত সুর ঝঙ্কার শ্রোতার প্রাণে যে আবেদন বহিয়া আনে—ভাঙা আর চাপা, কটু আর কর্কশ, কতকগুলা কণ্ঠের 'দোয়ার' দান আর জগঝম্পের উদ্দাম উন্মত্ততায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় সেই আবেদন।…

আগাগোড়াই কেমন বিশ্রী আর বিরস লাগে হেমলতার।

মানদাদিদি যখন ফের দুধসাবু লইয়া আসেন, হেমলতা আপনা হইতেই বলেন—ছেলেদের একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়ারই ব্যবস্থা করতে বলবেন মানদাদিদি, অনেক বিরক্ত করছি আপনাদের।…

মানদাদিদি উত্তর করেন—বিরক্ত তো আমাদের করা নয়—গোবিন্দ যা দেবেন মাথা পেতে নিতে হবে—তবে—বাবা একটু অস্থির হচ্ছেন।…আপনাকে দেখতে আসতেও ইচ্ছে, অথচ রোগনাড়া দেখতেও পারেন না, এই হয়েছে মুস্কিল। বাবাই বলছিলেন—টেলিগ্রাফ্ এখন করা মিথ্যে, যা গণ্ডগোল চলেছে ডাকঘরে। ঝুলন বাদে ছোট গুরুভাই যাবেন কলকাতায়, তাঁর সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে।

ব্যবস্থা তবে হইয়াই গিয়াছে।

হেমলতা চুপ করিয়া থাকেন।

মানদাদিদি খালি বাটিটা তুলিয়া লইয়া যাইবার প্রাক্কালে শেষ অস্ত্রটী ছুঁড়িয়া যান,—বাবা তাই বলছিলেন—'মরণ বাঁচনের কথা তো বলা যায়না, হেমলতার ছেলেদের কাছে কে দায়ীক হবে?'...

কথাটা অন্যায় নয়। পরকালের দায়ীত্ব তিনি লইয়াছেন সত্য, তাই বলিয়া ইহকালের বোঝা বহিবেন কেন?

উনত্রিশ

মিত্তিরবাড়ীর বড়দালানে চুলবাঁধার আসর বসিয়াছে।

বড় সংসারের মধ্যাহ্ন ভোজনের পাটটাও যেমন দেরীতে চাকে, বৈকালিক ব্যাপারটা তেমনি প্রায় সন্ধ্যায় আসিয়া ঠেকে।···ইন্দুপ্রভাই না হয় চা জলখাবার হুধ বার্লির তাড়ায় নিজের গরজে আবার ইতিমধ্যে রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিয়াছেন—আর কার কি দায়!

অকাল দিবানিদ্রার আলস্যে কেউ বা বসিয়া বসিয়া হাই তুলিতেছে, কেউ কিছু তৎপরতায় জ্ঞানদার কাছে আগাইয়া বসিয়াছে। চুল তিনিই বাঁধিয়া দেন। 'এখনকার ফ্যাসান এ্যাসান জানেননা বটে'—তাই বলিয়া বৌঝিকে স্বাধীনতা দেওয়ারও প্রথা নাই এ বাড়ীতে। ছোটমেয়েগুলিকে চুল বাড়ার অজুহাতে ঝুনো নারকেল ছুলিয়া দেওয়ার মতো এমন চাঁচাছোলা চুল বাঁধিয়া দেন—মাঝে মাঝে কপালে হুইচারিটী ফোস্কা পড়িতেও দেখা যায়।···

বৌদেরও তদ্রূপ।

শুধু শান্তি এবং ইদানীং দিদির দেখাদেখি জয়ন্তী নিজেদের চুল নিজেরা বাঁধিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়া লইয়াছে। বাসন্তী পৃথিবীর কারুকেই দেখিতে পারে কি না সন্দেহ,

খুড়তুতো ভাইঝিদের যে দেখিতে পারিবে এটা কিছু আশা করিবার মতো নয়।...আর্শি লইয়া বসিতে দেখিয়াই তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলে—তোর আজকাল অতো 'ভাবন' বেড়েছে কেন লা শান্তি? চুলের কেতা করে করে আর আশ মেটেনা দেখছি। কেন? বিকেল হলেই রঙিন কাপড়খানি পরে ছাতে উঠে ঘুরঘুর করা, এসব তো ভালো নয়!

শান্তি মুখ রাঙা করিয়া বলে—সেজপিসির যতো সব কুচুটে কথা, লোকের পেছনে না লাগলে হয়না।...

—কি করবো ভগবান যে ড্যাব্‌ডেবে হুটো চোখ দিয়েছেন, অনাচার, কদাচার দেখে চুপ করে থাকতে পারিনে।

—ভগবানকেও ধন্যবাদ, যে সারা পৃথিবীর মাষ্টারী করবার ভার বেছে বেছে তোমাকেই দিয়েছেন।—বলিয়া আরো জোরে জোরে চুলের কেতা করিতে থাকে শান্তি।...

মাঝে মাঝে বাসন্তীকেও আজকাল মূক করিয়া ছাড়ে সে।

শ্রাদ্ধ আরো কতোদূর গড়াইত কে জানে!—কই গো—জ্ঞানোদিদি কোথায়—বলিয়া প্রতিবেশিনী মদনের মা আসিয়া হাজির হ'ন।

জ্ঞানদা একগাল হাসিয়া আগাইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণকন্যার পদরজ মাথায় বুলাইতে বুলাইতে বলেন—তীর্থ করা হ'ল দিদির?

—বলি আর কোন মুখে—নারায়ণই জানেন। নাও এই মহাপেসাদটুকু ধরো দিকি।...

শুচিতা বাঁচাইতে দেয়ালের কোল ঘেঁসিয়া হাতের রেকাবীটুকু নামাইয়া মদনের মা বলেন—পর্শু এসেছি—কাল থেকে আসবো আসবো করে হয়ে আর উঠলো না। আজ দেড়মাস বাড়ীছাড়া, বাড়ী যেন ভূতের বাসা।

—কেন বামুনপিসির বৌ তো খুব কার্য্যের গো?

বাসন্তী ফোড়ন কাটে।

—ওলো ওই শুনতেই কার্য্যের। ওপর দেখ্‌তা কাজ, ভালোভালো রাঁধলুম বাড়লুম খেলুম—বরের সঙ্গে বায়স্কোপ, থিয়েটার দেখতে গেলুম—হয়ে গেল সংসার করা।...মরুক গে বলতে গেলে ঢের কথা, তা' সব ছিলি ভালো তো?

—তা তোমাদের আশীর্ব্বাদে ভালই দিদি।...বলি আমাদের মেজবৌয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল?

—ওমা তা' আবার হ'ল না? না দেখা করে ছাড়বো আমি? রথতলায় তো সেই চকিতের দেখা, তারপর ধরলুম একদিন মন্দিরে। কতো বললুম—মেজবৌ চলো আমার সঙ্গে, আর কেন নিজেকে পেড়ন করা। চলো তোমাতে আমাতে ভুবনেশ্বর সাক্ষীগোপাল দর্শন করে কলকেতায় ফিরি, সে কিছুতেই নয়।...হ'বে কেন, আসল রাস্তা চিনেছে কিনা,—আমাদের মতোন মায়ার পাঁকে ডুবে নেই তো।...ওই যাঃ আসল কথাটাই বলি—সেজবৌমা কোথায় গো?

অলকা আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়ায়।

—এই নাও অক্ষয়বটের ফল, তোমার শাশুড়ী দিয়েছে, আঁচল পাতো।

অলকা উত্তরও করে না আঁচলও পাতে না, বিরস মুখে কাঠের মতো দাঁড়াইয়া থাকে।

জ্ঞানদা ব্যস্ত হইয়া ওঠেন—লজ্জা কি সেজবৌমা, আঁচল পাতো—ও জিনিস আঁচল পেতেই নিতে হয়।

থিয়েটারের ড্রপ্‌সিন উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকবৃন্দ যেমন উৎসুক হইয়া ওঠে—দালানভর্ত্তি ছেলেমেয়েরা তেমনি কৌতূহলী হইয়া তাকায়···কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনা যা ঘটে অভাবনীয়।

জ্ঞানদার ব্যগ্রতা, মদনের মার সদিচ্ছা, আর সুদূরবর্ত্তী হেমলতার স্নেহ নিদর্শনকে উপেক্ষা করিয়া—আমার দরকার নেই—বলিয়া অকুণ্ঠ পদক্ষেপে দালান পার হইয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া যায় অলকা।

ছাদ ফুঁড়িয়া দালানের মাঝখানে অকস্মাৎ বজ্রপতন হইলেও কি এত স্তম্ভিত করিতে পারিত দর্শক-মণ্ডলীকে?

—তবে আর কি হবে—জ্ঞানোদিদি তুলে রাখো—সে আমাকে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেছিল—বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান মদনের মা—ওই জন্যেই মাগী সংসার ছেড়েছে—বৌরা একেবারে জাত কেউটে! বাবাঃ!···

নিতান্ত যেন জাত কেউটের দংশনে আহত হইয়াই ছটফট করিয়া নামিয়া যান মদনের মা, একমিনিট আর দাঁড়ান না।

... ...

ভিসুভিয়াসের অগ্নি উদ্গীরিত হইয়া লাভাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে...অলকা ঘরের বাহির হয়না।...অত সাধের 'ফিট্' পর্য্যন্ত হয় না একবার। প্রতিজ্ঞা স্থির করিয়াছে সে।...

কেউটে নাম যদি কিনিতেই হয়, ছোবল মারার সুখ হইতে বঞ্চিত হইবে কেন?

অলকার নাগাল না পাইয়া আপন মনে গজরাইতে থাকেন জ্ঞানদা।

অরুণেন্দু আসা মাত্রই—বৌয়ের ঘরে ঢুকিবার আগে গ্রেপ্তার করা দরকার। বৌ যে কতবড়ো জাঁহাবাজ জানিয়া যাক একবার! চব্বিশঘণ্টা তো আদরে গলিয়া পড়িতেছেন বৌ, পরিবারকে যে মাঝে মাঝে 'দাব' করিতে হয় পুরুষমানুষের সে জ্ঞান একটু থাকা দরকার বৈকি।...এই যে অমূল্য— হাঁ পুরুষ যদি বলিতে হয় তো ওকেই। তেমনি বৌও ভালো হইয়াছে।...আর অলকা? পাড়ার লোকের কাছে পর্য্যন্ত মুখ হেঁট করিয়া ছাড়ে, এমন বৌ!

সংসার ছাড়িয়াও হেমলতা তোর জন্য ভাবিয়া মরিতেছে- কেন? তোর ভালোর জন্যই না? নিজের তো তাঁর পৌত্র মুখ

দেখার অভাব ঘটে নাই ?…বাঁজা মেয়েমানুষ যে মানুষের বার সে জ্ঞানটুকু নাই,—এতো তেজ ?

জ্ঞানদা ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকেন, আর কথা কয়টী শানাইতে থাকেন, কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, অরুণেন্দু আসেই না।…মনের মতো কিছুটী যদি হইবার জো আছে !… নিতান্তই রাত হইতে দেখিয়া বাধ্য হইয়াই একবার জপ আহ্নিকে যাইতে হয়, তবে উমাশশীকে মোতায়েন রাখিয়া যান, নির্দ্দেশ থাকে আসিবামাত্রই রাত হওয়ার ছুতায় তাড়াতাড়ি জল খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া নীচের তলায় দু'দণ্ড আটকাইয়া রাখার—জ্ঞানদা এই আসিলেন আর কি।…

কিন্তু ঠাকুরঘরে ওঠার মিনিট কয়েক পরেই উমাশশী ভগ্নদূতের মতো ম্লানমুখে গিয়া খবর দেয়—সেজদা জল খেতে চাইলেন না পিসিমা, বললেন খিদে নেই।

জ্ঞানদা 'করে'র জপ 'করে' আটকাইয়া বিরক্ত স্বরে বলিয়া ওঠেন—খিদে নেই কেন ? জিগ্যেস করলি না ?

—কি জানি বাবু যা গম্ভীরমুখে ঢুকলেন আমার ভয় করলো।

—অরুণের আবার গম্ভীর মুখ কিসের ?—সদা-হাস্যময় ছেলে।

—জানিনা হয়তো কোনো রুগী টুগী মরে গেছে।…

নিজের বুদ্ধির আন্দাজেই বিচার করে উমাশশী।

—ঢুকলো তো ঘরের কোটোরে ? একে তো মন মেজাজ ভালো নেই বলছিস—তার ওপর বৌ সাতখানা করে লাগাবে

ভাঙাক, বিষমুখী হয়ে তো বসে আছেন সেই থেকে। কার যে অপরাধ!—বলিয়া জ্ঞানদা তিক্তমুখে ইষ্টমন্ত্রের স্থগিত সংখ্যার ঘর হইতে পুনরায় সুরু করেন।

অবশ্য বেঠিক কিছু বলেন নাই তিনি, বিষমুখী হইয়াই বসিয়া আছে অলকা সেই অবধি। অথচ অপরাধ কার হিসাব করো? বাঁজা বৌকে মাদুলী কবচ, অক্ষয় ফল, কোন্ শ্বাশুড়ী ননদ না দিতে চায়? মস্ত অপরাধ সেটা?

অপরাধ যারই হোক—অরুণেন্দু ঘরে ঢুকিতেই অলকা যেন ফাটিয়া পড়ে। স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য মাত্র করে না।

ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে বলে—এলে কেন? থাকতে পারলে না সেখানে রাতটা?

কাণাঘুষা অনেক কিছু শুনিলেও স্বামীকে এমন মুখোমুখি আক্রমণ করিবার সাহস অলকার কোনোদিন হয় নাই।

—কি হল তোমার?···বলিয়া শ্রান্তভাবে ধড়াচূড়াগুলা খুলিতে থাকে অরুণেন্দু। অন্যদিন কাজটায় অলকার সাহায্য পায়, আজ আর আশা নাই।

—আমি বলতে চাই কেন তুমি আমার সঙ্গে এই ভণ্ডামী করবে? কেন অপদস্থ করে রেখে দেবে সকলের সামনে? কেন তোমাদের বাড়ীর গিন্নীদের বারণ করবে না আমার ওপর সর্দ্দারী ফলাতে? বলো কেন আমার ওপর তোমাদের এই অত্যাচার?···

অরুণেন্দু খাটের এক পাশে বসিয়া পড়িয়া ম্লান হাসির সঙ্গে বলে—আজ আমার কেবল জবাবদিহির পালা বুঝি? আশ্চর্য্য তো?···কিন্তু তোমার হঠাৎ কি হ'ল?

—কি হ'ল? বাঁজা মানুষ মানুষের বার, তাই তোমার মা জননী দুঃখে বিগলিত হয়ে আঁচল পেতে অক্ষয় বটের ফল ভিক্ষে করে পাঠিয়েছেন আমার জন্যে!

—মা পাঠিয়েছেন? কাকে দিয়ে?

—ওই তোমাদের ভক্তিভাজন বামুন পিসিকে দিয়ে, গিয়েছিলেন যে রথ দেখতে। আমার ওপর হুকুম হ'ল আঁচল পেতে নিতে—নিইনি, তাই মাথামুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দেবার আদেশ হয়েছে, এখন পারো তো দাও?

—ওসব লোককে চটিয়ে লাভ কি? নিলেই পারতে—ওর আর কি।

—কেন নেব?···উদ্ধত উত্তর করে অলকা।

—কি হয়েছে—তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো ও সব?

ক্লান্তভাবে একটা বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়ে অরুণেন্দু।

কিন্তু অলকা আজ যুদ্ধে নামিয়াছে।···রুক্ষস্বরে উত্তর করে—বিশ্বাস করি না করি আলাদা কথা, কিন্তু কেন নেব? কেন পাঁচজনের কাছে খেলো হবো?

—তাহ'লে না নিয়ে ভালই করেছ—চোখ বুজিয়া কথার ছেদ টানিতে চায় অরুণেন্দু—

তাই বলিয়া অলকা ছেদ টানিবে কেন ?—তুমি তো বললে ভালো করেছ—আর সকলে যা মুখে আসে বলবে কেন ?

অরুণেন্দু বোধ করি আর সকলের কাজের কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পায়না তাই চুপ করিয়া থাকে।

মিনিটখানেক উত্তরের আশায় থাকিয়া অলকা আর একবার তীব্র শ্লেষের ভঙ্গীতে বলে—খুব তো সাধুপুরুষ, বলি সাধুতার মুখোস বজায় রাখতে পারলে কই ?···বেশ এই যদি তোমার ইচ্ছে ছিল—দূর করে দিয়ে আবার বিয়ে করলেই পারতে ? তা'তে অন্ততঃ লোক হাসতো না ?

এত কথার পরও অরুণেন্দু নীরব ?···তবে আর অলকার আশা কোথায় ? সন্দেহের অবকাশ কোথায় ?···লোকমুখে যাই শুনুক—সত্যই অলকার বিশ্বাস ছিলনা অরুণেন্দু এ অপবাদ সহ্য করিবে।···হয়তো হাসিয়া অস্থির হইবে, বন্যার জলে খড়কুটার মতো সমস্ত সন্দেহ ভাসাইয়া দিবে।···

কান্নার আবেগে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে তা'র।···

—কি তোমার মতলব ?

হঠাৎ উঠিয়া বসে অরুণেন্দু, অলকার একটা হাত মুঠার মধ্যে চাপিয়া ঈষৎ ব্যাকুল স্বরে বলে—আরো একজন ওই প্রশ্নই করলে অলকা। উত্তর দিতে পারিনি—তুমিই বলতো সত্যিই কোনো মতলব ছিল আমার ?

স্বামীর কণ্ঠে এমন গভীর বিষাদের সুর ? কেন ?···জমা জল দুই চোখে উছলাইয়া পড়িতে চায়।

চোখের জল ফেলিয়া অপদস্থ হইবার ভয়ে অলকা মুখ তোলেনা, ধরা গলায় বলে—জানিনা—বিশ্বাস হয় না—কেন এমন করলে ?

—সেই প্রশ্নই নিজেকে করেছি অলকা, পাঁচঘন্টা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শুধু ভেবেছি। দেখলাম পরের মনের সন্ধান করতে গিয়ে নিজের মনের হিসেব নিইনি। কিন্তু তোমার বড়ো কষ্ট অলকা, না ?

হঠাৎ সমস্ত মানমর্য্যাদা ভাসাইয়া দিয়া স্বামীর কোলে ভাঙিয়া পড়ে অলকা।

—না না কোনো কষ্ট নেই, কিছু কষ্ট নেই—শুধু পাঁচজনের কাছে মুখ হেঁট কোরনা আমার।

অলকার চুলের উপর হাত রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে অরুণেন্দু। নিজের মনের হিসাব সত্যই নেওয়া হয় নাই—প্রদীপের নীচের মতো ছায়াচ্ছন্ন হইয়াছিল এতদিন। হিসাব মিলিয়াছে…অনেক ভাবিয়া অনেক গোপন কুঠুরী খুলিয়া।…এই পরিবেশ তার অসহ্য।

এই সঙ্কীর্ণ কুৎসিত ভব্যতালেশহীন পরিবেশ—তার ভিতরের সহজাত সৌন্দর্য্যবোধকে পীড়িত করে, ক্ষুব্ধ করে।… তাই—মিত্তিরবাড়ীর প্রাণধারা অব্যাহত রাখিবার দায়িত্ব তার কাছে ভয়াবহ।…ঝুরি নামাইয়া শিকড় গাড়িবার কল্পনা অতিষ্ঠকর।…অমূল্যর বাঁচিয়া থাকার দৃষ্টান্ত তার কাছে মৃত্যুর নামান্তর।…নিজের চারিদিকে তৈরী করা খুসীর ঘূর্ণিঝড় তুলিয়া

শুধু সহনীয় করিয়া রাখে পারিপার্শ্বিকতাকে—অনিরুদ্ধর মতো অসুস্থ হইয়া পড়িবার ভয়ে। অথচ গণ্ডি ভাঙিয়া মুক্ত হইবার—নূতন করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি সাহসও নাই।···কিন্তু লোভ তো আছে! অপরিসীম লোভ!

নিজের হাতে গড়িয়া তোলার লোভ, আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের খোরাক জোগাইবার লোভ, শান্তছন্দ কবিতার মতো বাহুল্য-বর্জ্জিত একটী সংসারের উপর অবাধ কর্ত্তৃত্বের লোভ!·· ···

তাই এতদিন এই সর্পিল পথের গোলোক ধাঁধাঁয় ঘুরিয়া মরিতেছে অরুণেন্দু।···এখন আর বুঝিতে ভুল নাই—মীনাকেও ঠকায় নাই অরুণেন্দু, অলকাকেও না, ঠকাইয়া আসিয়াছে আপনাকে।

মীনাকে কেবলমাত্র পরীক্ষার শেষে—অধীত প্রশ্নপত্রের মতো ঠেলিয়া রাখিবার উপায় আর নাই। অরুণেন্দুর মনের ভিতর সুতীক্ষ্ণ একটী জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো অবিরাম জাগিয়া থাকিবে মীনা।

ত্রিশ

অরুণেন্দু আর আসে না।

দুই খানা ঘর—আর এক ফালি বারান্দাওয়ালা সেই ছোট্ট সংসারটুকু যেন স্তব্ধ হইয়া গেছে।···মীনা তো নীরব বটেই, নীলুও নিষ্প্রভ। মীনার মতো সেও অবসর পাইলেই—কিসের প্রত্যাশায় কে জানে তিন তলা উঁচু বারান্দা হইতে জনাকীর্ণ পথে দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।···অবসর প্রচুর, কাজ কোথায়?···দু'চার দিন বাদ একদিন কিছু বাজার দোকান করিয়া আনে—মীনা কোনোদিন রাঁধে কোনোদিন রাঁধে না। নিজের অক্ষুধার অজুহাতে নীলুকে বাজারের খাবার আনিয়া খাইতে পয়সা দেয়।···নীলুর খেয়াল জাগিলে একদিন ঘর দোর বাসন বিছানা লইয়া লাগে—মাজে, ঘসে, সাফ করে, চক চক ঝক ঝক করিয়া তোলে, মন না হইলে দুইদিন ঘরে হাত দেয় না।···তাকাইয়া দেখিবার উৎসাহ পর্য্যন্ত নাই মীনার।···

কিন্তু মীনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে কিসে?···

নিজের পুরণো জীবন যাত্রায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেই তো হয়? মুক্তি চাহিয়া ছিল—মুক্তি পাইয়াছে। এ তো আনন্দের কথা।···পুরণো স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে মারিয়া তাড়াইবে এতটা আশঙ্কা করিবারই বা হেতু কি?···অন্ততঃ

একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করিয়া লওয়া আকাশকুসুম নয়। ···কলিকাতার বাহিরে—মফস্বলের কোনো ছোট খাটো সহরেও যে কিছু না জুটিতে পারে এমন কথা নাই।···

তবে ?

'তবের' উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে দিনের পর রাত্রি কাটিয়া যায়, আবার দিন আসে।···

রান্নাঘরের জলচোকীটা মীনার বেতের মোড়ার পাশে স্থাপনা করিয়া নীলু গুছাইয়া বসিল। গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিল—মা বাবুর ঠিকানা জোগাড় করতে পারলে ?

নীলু যে এবার এই প্রশ্নই করিবে সে কথা মীনার জানা। কারণ—এ প্রশ্ন নীলুর নিত্যকার। অরুণেন্দু যাওয়ার দিন দুই পর হইতেই নীলু মীনাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল ঠিকানা ঠিকানা করিয়া।—'হেই মা তুমি একটু চিরকুটে ঠিকানাটুকুন লিখে আমার হাতে দাও, আমি পথের লোককে সুদিয়ে সুদিয়ে ঠিক পৌঁছে যাবো। খবর নে' আসি বাবু কেন অমন ধাঁ করে চলে গেল আর এলো না।'

মীনা ঠিকানা জানে না শুনিয়া—পদমর্য্যাদা ভুলিয়া নীলু মীনাকে যা' মুখে আসে গালি দিয়াছে—এবং মীনাই যে কোঁদল করিয়া মানুষটাকে তাড়াইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ মত প্রকাশ করিয়া জোর হুকুম জারি করিয়াছে—যেমন করিয়া হোক ঠিকানা তাহাকে সংগ্রহ করিয়া দিতেই হইবে। নিত্যদিন যে অতবড়ো 'খপরের কাগজ'খানা পড়িয়া শেষ করে মীনা

সে কি বেগার খাটিতে ?…খপরের কাগজে আবার কোন খপরটা না থাকে শুনি ?…বলে—সেবারে নীলুদের গাঁয়ে বাগদীদের ঘরে একটা তিনপেয়ে ছেলে জন্মাইয়াছিল তাই ছাপার কাগজে উঠিয়া গেল !' আর কলকেতা সহরে—অত-বড় একটা ডাক্তারের কথা কোন দিনও থাকিবে না ? এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিবে এতবড়ো বোকা নীলু নয়। হইলই নয় চাষার ঘরের ছেলে—ধানের ভাত খাইয়াইতো বড় হইয়াছে—ঘাসের বীজ খাইয়া নয় !

মীনাকে উত্তরবিমুখী দেখিয়া নীলু প্রবল ভাবে ঠেলা দেয়—অ-মা, বলি শুনছো ? পেলে কিছু ?

মীনা বাধ্য হইয়া হাসিয়া ফেলে—আচ্ছা নীলু তুই কি পাগল ? খবরের কাগজে দেশ সুদ্ধু লোকের ঠিকানা থাকবে ? কতো লোক আছে কলকাতায় তা জানিস ?…

—জানবো না কেনো ?…অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টায় নীলু—এই তো—বললে সেদিনকে—চল্লিশ হাজার না চল্লিশ লক্ষ কতো যেন—মরুকগে—ওসব লক্ষ মক্ষ বুঝিনে—কিন্তু সক্কল লোকের খপর থাকবে খপরের কাগজে তা'তো বলছিনে—মানষের মতোন মানষের ?

—কই দেখিনে তো রে।

—মিছে কথা, তুমি দেবে না তাই বলো। কিন্তু মেয়ে-মানুষের এতই বা 'খোট্' কেন মা ? ঝগড়ার জ্বালায় মায়া মমতা সুদ্ধু বিসর্জ্জন দিয়ে বসে আছো ? আচ্ছা এই যে

মেলেকৃটারী, লরীগুলো রাক্ষসের বাড়া ছুটতে থাকে রাস্তায়—ধরো যদি—

'অপয়া' হইয়া পড়িবার ভয়ে কথাটা শেষ করে না নীলু, বিমর্ষ মুখে চুপ করিয়া যায়।

দুই জনেই চুপচাপ বসিয়া। রাস্তাঘাট অস্বাভাবিক নির্জ্জন, দোকানপাট সব বন্ধ। কিসের যেন অজানা আতঙ্কে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারৎগুলা থমথম করিতেছে।…আশ-পাশের প্রতিবেশীরা নাকি বলিয়াছে 'গোলমাল হইবে'। নীলু সকালে বলিয়াছে।…

মীনা গ্রাহ্য করে নাই। কিসের গোলমাল! কত অজস্র গোলমাল আছে কলিকাতার মতো সহরে। আর কতই হইতে পারে?

হয়তো নিতান্ত উদাসীন মন বলিয়াই কথাটার অর্থ মাথায় ঢোকেই নাই।

হঠাৎ মীনার ফ্ল্যাটের দরজায় দ্রুত অধৈর্য্য শব্দ হয়…ঠক্ ঠক ঠক।…

—ওই বাবু এলো—বলিয়া নীলু লাফাইয়া ওঠে। কিন্তু কণ্ঠস্বর অপরিচিত ইংরেজী। পাশের ফ্ল্যাটের মারাঠী ভদ্রলোক ভীত কম্পিত স্বরে বলিতেছেন—'শুনছেন—ম্যাডাম! দয়া-করে বারান্দায় থাকবেন না, ঘরের ভিতর যান—,খিল লাগিয়ে দিন, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে পারে।'…

… … … …

প্রশ্ন করিবার আর অবসর হয়না—কি ঘটিতে পারে—অকস্মাৎ কি ঘটা সম্ভব?···সমস্ত ইন্দ্রিয় ঝাঁকুনি খাইয়া লাফাইয়া ওঠে···বুদ্ধি চৈতন্য অসাড় হইয়া আসে···ও কিসের গর্জ্জন? রাজপথের বুকে ও কি? আকাশের বুক চিরিয়া একশো বাজ একত্রে ভাঙিয়া পড়িল নাকি?···না আকাশের বাজ নয়—পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে সহস্র উন্মত্ত দানব! যুগ যুগান্তের ক্ষুধিত উন্মাদ!

সহস্রফণা নাগিনী সহস্র ফণায় ছোবল হানিয়া বেড়াইতেছে···রুক্ষ মাটি বিদীর্ণ হইয়া যায়···বন্দিনী নাগিনীর বিষ নিঃশ্বাস ছড়াইয়া পড়ে বিদারণ রেখায় রেখায়।···ক্ষুধার্ত্ত দানবেরা জন্ম লইয়াছে—সেই বিষ নিঃশ্বাসের কালধূমে।

নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মতো আহার চাই তাহাদের।···

কেবলমাত্র রক্তমাংসের উপচারে ক্ষুধা মিটিবেনা—আরো অনেক অনেক চাই। লোভাতুর রসনায় গ্রাস করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না—তীক্ষ্ণ দাঁত বসাইয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ছাড়িবে—সভ্যতা সৌন্দর্য্য, শিক্ষা সংযম, সমাজ আর সংসার, বংশ সম্মান আর সংস্কৃতির ধারা।

জীবনের মূলভিত্তি ধরিয়া নাড়া দিয়া দেখিবে—পৃথিবীকে আবার আদিম যুগে ফিরাইয়া নেওয়া যায় কিনা।···

···· ··· ···

মানুষের অন্তরে কোনোদিন প্রেম ছিল?···বিশ্বাস ছিল?
মানুষের অভিধান হইতে মুছিয়া যাইবে নাকি শব্দগুলা?

মানুষ বলিয়াই কি আলাদা আলাদা কোনো সংজ্ঞা থাকিবে? মানুষ নয়—দল। মানুষের চেহারাওয়ালা অদ্ভুত প্রাণীর দল ঝরাপাতার মতো স্তূপীকৃত হইয়া উঠিবে এখানে ওখানে।...হয়তো—ধূলায় ধূলায় নিশ্চিহ্ন হইতে থাকিবে, হয়তো—বন্যার স্রোতে কুটার মত ভাসিয়া যাইবে।

সুদূর ভবিষ্যতের কৌতূহলী ইতিহাস পাঠক অন্ধকারাচ্ছন্ন এই বর্ব্বর যুগের পানে চাহিয়া হয়তো দুই মুহূর্ত্ত অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যাইবে।...সভয় আতঙ্কে কল্পনা করিতে চেষ্টা করিবে—এই ধ্বংস দানবদের প্রেতছবি।...কিন্তু কখনো কোনোদিন কি কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিবে—এ যুগেও আসন্ন শ্রাবণ সন্ধ্যার মেঘভারাক্রান্ত আকাশের পানে চাহিয়া কাহারও প্রত্যাশায় হতাশ কোনো মেয়ে একটী ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল!

একত্রিশ

ঝুলন উৎসব মিটিতেই হেমলতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন…শুধু যাইবার আগে দিন দুই কাটিল সাধু ভোজন ও পাণ্ডা ভোজনে। অশক্ত দেহ লইয়া সমুদ্রস্নান, মন্দির প্রদক্ষিণ, সর্ব্বতীর্থ দর্শন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য ব্যাপারের কিছুই যখন সম্ভব নয় তখন অর্থসাধ্য ব্যাপারেই যেটুকু পুণ্য সঞ্চয় হয়।…

'ছোট গুরুভাই' সুদাম ছেলেটী ভালো, আস্তে আস্তে হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দেয় হেমলতাকে,—মোটঘাট সমস্ত সামলাইয়া লয়, বার বার প্রশ্ন করে—বেদনার জায়গায় লাগিয়া গেল কি না।…

বাবা মহারাজ আসিয়া পথে দাঁড়ান, সুবিধা অসুবিধার তত্ত্বাবধান করেন, কলিকাতায় পৌঁছিয়াই নিরাপত্তা সংবাদ দিবার জন্য বার বার অনুরোধ জানান।…সুরবালা চোখ মোছেন, মানদা একপশলা বর্ষাইয়াই দেনা…বড় মেজ সেজ প্রভৃতি গুরুভাইদের দল সকলেই আসিয়া দেখা করেন, হেমলতার স্বাস্থ্য এবং পথকষ্টের তুলনা করিয়া উদ্বেগ প্রকাশে কুণ্ঠিত হ'ন না। মোট কথা, ঠিক যাত্রার প্রাক্কালে মনে হয়—

হমলতার বিদায়ে সকলেই দুঃখিত, হেমলতার বুঝি বা অনেকটা াম ছিল এখানে।...

শুধু হেমলতাই শুকনো চোখে কাঠ হইয়া বসিয়া থাকেন। ...সমুদ্রতীর অদৃশ্য হইয়া যায়...দরিদ্রপল্লী, নোংরা বস্তী, আর ভাঙাচোরা সহরের অসমাপ্ত নমুনার মধ্য দিয়া গাড়ী ষ্টেশনের উদ্দেশে ছুটিতে থাকে।...

ভিখারিণীর ছিন্নবেশের উপর হীরার মুকুট চাপাইয়া দিলে যেমন দেখিতে লাগে, সমুদ্রখচিত পুরী সহরের সঙ্গে যেন কিছুটা মিল আছে তার।

. . .

কিন্তু রেলে উঠিয়া কয়েকটা ষ্টেশন পার হইতেই—গাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিতেছে নানা অসম্ভব গুজবে।...রূপকথায় শোনা রাক্ষসপুরীর গল্পের মতো সব গল্প।...হাওড়া ষ্টেশনটা নাকি ছাতু হইয়া উড়িয়া গিয়াছে...গঙ্গায় ডুবুরী নামাইলেও একগুঁড়া মিলিবে কিনা সন্দেহ...কলিকাতা নামক দেশটা যে জায়গায় ছিল, সেখানে নাকি এখন গভীর অরণ্য...দিনের বেলায় বাঘ চরে।...এমনি আরো অনেক কিছু।...

পুরী ষ্টেশনে নামিয়া—সহরে ঢুকিবার পথে যেমন সমুদ্র গর্জ্জন স্পষ্ট হইতে হইতে ক্রমশঃ উদ্দাম হইয়া ওঠে, তেমনি উদ্দাম হইতে থাকে এই অবিশ্বাস্য রূপকথা।...

ষ্টেশনে ষ্টেশনে যেন গুদামসাবাড়ি সেল সুরু হইয়া যায়

পাশের গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া সুদাম ম্লানমুখে বলে—প্রত্যেক ষ্টেশনেই হুহু করে লোক নেমে যাচ্ছে দিদি, কি করি বলুন তো? আর তো ভরসা করে এগোনো যায় না!...গাড়ীও কেটে দেবে শুনছি।

হেমলতাও অনেক শুনিতেছেন...অনেককে নামিতে দেখিতেছেন...সমস্তই কেমন অবাস্তব ঠেকিতেছে।...যতবারই একটী বিশেষ গলির পার্শ্ববর্ত্তী বিশেষ একখানা বাড়ীর বিধ্বস্ত মূর্ত্তি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ততবারই বাড়ীখানা তার নিজস্ব অক্ষত চেহারা লইয়া চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতেছে।...

তাই সুদামের কথায় তাড়াতাড়ি কোনো উত্তর দিতে পারেন না, কেমন যেন বিহ্বলভাবে তাকান। পুনরুক্তি করে সুদাম—তা'হলে বলুন কি করা যায়? ওয়েটিংরুমে বসে থেকে ফের ফিরে যাওয়া ছাড়া তো উপায় দেখি না।

—ফিরে?...হেমলতা দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া এবারে সহজভাবেই উত্তর করেন—না ভাই, জগন্নাথকে প্রণাম করে বেরিয়ে যখন এসেছি...আচ্ছা কলকাতায় পৌঁছন কি সত্যিই অসম্ভব?

—নিশ্চয়। গাড়ীই যে কেটে দেবে।...মহা মুস্কিল এ লাইনে আপনার কোনো চেনা আত্মীয়টাত্মীয় নেই তো?

—এই লাইনে ?···হেমলতা কয়েক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া বলেন—সামনে কি ষ্টেশন আসছে ?

—সামনেই খড়গ্‌পুর।···ওখানে গাড়ী খালি হয়ে যাবে মনে হয়।

—আমাদেরও ওখানে নেমে পড়া হোক সুদাম। আছে বৈকি আত্মীয়, নিকট আত্মীয়ই আছে যে।

' বত্রিশ

অপূর্ব্ব যখন সুরেখাকে নামাইয়া দিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল ফিরতি ট্রেণ ধরিতে, মাতৃশোকের সমস্ত বেদনা ভুলিয়া সুরেখার মন বলিয়া উঠিল—বাঁচিলাম !···জৈষ্ঠের প্রচণ্ড গুমটের দুপুরে হঠাৎ ঈশানকোণ আঁধার করিয়া বৃষ্টি নামিলে যেমন জীবজগত—মানুষ আর প্রকৃতি—একযোগে উচ্চারণ করিয়া ওঠে 'বাঁচিলাম বাঁচিলাম', দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলা তাহার তেমনি একযোগে উচ্চারণ করিতে থাকে 'বাঁচিয়া গেলাম'।

চির পরিচিত এই প্রিয় নীড়টুকু ছাড়িয়া এতদিন ছিল কেমন করিয়া এই আশ্চর্য্য লাগে সুরেখার।···সবুজ রং লাগানো লোহার গেট, হাতার ভিতর বাছা বাছা গুটিকয়েক ফুলের গাছ, দরজার দুইপাশে দুইটি হাল্কা ঝাউগাছে সাজানো ছোটোখাটো একতলা বাংলোটুকু···বাহুল্য আসবাবপত্রের অসঙ্গত ভারে ভারাক্রান্ত নয়।···

বাড়ী ঢুকিতে গিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মনে পড়াইতে হইয়াছে মা নাই।···কিন্তু সবই যে আছে যেমনটী দেখিয়া গিয়াছিল।

আশ্চর্য্য !' আশ্চর্য্য ! কিছুই বদলায় নাই !

মা. নাই-—আর জানলা দরজার পর্দ্দাগুলা অবিকল দাঁড়াইয়া আছে?···দেয়ালের গায়ে টাঙানো মায়ের হাতের রেশম পশমে আঁকিয়া তোলা ছবিগুলা তেমনি টাঙানো?··· মায়ের শোবার ঘরে—বাবার খাটের রুজুরুজু ওদিকের দেয়াল ঘেঁসিয়া পাতা মায়ের নীচু খাটখানি, তেমনি ধবধবে বিছানা পাতা! খাটের নীচে কালো ভেলভেটের চটিজোড়া। আশ্চর্য্য!···আরশির সামনে সিঁদুরকৌটা হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেকটী জিনিস নিখুঁৎ ভাবে সাজানো।···

মিথ্যা করিয়া ভুল খবর দিল নাকি কেউ সুরেখাকে?··· এ কি সম্ভব যে স্নানের ঘরের দেয়াল-আনলায় সুজাতার চওড়াপাড়ের কোঁচানো শাড়ীখানি পর্য্যন্ত ঠিক থাকিবে—আর সুজাতা থাকিবেন না!···স্নানের ঘরে নয়, শোবার ঘরে নয়, পথে ঘাটে দেশে বিদেশে পৃথিবীর কোনোখানেই আর সুজাতার চিহ্ন মিলিবে না?···এ কি সত্যকার মৃত্যু?···

মৃত্যুর অভিজ্ঞতা জীবনে আরো একবার আসিয়াছে—কিন্তু সে কেমন? কি নিষ্ঠুর, কি ভয়ঙ্কর, কি অদ্ভুত শূন্যতা! ···গেল ফাল্গুনে নীলিমার একটা বছর তিনেকের ছেলে মারা গেল।···মৃত্যুর পিছন পিছন কি ভাবে মিলাইয়া গেল সমস্ত স্মৃতি!···মৃত্যু মনে করিলেই সুরেখার সেই সদ্যধোয়া 'হাঁ হাঁ' করা ঘরটা মনে পড়িয়া যায়।···সে ঘরে আবার কত কি ঢুকিয়াছে—জীবন যাত্রার অজস্র সরঞ্জাম, নিঃশ্বাস ফেলিতে হাঁপ ধরিয়া আসে নীলিমার ঘরে।···কিন্তু সুরেখার মনের

মধ্যে সদ্য-ধোয়া শূন্য সেই ঘরখানা আছে মৃত্যুর রূপ ধরিয়া।

সুজাতার মৃত্যুকে তবে স্বীকার করিবে কেন সে?

সমস্ত বাড়ীটা দু'চারবার ঘুরিয়া ক্লান্ত সুরেখা ভিতরের রোয়াকে আসিয়া বসিয়াছে—আর চাকরটার মুখে বার্ত্তা পাইয়া পুরণো দাই সরস্বতী মাথার চুল আর গায়ের কাপড় দুইহাতে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটানো চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসে।...এই কিছুক্ষণ আগে সে বাসায় গিয়াছে...দিদিমণির আসার কথা আছে একবারও শোনে নাই, আর দিদিমণি আসিয়া হাজির! সরস্বতী নিতান্তই হতভাগিনী তাই পোড়ামুখখানা সুরেখাকে দেখাইবার জন্য বসিয়া আছে...আর দেবকন্যা মর্ত্তের খেলা সাঙ্গ করিয়া কোন ফাঁকে স্বর্গে ফিরিয়া গেল, টেরও পাইল না কেউ!...

এতক্ষণে সন্দেহ কাটে।

সরস্বতীর উদ্দাম শোকের দৃশ্যটা যেন আত্মবিস্মৃত সুরেখাকে হুঁস করাইয়া দিয়া যায়—'মারা গিয়াছেন—তোমার মা যথার্থই মারা গিয়াছেন'।

কিন্তু সরস্বতী এমন কাঁদে কেন?

ছোটোলোকের ঘরের মেয়ে—দীর্ঘকাল যাবৎ ওদের বাড়ী বাসন মাজার কাজ করিয়া আসিতেছে এইমাত্র। ওর সম্বন্ধে তার বেশী তো ভাবিয়া দেখে নাই কখনো।...ও এত কথা

শিখিল কখন ? ভাষার এমন বাঁধুনি পাইল কোথায় ?···এত মন দিয়া সুজাতাকে দেখিত না কি ? তা' নয়তো—সুজাতার অগাধ গুণের প্রতিটী কণা, আর প্রতিক্ষণের হাসি, কথা, ভঙ্গী, আলাদা আলাদা স্মরণ করিয়া নিখুঁৎ বর্ণনা করিতেছে কেমন করিয়া ?···

উন্মত্ত শোকের দৃশ্যটা অসহনীয় সন্দেহ নাই, তবু—এই বন্য সরলতাকে ভণ্ডামী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেনা সুরেখা, বরং নিতান্ত অন্তরঙ্গ মনে হয় সরস্বতীকে। আর এই প্রথম বোধকরি দুইচোখ বাহিয়া অজস্র জল ঝরিয়া পড়ে তার।···হয়তো বিলাপের ভাষার আর সুরের একটা মাদকতা আছে, নেশা লাগে—স্নায়ু শিরা মোচড় দিয়া জল উপচাইয়া পড়ে চোখে।

কিন্তু বাবা ?

বাবাকে তো দেখিতে পাইল না সুরেখা। খবর না দিয়াই অবশ্য আসিয়াছে সে, আসার ঠিকই ছিলনা যখন খবর কি দিবে ?···কিন্তু বাবা যে বাড়ী থাকিবেন না একথা তো ভাবিয়া দেখে নাই।....সন্ধ্যার দিকে বেড়াইতে যাওয়ার অভ্যাস তাঁর চিরদিনের, সুরেখা জানে সে কথা—কিন্তু আজও সে অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হয় নাই ?···হয়তো—ভিতরের পরিবর্ত্তনটা যাদের যতো বেশী, বাহিরে তাদেরই ধরা পড়ে কম।

না, চিরাভ্যস্ত নিয়মের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই, তবু বাবাকে চোখে দেখিয়া আর ভুল হয়না যে মা নাই।

একটা মানুষের না থাকার খবর যে আর একটা মানুষের মুখের চেহারায় এমন স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকিতে পারে, এর আগে কোনোদিন অনুভব করে নাই সুরেখা।

... ...

বাবাকে দেখিতে দেখিতে মিত্তির বাড়ীর দালানের দেয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িটার কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে—যে ঘড়িটা চিরদিনের মতো বাজিতে ভুলিয়া গিয়াছে, অথচ চলার হিসাবে ভুল করে না।

... .

শান্ত ছন্দে কাটিতে থাকে দিনগুলি।...

ঝাপসা সংকল্প দৃঢ় হইয়াছে—সুরেখা এখানেই থাকিয়া যাইবে।

সংসারত্যাগী ভক্তও তো দেবসেবায় সারা জীবনটা কাটাইয়া দেয়। এমন প্রত্যক্ষ দেবতাই বা ক'জনের ভাগ্যে মেলে?... অবশ্য সেবা করিবার—বাহ্যতঃ কোনো উপায় নাই এই অদ্ভুত নিয়মী মানুষটীর।...এক প্রহর রাত্রি থাকিতে তাঁর দিন আরম্ভ হয়—আর নিজের রুটিনে সব কাজ সারা করিয়া এক প্রহর রাত্রি পার হইলেই সে দিনের শেষ হয়।...প্রত্যেকটি দিন যেন দেবপূজায় উৎসর্গীকৃত এক একটী ফুল!

কথায় কাজে, স্বভাবে ব্যবহারে কী নির্ম্মল শুচিতা!

আশপাশে যারা থাকে—এই নির্ম্মল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মনটা ভরিয়া থাকে তাদের একটা শুচি-সুন্দর স্নিগ্ধ অনুভূতিতে।...

বাঁপকে কি এই নতুন দেখিল, সুরেখা ? এত অভিভূত হইবার কি আছে ? শ্রীকুমার তো চিরদিনই এমনি শুচি স্নিগ্ধ, এমনি নির্ম্মল।···হয়তো বোধশক্তির অভাবেই দাম বুঝিতে জানিত না।

ভাঙা যন্ত্রের কর্কশ ঘ্যানঘ্যানানি থামিয়া গেলে নীরবতার যে শান্তি, সে শান্তির আস্বাদ সে পাইবে কোথায়—যন্ত্রই যে চোখে দেখে নাই ?

খুব ভোরবেলা পিছনের বাগানে আসিয়া বসেন শ্রীকুমার। পূবের আকাশে তখন সুধু একটু কোমল আলোর আভাস মাত্র।···না করেন স্তব স্তুতি ভজন গান—না করেন চক্ষু মুদিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান।···

দুই চোখ মেলিয়া নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকেন শুধু সেই উজ্জ্বল-সম্ভাবনাময় ধূসর যবনিকার পানে···যেখানে—অল্পে অল্পে দেখা দেয় জ্যোতির চেতনা···ফুটিয়া ওঠে পৃথিবীর হৃদ্‌পদ্ম।

সুরেখারও ঘুম ভাঙিয়া যায়, বাবার কাছে আসিয়া বসিবার ইচ্ছা দুর্নিবার হইয়া ওঠে, তবু সাহস হয়না। মনে হয় যেন অনেক দূরের মানুষ। যখন সকাল হয়, উঠিয়া পায়চারি করিতে থাকেন শ্রীকুমার, তখন সুরেখা কাছে আসে।

গতরাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে···ভিজে মাটির উপর পা ফেলিয়া ফেলিয়া সুরেখাকে আসিতে দেখিয়া শ্রীকুমার মৃদু হাসেন—আজও আসা হচ্ছে দুষ্টু মেয়ে? বড় ঠাণ্ডা রে—

—বাবা নিজে যেন ঠাণ্ডা-প্রুফ্! কখন থেকে এসে বসে আছো বলতো? তোমার বুঝি ঠাণ্ডা লাগে না?

—বুড়োমানুষদের কখনো ঠাণ্ডা লাগে? আচ্ছা বোকা মেয়ে তো!···চলো বাড়ীর ভেতর যাই।

—না বাবা এখানে বসি একটু, আমাদের চা এখানে দিতে বলেছি।···

লোহার যে বেঞ্চটা পাতা আছে বাগানে, সেখানে বসিয়া পড়ে সুরেখা। শ্রীকুমারও বসেন।···মাঝে মাঝে এখানে পিতা পুত্রীর এরকম চায়ের আসর বসে। কাগজ আসিয়া পড়ে, সুরেখা পড়িয়া শুনায়।

সুজাতার শ্রাদ্ধের সময় মনোজকে লইয়া যখন অপূর্ব্ব আসিয়াছিল নিমন্ত্রণ রক্ষায়, শ্রীকুমার নিজেই বলিয়াছিলেন—তোমার তো এঁদের সঙ্গে চলে গেলেই হ'ত সুরেখা, প্রায় মাসখানেক তো হয়ে গেল।

তখন সুরেখা বাবাকে বকিয়া দিয়াছিল।

কেন সুরেখার যদি ছ'মাসই থাকিতে ইচ্ছা হয়, শ্রীকুমার কি তাড়াইয়া দিবেন?

অভিমানী মনোজও চেষ্টা করিয়া সুরেখার সঙ্গে তেমন ভাবে কথাবার্ত্তা বলে নাই, সুরেখাও এড়াইয়া গিয়াছে। কাকার সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে মনোজ।

দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ মনও হয়তো ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ষণ-মুখর রাত্রে জলভারনত বাতাসকে আরও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল কয়েকটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

কিন্তু সে মনকে জয় করিয়াছে সুরেখা।

আজ আবার শ্রীকুমার কথাটা তোলেন।

—আর তো তোকে আটকে রাখতে পারিনে সুরেখা, এবার পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি, কি বল্?

সুরেখা মুখ ভার করিয়া বলে—আমাকে কেবল তাড়াবার চেষ্টা করো কেন বলতো বাবা? আমি তোমার কি পাকা ধানে মই দিচ্ছি?

শ্রীকুমার সস্নেহে মেয়ের পিঠে একটী চাপড় মারিয়া বলেন—আচ্ছা পাগলা মেয়ে তো! বাবাকে আগলে কতদিন বসে থাকবি নিজের সংসার ফেলে? না রে, আর দেরী করলে ওঁরা হয়তো বিরক্ত হবেন।

সুরেখা শ্রান্তভাবে বলে—ওঁরা তো বিরক্ত হয়েই আছেন বাবা, ওঁদের সন্তুষ্ট করা সহজ নয়!

শ্রীকুমার চুপ করিয়া থাকেন, বোধ করি মেয়ের মুখে এ ধরণের কথা আগে শোনেন নাই বলিয়াই প্রশ্ন করিয়া ওর সাময়িক উত্তেজনাকে বাড়াইতে চান না।

সুরেখা এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া বলে—তুমি তো জানোনা বাবা ওঁদের সন্তুষ্ট করা কতো শক্ত।

—মানুষকে সন্তুষ্ট করা শক্তই বটে রে, তাই ভগবানকে ধরতে হয়। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই দেখবি সব সোজা হয়ে যাবে।

—ছাই যাবে। জীবনেও যাবে না বাবা, ভগবানের খাতায় ওদের নাম লেখা নেই।

—ছি সুরেখা!

আহত সুরেখার চোখে জল আসিয়া পড়ে, রুদ্ধকণ্ঠে বলে—শুধু শুধু নিন্দে করতে আমি বসিনি বাবা, অনেক ভেবে ভেবে দেখলাম—পারবো না। চেষ্টার ক্রুটি করিনি—কিন্তু পারলাম না ওদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে, ওদের ছাঁচে নিজেকে গড়ে তুলতে। মানুষ যে কতো কঠিন, কতো রূঢ়, কতো ছোটো, কতো সঙ্কীর্ণ হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে তোমার ধারণাই নেই বাবা।…প্রত্যেকে প্রত্যেককে ছোবোল মারার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। মানুষের কোনো দাম নেই, জীবনের ওপর নেই শ্রদ্ধা।…অসহিষ্ণু অসন্তুষ্ট কতকগুলো জীব যেন দৈবক্রমে জট পাকিয়ে এক জায়গায় পড়ে আছে—সত্যিকার যোগ নেই, তাই সত্যিকার ঠাঁইও নেই কারুর। মর্য্যাদা বোধ নেই, আছে আস্ফালন, ক্ষমা নেই, আছে শুধু বিচার। অহরহ ওই বিচারের আতঙ্ক নিয়ে মানুষ কখনো টিঁকতে পারে? পারলাম না—পালিয়ে এলাম বাবা।'

শ্রীকুমার সোজা হইয়া বসেন—স্থিরস্বরে বলেন—কিন্তু হার মেনে পালিয়ে এলে তো চলবে না মা, সেটা ভীরুতা।

—আমি ভীরু, আমি দুর্ব্বল, সেকথা অস্বীকার করছি না বাবা।

শ্রীকুমার মাথা নাড়িয়া বলেন—না না, ও কথা ঠিক নয়। কিছুতেই তুমি ভীরু নও দুর্ব্বল নও, শুধু নিজের শক্তি সম্বন্ধে ধারণা নেই তোমার। তুমি সে বাড়ীর বৌ, সেইটাই তোমার সত্যিকার জায়গা, একথা ভুললে চলবে না, নিজের জায়গা তৈরী করে নিতে হবে।...যারা ছোটো, যারা সঙ্কীর্ণ, অসহায় তো তারাই, নিজের ভেতর বিশ্বাসের দৃঢ়তা খুঁজে পায়না বলেই পরকে অবিশ্বাস করে, নিজেকে বিচার করবার সাহস নেই বলেই ঘটা ক'রে পরকে বিচার করতে বসে।...ক্ষমা পায়নি বলেই ক্ষমা করতে শেখেনি।...তা' বলে—ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসবে কেন? সেও ক্ষুদ্রতা। ভগবানকে ভালবাসতে না পারার—তাঁর নির্দ্দেশ মানতে না পারার অক্ষমতা।

—আর অহরহ যেখানে অন্তরাত্মা পীড়িত হ'ন সেখানে?... তুমি বলতে—'প্রসন্ন মন ঈশ্বরের আসন', কিন্তু সে প্রসন্নতা টিঁকিয়ে রাখা যে অসম্ভব বাবা।

—না অসম্ভব নয়।—শ্রীকুমার মেয়ের মাথার উপর একখানি হাত রাখিয়া শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন—মানুষের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। পিরামিড সৃষ্টি করে গেল যে মানুষ, সেই মানুষই ধ্বংস করলো হিরোশিমা নাগাশাকি।...শক্তির ব্যবহারটা

ভুল হচ্ছে না নির্ভুল হচ্ছে, সেইটাই শুধু চোখ খুলে দেখতে হবে। তুমি যদি পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচাতে চাও সুরেখা, সে বাঁচার মধ্যে কোনো গৌরব থাকবে না, থাকবে না কোনো প্রতিষ্ঠা।··· তাদের ভেতরেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে—যারা তোমাকে আঘাত করেছে—যারা অহরহ নিজেদের আঘাত করছে।··· ওদের সঙ্গে মিশতেই হবে, কিন্তু ওদের ছাঁচে ঢালাই হয়ে নয়—নতুন ছাঁচের পত্তন করে।···তোমাদেরই তো দিন এসেছে এবার, গড়বার দিন। ভাঙন ধরেছে বলেই আজ গড়ার পথ গিয়েছে খুলে।···এ সত্য উপলব্ধি করবার দিন আসবেই।··· কি রে বেহারী, কাগজ এনেছিস ?···দেখি দে।···জানিস সুরেখা কাল ষ্টেশনের ইন্দ্রবাবু বলছিলেন কলকাতায় নাকি···কই রে আমাদের চা কই ? এখানেই আনবার কথা ছিল না ?

বেহারী মাথা চুলকাইয়া বলে—হ্যাঁ, আঁজ্ঞে আনছিলাম তো—উদিকে বাইরে একজন সাধু মানুষ একটী মেয়েলোককে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, আপনার খোঁজ করছেন।

—আমার নাম করেছেন ঠিক তো ?···শ্রীকুমার বাবু উঠিয়া দাঁড়ান।

—হ্যাঁ আপনার নাম করলেন, আর দিদিমণিরও—বুড়ী তো আবার চলনশক্তিহীন, ধরে ধরে নাবাতে হবে গাড়ী থেকে। বাতে পঙ্গু একেবারে।

তেত্রিশ

গুজবে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাই আমরাও বিশ্বাস করিতে রাজী নই যে কলিকাতা নামক দেশটা রাতারাতি নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে—বাঘ সিংহ ছাড়া আর কোনো জীবই নাই সেখানে।...চিড়িয়াখানার কয়েকটা বাঁধা বাঘ যদি আচমকা কোনো গতিকে ছাড়া পাইয়া থাকে—তাদের স্বধর্ম্ম পালন করিবে না?...

মানুষ আছে, থাকিবেও। না থাকিলে পৃথিবীর গা হইতে ক্ষুধিত জানোয়ারের দাঁতের দাগ মুছিয়া লইবে কে?

অরণ্য নয়—জনারণ্য।

জনারণ্যের সেই বিপুল মেলায় দৈবাৎ একজন পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়—বিশেষ তো সেবা কাজের ভার লইয়া যে নামিয়াছে।

সাগর কেমন সহজ স্বাভাবিক! কই ডাকিয়া কথা কহিতে তো বাধিল না ওর? মীনার এত কুণ্ঠা কেন?

—যাক আপনাকে খোঁজবার জন্যে আর খাটতে হ'লনা বেশী।

স্বল্পবাক্ সাগর মৃদু হাসিয়া থামে।

সমস্ত কুণ্ঠা সবলে সরাইয়া মীনা হাসিয়াই উত্তর করে—খাটবার প্রশ্নও ছিল না কি? আশ্চর্য্য তো!

—আশ্চর্য্য এখন কিছুতেই নেই, দেখছেন তো? সবই সহজ হয়ে যায়।···যাক্ আমার ডিউটি পড়েছে—যার যার নিজস্ব কোনো আস্তানা আছে, ঠিকানা খুঁজে পৌঁছে দেওয়া।··· বলুন ঠিকানা।

—ঠিকানা যদি দ্বিতীয় কিছু না থাকে, এখানে কি আরো কিছুদিন থাকা চলে না?···

—কেন চলবে না? যতদিন ইচ্ছে। কিন্তু থাকাটা তো সুখের নয়।

—ধরুন সুখের আশা যে করে না? সুখকে যার বড়ো ভয়?

দীর্ঘায়ত উজ্জ্বল দেহ, আভিজাত্যের ব্যঞ্জনাময় নিখুঁৎ মুখ! ধব্‌ধবে খদ্দরের পোষাকের সঙ্গে কংগ্রেসী টুপিটা কি চমৎকার মানাইয়াছে! কিন্তু বড় বেশী উজ্জ্বল, বড় বেশী সুন্দর, তাকাইতে সাহস হয়না।···

সাগর স্বভাব-সিদ্ধ গম্ভীর হাস্যে বলে—ঠিক দেখবেন সুখ যে চায় না, সুখ তা'র সঙ্গ ছাড়তে রাজী হয় না। চলুন—ঠিকানা একটা আমিই বাৎলে দিইগে আপনাকে।

—আপনি কোথায় পাবেন?

—কিছু না পাই নিজেরটাই দিয়ে দিতে হবে আর কি! নিজের একটা ঠিকানা তো রয়েছে এখনো···অবিশ্যি যতক্ষণ থাকে। চলুন।

এতো সহজ ভাবে 'চলুন' বলে সাগর, যে দ্বিধার যে অবকাশ আছে সে কথা ভাবেই না।

কিন্তু মীনা কোথায় যাইবে? সাগরের প্রসারিত হাতের উপর হাত রাখিবার স্পর্দ্ধা তার এখনো আছে না কি? জীবনকে যে সে বিকাইয়া দিয়াছে কাণাকড়ির দামে।...তাই ম্লানভাবে বলে—না, মাকে মুখ দেখাতে পারবো না আমি।

—মুখ না দেখালেন বা—চাপা হাসির আভাস দেখা যায় সাগরের মুখে।—মুখ ঢাকা দিয়ে আকণ্ঠ ঘোমটাই দেবেন নয়? চলুন চলুন। দেখছেন তো মানুষ কতো সাংঘাতিক ভাবে কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে মানুষের? সময় নেই—কোন ক্ষেত্রেই না।.... যাক্ দু' একটা কাজের কথা গাড়ীতেই কওয়া যাবে।

মীনার ভাগ্যেই বারবার এতো পরীক্ষা কেন? কি উত্তর দিবে সে?

—আমায় মাপ করবেন।

—মাপ? এখনো? বারে বারে কতো আর মাপ করি বলতো তোমায়? সত্যিই কি একেবারে অসম্ভব? বাধা কাটানো যায় না?

—দিনের দিন যে বাধা বেড়েই উঠছে। কি করি বলুন তো? তখন যে বাধা ছিল শুধু বাইরে—আজ তা' প্রবল হয়ে উঠেছে নিজের মনে। আপনার পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতাও আমার নেই।

—যোগ্যতার বিচারের ভারটা আমার জন্যেই থাক্ না। ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার কি আছে? সাগর ব্যগ্রভাবে বলে—কিন্তু সময় মোটে নেই মীনা, এক্ষুণি চারিদিকে

ডাকাডাকি করবে হয়তো। চলো না হয় শুধু মার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি তোমায়, তারপর মনকে বিচার কোরো বসে বসে।

কিন্তু নূতন করিয়া বিচারের আবার আছে কি? বসিয়া বসিয়া আপন মনকে চুলচেরা বিচার করিয়া দেখে নাই কি মীনা?···খামখেয়ালী হৃদয়হীন অরুণেন্দুকে বরং মুখ দেখানো সহজ, কিন্তু নীলু?—এতো ঝড়ঝাপটাতেও যে অঞ্চলচ্যুত হয় নাই মীনার।···নীলুর কাছে আবার নূতন করিয়া কি পরিচয় দিবে সে? না না, নীলুর ঘৃণা সহ্য করিতে পারিবে না মীনা। তাই শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলে—বিচার করবার আর কিছুই নেই সাগরবাবু, যার মূলধন হারিয়ে গেছে সে নূতন করে কোন কাজে নামবে?···বুদ্ধির ভুলে, ভাগ্যের দোষে, জীবনটাকে যে বাজে খরচ করে ফেলেছে, তা'র ভালো করবার সাধ্য ভগবানেরও নেই।···তবু সত্যিই যদি দয়া করেন—এরপরও যদি মুখ দেখতে ঘৃণা না করেন—দিননা আমাকে আপনাদের এই কাজের সামান্য কিছু অংশ—পৃথিবীতে টিঁকে থাকবার একটু অবলম্বন।···দেবেন?

সাগরের মুখের হাসি মিলায় না। তেমনি গম্ভীর হাসিআঁকা মুখ। শুধু কণ্ঠস্বরে ক্ষণপূর্ব্বের ঈষৎ চাপল্য আর নেই।

—কাজ কাউকে দিতে হয় না মীনা। অজস্র কাজ ছড়ানো আছে চারিদিকে। শয়তানে আর ভগবানে ষড়যন্ত্র ক'রে মানুষের কাজ এতো বাড়িয়েছেন আর বাড়াচ্ছেন—

যে এক আধ পুরুষে কুলোবে না।···তবু বলি—কোনোদিন যদি শ্রান্ত হয়ে পড়ো—বিশ্রামের দরকার হয়—ঠিকানাটা ভুলে যেওনা। এখনো বড় বেশী সেন্টিমেণ্টাল আছো—তাই বুঝতে দেরী হচ্ছে। জেনো—জীবন কখনো একেবারে খরচ হয়ে যায় না।···দিনে দিনে আবার জমা হয়ে ওঠে জীবনের সঞ্চয়।···

খুঁজিয়া খুঁজিয়া কখন যে নীলু আসিয়া হাজির হইয়াছে কে জানে। ছুটিয়া আসিয়া অগ্রাহ্যের ভঙ্গীতে সাগরের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া মীনাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলে —মা, ওমা শুনছো!···এতো খুঁজে বেড়ালুম বাবুকে কোথাও যদি দেখতে পাই। যতো লোককে শুধোই—অরুণ ডাক্তারকে চেনো? বলে কিনা—হি হি হি হি···বলে কিনা 'কে অরুণ ডাক্তার? রোগা কালো দাঁতউঁচু'?···'কে অরুণ ডাক্তার? পাকাদাড়ি মাথায় টাক'?···শোন একবার বর্ণিমে? ···তা'ও বলি এতো লোকের বাড়ী ঘর ভাঙলো—আর আমাদের বাবুরই কি একেবারে নোয়া বাঁধান বাড়ী ছিল?

সাগরের সামনে অরুণেন্দুর প্রসঙ্গটা অস্বস্তিকর, তবু হাসিয়া ফেলে মীনা—তুই তো তা'হলে খুবই হিতৈষী হলি ডাক্তার বাবুর? বাড়ীঘর ভাঙাই উচিৎ ছিল বল্?···

ব্যাপারটা বুঝিতে সাগরের দেরী লাগে না।

—ওর প্রেমটাই সত্যিকার খাঁটি।—বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যায়।…

অপ্রতিভ নীলু তখন মুখ ভার করিয়া গজগজ করিতেছে… ঘরদুয়োর ভেঙে যাক সেই কামনাই করছে যে নীলে! নীলের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই।…বলি—এই জগাখিচুড়ি কাণ্ডটায় এই যে এতো লোক এসে জমা হয়েছে—বাবু এলে তো একবার চোক্ষের দেখাটাও দেখা হ'ত? না কি?…

চৌত্রিশ

দালানে পা ফেলিবার জো নাই।

বিছানা-পত্র, ট্রাঙ্ক-সুটকেশ, পোঁটলা পুঁটলী, কুলোডালায় থৈ থৈ করিতেছে একেবারে। এই বিরাট গন্ধমাদন পর্ব্বত যে আবার মেলিয়া ছড়াইয়া সারাবাড়ীতে গুছাইয়া রাখা যাইবে—চোখে দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

তবে বাড়ীর বাসিন্দারা অনেকেই অনুপস্থিত, তাই ভীড় কম।···আসিতে সুরু করিয়াছে সবাই—একে একে।··· সুরেখা যদি হেমলতাকে লইয়া একলা আসিয়া বাস করিবার ভয় দেখায়, কোন লজ্জায় কে না আসিবে?···আর সুখেই কি আছে কেউ? পালা বদল করিয়া মেয়েমানুষেরা বাপের বাড়ীতে—আর পুরুষেরা শ্বশুর বাড়ীতে বাস করিতে থাকিলে অবস্থাটা আর যাই হোক সুখের যে হইবেনা সেটা বলা বাহুল্য। যাহারা আবার পরগাছার সামিল তাহাদের কথা বাদই থাক।

কোমরে জড়ান আঁচলটা খুলিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে সুরেখা আসিয়া ট্রাঙ্কের উপর বসে।···পারিবে তো? এই এলোমেলো ছত্রখান সংসারকে আবার গাঁথিয়া তুলিতে?···শুধুই ট্রাঙ্ক-সুটকেশ ঝুড়ি চুপড়ি তো নয়—এমনি এলোমেলো ছত্রখান

হইয়া গিয়াছে মানুষগুলাও। এলোমেলো হইয়া গিয়াছে অভ্যাসের ধারা—দৈনন্দিন জীবনের গতি।

শ্রীকুমার বলিয়াছিলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো ঘটনাই নিরর্থক নয় সুরেখা, হয় তো এই ভালো। ভাঙার কাজটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ভগবান তোমাদের কাজ সহজ করে দিয়েছেন। আজকের অশান্ত অসন্তুষ্ট মানুষ ধ্বংশের প্রেরণায় যে মাটি বিদীর্ণ করছে, তার ওপরেই উঠবে নতুন বনেদ। সুখী আর সন্তুষ্ট পৃথিবীর সেই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের অগ্রদূত হয়ে থাকলে তোমরা ইতিহাসের পাতায়।...

শ্রীকুমার আশাবাদী।

সুরেখাই বা আশা ছাড়িবে কেন? পৃথিবীর মেরুদণ্ডই যে আশা!

উমাশশীও আসিয়া বসে। ভিজা হাত মুছিতে মুছিতে বলে—ভাঁড়ারটা কতক গোছান হ'ল।...কিন্তু তুমি বৌমা একটু জিরোও দিকিন, বড্ড খাটছো। ছেলেমানুষ!

—ছেলেমানুষরাই তো খাটবে গো ছোটপিসি। তাই নিয়ম।...কিন্তু রোসো এখন আর নয়। একদিনে শেষ হবে না।...তারপর—তোমাদের গল্পটাই যে শোনা হ'ল না এখনো।

—গল্পটাই রূটে। রূপকথার গল্প—'হাঁউ মাউ খাঁউ মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ'।···উমাশশী হাসিয়া ফেলিয়াই একবার চোখ বুজিয়া বলে—এখন হাসছি— কী দিনই গেছে—উঃ! সে রাত কেটে আবার দিনের মুখ দেখতে পাবো তা আর ভাবিনি কেউ।··· রান্নাবান্না সবে শেষ হয়েছে, খাওয়া হয়নি কারুর, কচিদের ঠাঁই করা হচ্ছে—আর সদরে যেন বাজ পড়লো।···বাপরে বাপ! ঠাকুর চাকর যে যেমনে পারলো পাঁচীল টপকে পালালো।—আমাদের অবস্থা বলে কাজ নেই।···মেজদার তো এদিকে বারোমাস এতো হুমকি, এতো আস্ফালন, তখন যদি দেখতে বৌমা! মেয়েমানুষের মতোন হাউ হাউ করে কান্না আর ঠক ঠক করে কাঁপুনি।···ওর চেয়ে ন'খুড়ি ঢের শক্ত। সেজকাকা কাঁপছেন, পিসিমা হাঁপাচ্ছেন—সে এক বিভীষিকা!···

—আর সেজখুড়িমা?···সুরেখা ব্যগ্রভাবে বলে—ওঁকে নিয়েই তো মুস্কিল? খুব ফিট্ হচ্ছিল?

উমাশশী মাথা নাড়িয়া বলে—না ওইটীই আশ্চয্যি। সে রোগ একেবারে সেরে গেছে সেজবৌয়ের। ও তো বরং সাহসে ভর করে তার ভেতরেই ছোট ছেলেমেয়েদের খাওয়া দাওয়া দেখলে।···কে যে ভীতু, কে যে সাহসী, বোঝা দায়,—সেজদি তো মড়াকান্নাই জুড়ে দিল।···হ্যাঁ ছেলে বলতে হয় সুধোকে! এই যে ঘুড়ি উড়িয়ে আর পায়রা ধরে বেড়ায়, বাড়ীসুদ্ধু লোকের গালমন্দ হজম ক'রে টো টো করে ঘোরে

—কে জানতো যে ওর ভেতর এতো গুণ!···দু'হাতে দু'গাছা লাঠি ধরে একলা আটকালে সেই দরজা। লাঠির কায়দা কি—যেন চক্কর ঘুরছে!···বড়দা সেজদা আমাদের মেয়েমানুষদের সরাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠছিলেন, সুধো চোখ রাঙিয়ে বললে—"খবরদার! এক প্রাণী নড়বে না বাড়ী থেকে —কেন মেয়েমানুষ বলে কি মাথা কিনেছে? ভগবানের দেওয়া চারখানা হাত পা আছে কি নেই? চলে এসো সব"।···যাই হোক ওর বাহাদুরীতেই রক্ষা হোল বৈকি।··· উঃ দুর্গা দুর্গা!

—তবে আবার তোমরা পোঁটলা পুঁটলী বেঁধে চলে গেলে কেন?···সুরেখা অবাক হইয়া বলে।

—সে তো পরে।···সুধো হাঁসপাতালে—পাড়ার লোক পালাতে লাগলো। কেউ ভরসা দেয় না।···এই তোমাদের জেদে আবার আসা—জীবনে যে এ বাড়ীতে কখনো ঢুকবো এ আশা করিনি।

পাড়ার লোকের কথায় মনে পড়িয়া যায়। সুরেখা ব্যগ্রভাবে বলে—আচ্ছা সুরেশ বাবুর বাড়ীর খবর কি?

—সুরেশ বাবুর? আহা সে দুঃখের কথা আর বোলোনা ···প্রাণে বেঁচে আছে বটে, বড় মেয়েটা তো লোপাট হয়ে গেলো!

—ইস্! মাধবী?

—তুমি নামটামও জানো নাকি ? আমরা তো জানিনে শুনতে পাই নাকি ক'দিন পরে এসেছিল—

—এসেছিল ? এসেছিল মানে কি ? তারপর ?

—আর তারপর ! সে মেয়ে নিয়ে করবে কি ? নিতে তো পারবে না ? দরজা খুললে না। ডেকে ডেকে ফিরে গেল। ···ওকি বৌমা, অমন করছো কেন ? গরম হচ্ছে ? আহা হবে বৈকি, সারাদিন যা খাটছো। শোবে একটু ? বাতাস করবো ?

—কিছু হয়নি ছোটপিসি।....বল্‌ছি—যখন ওরা তাড়িয়ে দিল ছোটকাকা কোথায় ছিলেন ?

—ছোট কাকা ? কে আমাদের অনু ?···

উমাশশী অবাক হইয়া তাকায়—এত দেশ থাকিতে অনিরুদ্ধ এমন কি মাতব্বর হইল যে সুরেশ বাবুকে সায়েস্তা করিয়া আসিবে ?···

—অনু কি করবে ? ওদের মেয়ে—তা' ছাড়া সুরেশ বাবুর অপরাধ কি ? সব দিক তো দেখতে হবে ?···গেরস্থ লোক।

সত্যই তো গেরস্থ লোক ! 'গেরস্থর' সাত খুন মাপ। গেরস্থর দেশ-দশ না থাক—দয়া ধর্ম্ম না থাক্‌—কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিবেক বুদ্ধি কিছু না থাক—নিন্দা নাই। কি করিবে 'গেরস্থ' যে !···কোনো রকমে দুনিয়ার খানিকটা জমি দখল করিয়া টিঁকিয়া থাকাই গেরস্থর জীবনের চরম সার্থকতা।···ওদের কাছে মনুষ্যত্বের প্রত্যাশা কেউ করে না বলিয়াই মনুষ্যজনোচিত

ব্যবহারের অভাবে মর্ম্মাহতও হয় না। যতো ছোটো কাজই করুক, করুণার প্রস্রবণ বহানোই আছে তাহাদের জন্য— 'আহা মরে যাই কি করবে গেরস্থ যে' !...

কিন্তু সুরেখা ও সব বাজে ওজর শুনিতে রাজী নয়।

অনিরুদ্ধর এই জড়তাকে ক্ষমা করিবে না সে।... অনিরুদ্ধর অভিব্যক্তিহীন নিশ্চেষ্ট প্রেমের বিকার বুদ্ধিমতী সুরেখার চোখে ধরা পড়িতে দেরী হয় নাই, কিন্তু এবার সে হাল ধরিয়াছে।...এত বড়ো অন্যায়কে ক্ষমা করিবে না।... বিকৃত অসুস্থ মনের বিকার লইয়া একজন নিজেকে তিলতিল করিয়া ধ্বংস করিতে থাকিবে—আর একজন ধ্বংস হইয়া যাইবে—সামান্য অবহেলায় ?...

না, প্রতিকার চাই।

—দেখো ছোটপিসি, খুড়শ্বশুরদের সঙ্গে এবার থেকে কথা কইবো আমি, তোমাদের ও সব আপত্তি-টাপত্তি চলবে না।

—আমার আবার আপত্তি—উমাশশী হাসিয়া ওঠে—মেজ-জ্যেঠিকেই যখন কোলের খুকীর বাড়া বশ করে ফেলেছ তখন আর কথা—তা' হঠাৎ খুড়শ্বশুরদের ওপর শাস্তির ব্যবস্থা কেন ?

—শাস্তি দেওয়ার দরকার হয়েছে যে—এই চললাম আমি ছোট কাকার কাছে হানা দিতে। বিছানায় পড়ে থেকে থেকে দিন দিন ওজন কমানো, আর জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা—ঘোচাচ্ছি আমি।...মাধবীকে খুঁজে বার করার আগে নিস্তার নেই তাঁর।

—ওমা এ কি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে! মাঝখান থেকে ও বেচারা কি চোর-দায়ে ধরা পড়লো?

—সে তুমি বুঝবে না ছোটপিসি, সেটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধিও তোমার ঘটে রাখেনি কেউ।…কিন্তু ওকি তুমি ওই কাপড়েই জল খাচ্ছো যে বড়ো?…কই তসর কাপড় পরলে না?

—আ কপাল!—উমাশশী দুই হাত উল্টাইয়া নিরুপায়ের ভঙ্গীতে বলে—সে সব ঘুচে গেছে। এই তিন মাস ধরে কতো ঘাটের জল খেয়ে বেড়ালাম—এখন আবার তসর কাপড়!… বলে পিসিমা ন'খুড়িমাই মানতে পারছেন না!…শরীরের অবস্থাও খারাপ হয়ে গেছে কি না সব—পিসিমাকে তো এখন একাদশীতে পর্য্যন্ত ডাবের জল, চিনি ভিজে খেতে হচ্ছে—শূল ব্যথাটা খুবই চেগেছিল কিনা।…এই তো আসছেন কাল, দেখতেই পাবে।…মুস্কিল হয়েছে সেজদির—আসতে চেয়ে চিঠি লিখেছে সেদিন—

—থাক্ ছোটপিসি, তোমার সেজদিটীকে আর নেমন্তন্ন কোরো না…নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত থাকুন তিনি।…নতুন দেওয়ালে ফাটল ধরাবার পথ রাখতে অশ্বত্থের গোড়াটীকে আর যত্ন করে এনে পুঁতোনা তোমরা।

ধূলোমাখা ভারী বোঝা পুরণো ব্লকটাকে বহিয়া আনিয়া হাঁপাইতে থাকে মনোজ।…সর্ব্বাঙ্গে ঝুল-কালি—নতুন উৎসাহে সংসার গোছানোর কাজে লাগিয়াছে সে।

নিজের কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিতেই বোধ করি সহাস্যে বলে—খাটগুলো সব ফিট্ করা হল।···আলমারীর তাকগুলোও বসানো হয়ে গেছে। বাবা এতো জঞ্জালও জমে ছিল বাড়ীতে—

—কিন্তু এটাকে নিয়ে টানাটানি করছো কেন? যেমন ছিল থাক্‌না?

সুরেখা প্রশ্ন করে।

—এটাকে ভাবছি একবার মেরামত করতে দিয়ে আসি।

—সেকি কেন? এটা তো সুন্দর চলে—কারেক্ট টাইম দেয়!

—তা' দেয় বটে—কিন্তু শব্দযন্ত্রটা তো ঠিক নেই? বাজে না যে!

সুরেখা মৃদু হাসিয়া বলে—তা হো'ক—যেমন ছিল তেমনি টাঙিয়ে রেখে দাও গে। কথা না কয়ে—শুধু কাজ করে যাবার দৃষ্টান্ত স্বরূপ থাকুক ও আমাদের চোখের সামনে।